জীবন-রুদ্র

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

দেবশ্রী সাহিত্য সমিতি
৯৯ এ, তারক প্রামানিক রোড, কলিকাতা।

প্রকাশক

শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়

দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ

৯৯এ, তারক প্রামানিক রোড,

কলিকাতা—৬।

মুদ্রাকর

শ্রীগৌরচন্দ্র পাল

নিউ মহামায়া প্রেস

৬৫।৭ কলেজ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২।

প্রথম সংস্করণ :

দোল পূর্ণিমা—১৩৫৩

দ্বিতীয় সংস্করণ :

জন্মাষ্টমী—১৩৫৮

এই লেখকের লেখা

চিতা-বহ্নিমান

কালরুদ্র

মহারুদ্র

পরমারাধ্য পিতৃদেব

৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শ্রীচরণকমলেষু—

ফাল্গুনী

জীবনকে যাঁরা নিয়তির নির্ম্মম কালো কষ্টি-পাথরে যাচাই করে নিতে জানেন,—মনকে যাঁরা মানুষের শক্তিশালী মনন-শীলতায় লালন করেন—হৃদয়কে যাঁরা অনুভূতির অভিসারপথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান পরমানুভূতির সুবর্ণময় প্রকোষ্ঠে, সাহিত্য যেখানে সৎ, চিৎ এবং আনন্দে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, এই বই তাদেরই জন্য লেখা। আজিকার কণ্টকাকীর্ণ পথে আমাদের জীবনযাত্রা প্রতিকূল বাতাসে বিষাক্ত—জীবন তাই বিপর্য্যস্ত, বেদনাময়; যে শুদ্ধ দৃষ্টি, অনমনীয় দৃঢ়তা, অবিচলিত আদর্শবোধ আজিকার এই জীবন সঙ্কটে অতিক্রমনীয় করিতে পারে, তাহারই বলিষ্ঠ ইঙ্গিত আছে এই উপন্যাসে। ইহার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্ব্ব 'কালরুদ্র' এবং 'মহারুদ্র' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিনীত

জন্মাষ্টমী
১৩৫৮

প্রকাশক
দেবশ্রী সাহিত্য-সমিধ

জীবনরুদ্র—কালরুদ্র—মহারুদ্র

মানুষের শক্তিশালী মননশীলতার আলেখ্য

আঁধার আকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠছে! রাত শেষ হয়ে গেল। গভীর একটা শ্রান্তি থেকে যেন জেগে উঠলো পৃথিবী—মানুষের ঘুম ভেঙেছে! মানুষের ঘুম ভেঙেছে সাইরেণের করুণ কান্নায়,এরোপ্লেনের কর্কশ আওয়াজে আর এ্যাটম্-বোমের মৃত্যু-রশ্মিতে। জাগ্রত প্রতীচ্য রণশ্রান্ত জন্তুর মত হাঁফাচ্ছে আর নব জাগ্রত প্রাচ্য জেগে উঠেই দেখছে—সে নগ্ন, সে নিরন্ন, সে শোষিত এবং শাসিত, তবু কিন্তু নিঃসংশয়ে বলা চলে—পৃথিবীর ঘুম ভেঙেছে।

ঘুম ভাঙা এই প্রভাতের একটি অম্লান সৌন্দর্য্য আছে—অমৃত-মধুর সঙ্গীত আছে, কিন্তু উপভোগ করবার লোক কোথায়? জীবন-রুদ্র জটাজুট আলোড়িত করে জেগে উঠেছেন—ঝড়-ঝঞ্ঝার উদ্দাম নৃত্যের আভাস আশঙ্কিত করে তুলছে মানুষের শান্ত জীবনকে—সেই কথাই ভাবছিল আলোকনাথ।

আলোকনাথ আজ ছাড়া পেয়েছে জেল থেকে—গ্রামের বাড়ীতে ফিরছে। মনে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগবার কথা, কিন্তু ওর আশাবাদী মন আজ নিরাশার অন্ধকারে। মানুষের জীবন জেগেছে—কিন্তু এ জাগরণকে অভিনন্দিত করবে কে? মাতা পৃথিবী সন্তানের মৃত্যুবাণে জর্জ্জরিতা—অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা;—প্রিয়া প্রকৃতি তার অন্তরের গুপ্ত সম্পদ-হারা—বৈজ্ঞানিকের ক্ষুদ্রতম গবেষণাগারে বন্দিনী—আর আত্মীয়-পরিজন, গ্রাম

দেশ আজ সর্ব্ব-সম্পদহারা নিরন্ন, বস্ত্রহীন, ভিক্ষুক—এই জাগরণকে অভিনন্দিত করবে কে আজ!

আলোকনাথ তথাপি মনের আশাকে উজ্জীবিত রেখে এগিয়ে আসছে। আর ক্রোশখানেক গেলেই গ্রাম—কিন্তু তার আগে ঐ রতনপুর গ্রামটা পার হতে হবে—ওর পরে নদী—তারপর খানিকটা ফাঁকা মাঠ, তারপর দেখা যাবে চঞ্চলার তালীবন, আম্রকুঞ্জ আর উচ্চশীর্ষ শিবমন্দির! দীর্ঘ তিন বৎসর পরে আলোকনাথ আজ দেখতে পাবে সেই আজন্মের পরিচিত জন্মভূমি—আপনার অজ্ঞাতসারেই ওর পায়ের গতিবেগ বেড়ে গেল!

রতনপুর গ্রামটা এখনো ভালো করে জাগে নি। শীতের প্রত্যূষে—ধানকাটা শেষ হয়ে গেছে—চাষীর দল তাই হয়তো আরাম করছে বিছানায়—আলোকনাথ তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললো—তাহলে সুখে আছে গ্রাম, সুস্থ আছে দেশ, সুন্দর আছে তার আপন জন! ভাল—তার দেশের মানুষগুলি! গ্রামের মাঝামঝি এসে পড়লো আলোক—কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না; কেউ কি উঠে তামাকও সাজে না আজকাল আর? শীতের ভোরে খড়কুটো জ্বেলে আগুন পোয়াবার রেওয়াজ কি এই তিনটা বছরের মধ্যেই উঠে গেছে! —কিম্বা?…

আলোকনাথ ভালো করে চেয়ে দেখলো গ্রামের ঘরগুলোর পানে—ও হরি—সবই যে ভাঙা ভিটে, পরিত্যক্ত শ্মশান, পরিজনহীন শবদেহ! কি হোল, এই এত বড় গ্রামটার হোল কি এই তিনটি বছরের মধ্যে! মন্বন্তরে মরেছে? নাকি, মারণাস্ত্রের আঘাতে উড়ে গেছে? অথবা—না, কিছুই ঠিক করতে পারছে না আলোকনাথ!

কর্কশ শব্দে দুখানা এরোপ্লেন উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে—তবে কি এখানটায় এরোপ্লেনের মাঠ তৈরী হয়েছে? হয়েছে তো কোথায় সেই মাঠ? আলোকনাথ কিছুই দেখতে পেল না কোনোদিকে! এগিয়ে

আসছে—ছোট গ্রামের ছোট জমিদারের পাকাবাড়ীর কাছে এসে পড়লো—গ্রামের মধ্যে এই একখানি মাত্র পাকাবাড়ী—কিন্তু কেউ তো নেই? নিস্তব্ধ, নিচালি বাড়াখানা যেন গভীর দুঃখে মহাসমাধি লাভ করেছে; ওর সাড়া পাওয়া যাবে না!

উঠে এলো আলোকনাথ বাড়ীর দাওয়ায়। পায়ের শব্দে কয়েকটা ইন্দুর ছুটে চলে গেল এদিক-সেদিক। দরজার কোণায় মাকড়সার জাল, —ঘরের মেঝেতে চামচিকের মল—দেওয়ালের গায়ে অব্যবহারের মালিন্য! কতদিন বোধ হয় এখানে মানুষ আসে নি! কেন? কোথায় গেল এত মানুষ? জমিদারবাবু, তাঁর স্ত্রী, পুত্র-পুত্রবধূ, অনূঢ়া কন্যা, ঝি-চাকর—গেল কোথায় সব! আলোকনাথ বাড়ীর ভেতরের উঠোনে এসে পৌঁছালো। বড় ইন্দারাটার পাশে জলতোলা দড়ি-বালতি পড়ে আছে, আর তার পাশে ডালিম গাছটায় চার পাঁচটা ছোট বড় ডালিম ঝুলছে। কেউ চুরি করতে আসে নি—আশ্চর্য্য!

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আলোক প্রায় দু'মিনিট; কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলেই এ রহস্যের কিনারা হবে না, তাই আবার সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে। নির্জ্জন, স্তব্ধ গ্রাম-পথ। বন্য লতায় গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটে রয়েছে। বুড়ো শিবতলার প্রকাণ্ড পদ্ম-করবী ঝাড়টায় থোকা থোকা ফুল—কণক ধুতুরো গাছগুলোর ফুলে ফুলে শিশির ভর্ত্তি হয়ে রয়েছে—ও শিশির নীলকণ্ঠের কণ্ঠের বিষ নাকি? ঐ বিষ খেয়ে এ গ্রামের সব লোকগুলো কি ধূলোতে মিশে গেছে? কিম্বা ঐ বিষ পান করে এরা রুদ্রের উপাসনায় চলে গেছে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট অজানা পথে—যেখানে থেকে তারা অমৃত নিয়ে ফিরবে রুদ্র-দেবতার চরণমূলে! তাদের জীবন-রুদ্র কি সত্যি জেগেছে!

কে জানে! বারোশ' বছরের পরাধীন জীবন-নাগ আজ দু'শ বছর ধরে খোলস ছাড়ছে বৈদেশিক সভ্যতাকে অঙ্গে লেপন করবার জন্য!

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়.

তাঁর জন্মগত সহজাত কবচকুণ্ডল ইন্দ্রকে দান করে সে দাতাকর্ণ হোল না —বিদেশীর কুহকে বিসর্জ্জন দিল সেই অমূল্য রত্ন—তারপর নিয়ে এলো পল্লবগ্রাহী পাশ্চাত্য শিক্ষা,—পরলো চোখ-ধাঁধানো পোষাকের পঙ্কতিলক, পাতঞ্জল-জৈমিনী-কণাদের উচ্চগ্রামে বাঁধা মনের সুরকে নামিয়ে আনলো সাইকোলজি আর সেক্সলজির গণ্ডীবদ্ধ পার্থিবতায়—বশিষ্ঠ, বাদরায়ণ, বুদ্ধের উদারনীতিকে ঠেলে দিল কুসংস্কারের বিস্মৃত রাজ্যে। আজ সে হৃতগৌরব, অপহৃত সম্পদ, অসহায়, তবু আত্মবঞ্চনার আরাম-প্রিয়তায় তার অবসাদ আসে নি—আত্মধিক্কারে সে এখনো জাগ্রত হোল না—আপনাকে সে আজো চিনতে চাইছে না—আশ্চর্য্য !

কিন্তু আশ্চর্য্য কিছুই নাই। মানুষের জীবন-রুদ্রের লীলা-নিকেতন। রুদ্র সুপ্ত থাকেন—জাগতে তাঁর বড় দেরী হয় কিন্তু যখন জাগেন তখন তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে উদ্দাম নৃত্যে প্রকম্পিত করে তোলেন পৃথিবী। জীবনের সেই রুদ্র যদি আজো না জেগে থাকেন তবে তিনি হয়তো আর জাগবেন না—দীর্ঘশ্বাস শূন্যে বিলীন হয়ে গেল আলোকের।

চঞ্চলার তালীবনের উচ্চচূড়ায় প্রভাত সূর্য্যের আলোলেখা পড়েছে, ঝিকমিক করছে। কিন্তু এখনো দূরে, অনেকটা দূরে চঞ্চলা গ্রাম। মাঝের নদীটা, তারপরে ফাঁকা ঐ মাঠগুলো, তবে চঞ্চলা গ্রাম। নদীতে জল মাত্র হাঁটু অবধি। ছোট মাছগুলো কি সুন্দর খেলা করছে স্বচ্ছ জলে! ওদের জীবন ঐ স্বচ্ছ জলের মতোই অপঙ্কিল। জীবন-সাধনায় ওরা মানুষের সভ্যতার পথকে পরিত্যাগ করেছে ; প্রকৃতির নিয়ন্ত্রিত পথেই ওদের যাত্রা, —তাই ওরা আজো অপ্রাকৃত হয়ে ওঠে নি!

আলোকনাথ নদীর এপারে এসে উঠলো। সাদা বালিতে ভিজে পা ভরে যাচ্ছে। বেশ আরাম লাগছে ওর এই বালুবেলায় হাঁটতে। ছেলেবেলার মত একটুখানি ছুটোছুটি করবে নাকি? ঐ মাছগুলো যেমন করছে জলে খেলা! কিন্তু মাছগুলো প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে জীবনধারণ

করতে পারে, আলোকনাথ পারে না—কারণ সে মুক্ত নয়—সে নিজের প্রভু নয়, তার অন্তর তার স্বরাষ্ট্র নয়—তার বাহিরও নয় স্বরাজ। আলোকনাথ কোন লজ্জায় ছুটোছুটি করবে! হ্যাঁ, একদিন করতো যখন সে ছিল ছোট, ঐ মাছগুলোর মতই ছোট, অমনি অমলিন, অকলঙ্ক, অপরাধীন। অবন্তী থাকতো সঙ্গে। অবন্তী, রতনপুরের ঐ জমিদারের একফোঁটা মেয়েটা—বরাবর সে সঙ্গে থাকতো আলোকের। এই বছর তিনেকমাত্র নেই, মানে তার তের বছরের পর থেকে সে নেই আলোকের কাছে। না—আলোকই ছিল না তিনবছর। কিন্তু আজ যখন আলোক এল তখন অবন্তী গেল কোথায়! কে ছুটে এসে বলবে—জেল-ফেরৎ তোমার চেহারাখানা সুন্দর হয়েছে—ফটো তুলে রাখি।

—ফটো তুলে কি হবে?—আলোক গম্ভীর হয়ে শুধুবে।

—সৈনিকের চিত্র রাখতে হয়—ভারতের এটা আদিম দিনের নিয়ম।

অবন্তী নিশ্চয় ফটো তুলতো আলোকের। ছোট্ট এতটুকু একখানা ক্যামেরা ছিল ওর। তাই দিয়ে ও নদীর কিনারে-চলা পাখী শিকার করতো—মানে ছবি তুলতো। ওর বাবা উগ্র আধুনিক পন্থী—কিন্তু দাদা, বৌদি আর অবন্তী নিজে একেবারে সনাতন পন্থী অর্থাৎ বাপের যা হওয়া উচিৎ ছিল তাই হয়েছে ছেলেমেয়েরা—আর ছেলেমেয়েদের যা হওয়া উচিৎ ছিল, তাই হয়েছে বাপ্। কিন্তু সেই সনাতনী অবন্তী গেল কোথায়? ওরা কি দেশ ছেড়ে অন্য কোন দেশে চলে গেছে? সারা গ্রামটাই কি চলে গেছে? চঞ্চলায় ফিরে সেখানকার লোকদের জিজ্ঞাসা করতে হবে। আলোকনাথ তাড়াতাড়ি চললো। ফাঁকা মাঠ—না শস্য, না বা শ্যামলাভা! শীতের দীর্ণ মৃত্তিকায় কদাচিৎ দু'একটা ঘাস। রুক্ষ গৈরিক মূর্ত্তি তবু কত সুন্দর। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত সুন্দর। হ্যাঁ—সন্ন্যাসী! অনেক যার ছিল, সে সব ছেড়ে এসেছে—ত্যাগের গৌরবে ললাট তার

দীপ্ত—নয়ন প্রশান্ত, অন্তর স্নেহ-কোমল—একটুখানি আঁচড় কাটলেই বসন্তের ফুলে আর গ্রীষ্মের রবিশস্যের প্রাচুর্য্য উপচে উঠবে—সন্ন্যাসী শুধু নয়—রাজর্ষি ও।

হাঁটতে লাগলো আলোকনাথ তৃষাদীর্ণ মাঠ অতিক্রম করে। চঞ্চলার প্রান্ত—দীর্ঘদিনের পর জন্মভূমি দেখার সৌভাগ্য—আলোকের অন্তর আনন্দে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। কিন্তু গ্রামের কোলাহল কৈ! নাকি এখনো ওঁদের শয্যাত্যাগের সময় হয় নি! গ্রামবাসীদের উঠবার সময় হয়েছে নিশ্চয়ই। পিছনের ঐ গ্রামটার মত এ গ্রামখানাও জনশূন্য হয়ে গেছে নাকি! আলোক ভাবতে ভাবতে গ্রামে ঢুকলো।

না—জনশূন্য হয় নি; লোকালয় রয়েছে; আস্তে আস্তে উঠছে তারা বিছানা থেকে। কেউবা দাঁতন করছে, কেউ কেউ যাচ্ছে মাঠের দিকে। আলোকনাথ সর্ব্বাগ্রে বাড়ী পৌঁছে তার মা'কে প্রণাম করতে চায়। অপর কারো সঙ্গে দেখা হলে কথা কইতে হবে—বয়োজ্যেষ্ঠ হলে হয়তো প্রণামও করতে হবে—আলোকনাথ সেটা চায় না। সর্ব্বাগ্রে ওর মা'র সঙ্গে দেখা হওয়া চাই—তাই সে এত ভোরে চলে এসেছে ষ্টেশনে নেমেই।

বনকচু গাছগুলো তখনও শুকিয়ে মরে যায় নি। পাতায় পাতায় শিশির পড়ে ঝলমল করছে মা'র হাসিমুখের মত। ওর মধ্যে দিয়ে পথ করে আলোকনাথ নিজের বাড়ীর কাছাকাছি চলে এলো—এর পর ডাক দেবে,—মা—মা!

কিন্তু এই তিনটে পূরো বছরের মধ্যে কত কি ঘটেছে! মা আছে তো ঠিক? আলোকের বুকখানা ধক্‌ধক্ করে উঠলো অমঙ্গল-আশঙ্কায়। কিন্তু সাহস সঞ্চয় করলো সে। মা নিশ্চয় বেঁচে আছে। মা না থাকলে আলোক গিয়ে দাঁড়াবে কার কাছে?—মা, মা!—আলোক ডাক দিল। দরজাটা ভাঙা, কোন রকমে বন্ধ করা আছে মাত্র। আলোক ঠেলে দিল

হাত দিয়ে। খুলে গেল দরজা। জীর্ণ কাঠ ভেঙেই গেল হয়তো। ওপাশে উঠোনটা ঘাসে জঙ্গল হয়ে গেছে। আলোক ভয়ে ভাবনায় এগুতে পারছে না আর। মা কৈ? মা! মা কি নেই!

নেই! দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, মহামারী কেটে গেছে এই তিন বছরের মধ্যে। কত রাস্তার কুকুর সোনার গদাতে বসেছে, আর কত ধনেজনে সম্পন্ন গৃহস্থ উচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আলোক জানে সে কথা। ভয়ে ভয়ে উঠোনের মাঝে এসে দেখলো, ঘরখানির দরজায় তালা বন্ধ। কেউ কোঁথাও নেই। সদর দরজাটা ওপাশ থেকে বন্ধ। বাড়ীর লোক যেন বাড়ী ছেড়ে কোথাও চলে গেছে বহুদিন—এই রকম মনে হ'ল, কিন্তু ছিল তো একমাত্র মা। মা কি চলে গেল, নাকি মরেই গেল? নাকি......... আলোক চিন্তাটা শেষ করতে পারছে না।

কিন্তু দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ভাবা যায়? আলোক ভাঙা ঘরের উদ্দেশেই প্রণাম করে আবার খিড়কীর পথে কচুবনে ফিরে এলো। তারপর ঘুরে সদর রাস্তায় আসতেই দেখা হোল মহিমের সঙ্গে। মহিমই ব্যাগ্র প্রশ্ন করলো,—কখন এলে বাবা আলোক? কবে ছাড়া পেয়েছ? এসে উঠলে কোথায়?

—এই আসছি! মা কোথায় মহিমকাকা? মা কি নেই?

আলোকের চোখের জল এবার উপচে পড়বে; মহিম কি বলে শুনবার জন্যই যা অপেক্ষা।

—নেই কেন? তোমার মা......একটু ভেবে মহিম বললো—আছেন, স্বর্গে আছেন।

ধূলোয় আছাড় খেয়ে পড়লো আলোক। ওর আর কিছু নেই, কিছুই আর যেন ওর রহিল না। মহিম ওকে তুলবে, এক মিনিট তবু থেমে রইল মহিম; এর মধ্যে পাশের বাড়ীর শ্যামার মা, আর ও-পাড়ার অতুলবাবু এসে পড়লেন। সকলে মিলে তুললেন আলোকনাথকে।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

—ওকি! অত দুর্ব্বল হলে কি চলে? মা বাবা কারো চিরকাল থাকে না।

সেই পুরাতন সান্ত্বনাবাক্য। ওতে কোন কাজ হয় না। ওর শান্তিদায়িকা শক্তি বহুদিন নিঃশেষ হয়ে গেছে। মা বাবা চিরকাল থাকে না, কিন্তু দেশসেবার অপরাধে দণ্ডিত ছেলে মা'র মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হতে পারে না—এমন ব্যাপারও পৃথিবীর আর কোনো দেশে হয় না।

তবু আলোক আপনিই সান্ত্বনা লাভ করলো; আপনার মনেই ঠিক করলো, তার জীবনের যা কিছু বন্ধন আজ ছিন্ন হয়ে গেছে। এবার সে বেরিয়ে পড়বে—বেরিয়ে পড়বে পথে, যে পথ জীবন-সাধকদের শুদ্ধ পদরেণুতে পূতঃ, পরিকীর্ণ; যে পথে রুদ্রদেবতার আহ্বান শঙ্খ বাজে আর বাজে, যে পথ অনন্ত বন্ধনকে অস্বীকার করে, লাভ ক্ষতির ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে মহতোমহীয়ান জীবনের মহাবিপ্লবে ঝঙ্কারিত, সেই পথে।

মহিমের স্ত্রী-কন্যা-পুত্র সাদর আহ্বান জানালো ওকে। ওর স্নেহশীলা মা নেই, কিন্তু স্নেহের অভাব হোল না। গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী থেকেই ডাক এল তাকে স্নানাহার করবার জন্য। কিন্তু আলোক কোথাও গেল না। উপবাসী থেকে মা'র শ্রাদ্ধ করলো বাড়ীতেই, স্বহস্তে রান্না করলো পিণ্ডাদি, পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্র বললেন,

"অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্……"

মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গভীর একটা ভাব জেগে উঠছিল আলোকের অন্তরে।…অদগ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, পিশাচ, যক্ষ রক্ষ, পন্নগ খগ, সকলের জন্যই শ্রাদ্ধের মধ্যে শ্রদ্ধার ব্যবস্থা করে গেছেন আর্য্যঋষি। পুরুষানুক্রমে এমন করে শ্রদ্ধা জানাবার অধিকার আর কোনো জাতিই হয়তো দেন নি উত্তরাধীকারীকে। কিন্তু শুধু শ্রদ্ধায়ই এই উত্তরাধিকার!

শুধু কি পিতৃপুরুষের নামের আর কাজের গৌরব নিয়েই বেঁচে থাকবে আর্য্যবংশধর। অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, সনক, সনন্দ কি আর জন্মাবেন না? অপুত্রক ভীষ্ম কি এমনি অযোগ্য উত্তরাধিকারী রেখে গেছেন?

না—না—না; আলোকের রক্ত যেন নেচে উঠলো 'না' কথাটা। শ্রাদ্ধ শেষ করে সে প্রণাম করলো সূর্য্যদেবতাকে পিতৃগণকে, পরে তার অন্তরস্থিত আত্মাকে যে আত্মা যুগযুগান্তরে গৌরবান্বিত ঐতিহ্যে আর ইতিহাসে অমর, অম্লান অনলস—যে আত্মার ক্ষুধা আজ রুদ্রদেবতার মন্দিরদ্বারে মরণজয়ী হবার সাধনা করবে, যে আত্মা রচনা করবে আগামী সহস্রাব্দির বেদ-পুরাণ-ইতিহাস-উপনিষদ!

পরদিন সকালে গ্রামের লোক দেখলো, আলোকের বাড়ীর দরজায় পূর্ব্ববৎ তালা ঝুলছে। আলোক নাই!

উত্তর কলিকাতার একটা সরু রাস্তাকে চওড়া করা হচ্ছে। দুপাশের বাড়ীগুলো ভাঙ্গা হচ্ছে, কোনোটা পুরো ভাঙ্গা হয়েছে, কোনোটা আধভাঙ্গা, ইট, কাঠ, চুণ, সুরকী গাদা হয়ে আছে, তার সঙ্গে রাস্তা তৈরীর সরঞ্জাম ও রাত্রের বিপদ-সূচক লাল আলো-জ্বালা লণ্ঠন, বিপদ-জ্ঞাপক কাঠের সাইনবোর্ড ইত্যাদিতে স্থানটা গহন অরণ্যের মত। সন্ধ্যের পর ঐ জায়গার মানুষগুলিকে আরণ্যক প্রাণী মনে হয়। ওরা সত্যিই আরণ্যক, যাযাবর, জীবনের জাতি-কুলহীন অঙ্কুর।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ ঐ রাস্তাটার পাশে একটা পুরোনো ডাষ্টবীনের ধারে গোটা চার-পাঁচ ছেলেমেয়ে কি যেন খুঁজছে। এ রাস্তার বাসিন্দারা বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে অনেকদিন, কাছেপিঠে অলিগলিতে যারা থাকে তারাও এতদূরে কেউ ময়লা ফেলতে আসে না ডাষ্টবীনে। ওটা আজকাল শূন্যই থাকে। কিন্তু আজ ঐখানে সন্ধ্যাবেলা

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

রাস্তা-মেরামতকারী মজুরগুলো খাবারের কয়েকটা ঠোঙ্গা ফেলে দিয়েছে, তারই ভেতর থেকে খাদ্যকণা সংগ্রহের চেষ্টায় ফিরছে ছেলেমেয়ে কটা। তিনটে ছেলে, চোদ্দ, দশ, আট বছরের আর দুটো মেয়ে, বারো আর নয় বছরের। বড় ছেলেটাই তাদের সর্দ্দার,—ডাষ্টবীনটার ভিতর ঢুকে পড়ে সব ঠোঙ্গাগুলো বগলে নিয়ে সে বেরিয়ে এলো—বাকী কয়জন কাড়া-কাড়িই করতো কিন্তু সর্দ্দার ধমক দিল—হট্—হট্ যাও! হামি সব ঠিক ঠিক দিয়ে দেবে।

বলে সে প্রথম দুটো ঠোঙ্গা দিল বড় মেয়েটাকে, একটা দিল ছোট মেয়েটাকে। বাকী দুটো ছেলেকে এক একটা করে দিয়ে সবকটাই নিজে নিল—খানিকটা তফাতে ভাঙ্গা একটা বাড়ীর ইটের উপর বসলো। গ্যাস-লাইটগুলো জ্বলছে, বেশ দেখা যাচ্ছে—জীবনটুকু বাঁচাবার জন্য ওরা সেই ঠোঙ্গাগুলোই চাট্‌তে লাগল। ছোট মেয়েটার ঠোঙ্গায় হয়তো একটু বেশি খাদ্য ছিল, মাঝারি ছেলেটা এসে তার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে আলুর টুকরোটুকু জিভদিয়ে চেটে নিল এক নিমেষে, মেয়েটা কেঁদে উঠলো—এঁ্যা—আমার—আমি দিবো না!!

চটাৎ করে একটা চড় পড়লো অপহরণকারী ছেলেটার গালে। চড় মারলো বড় মেয়েটা—কেন নিলি, কেন তুই নিলি ওর ঠোঙ্গা!

—বেশ করিছি—বলেই সেও মারল মেয়েটার পিঠে একটা চাপড়। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে কামড়া-কামড়ি, ঝটাপটি। ঐ এক কণা খাবারের জন্য ওরা মরেই যাবে হয়তো ঝগড়া করে। জীবনদেবতার ক্রুদ্ধ ভ্রূকটিকে ওরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে যে ব্যবধানটুকু, ওরা তার সদ্ব্যয় করে শুধু ডাষ্টবীন খুঁজে আর পকেট মেরে। ওরা জীবনের বিকৃতাঙ্কুর।

ঝগড়াটা হয়তো ভীষণাকার ধারণ করতো, কিন্তু দূরে একটা পুলিশ আসছে দেখা গেল, অমনি দৌড়, কে যে কোথায় গিয়ে লুকুলো কে জানে।

ভাঙ্গা বাড়ীগুলোর ইটের তলায় তলায় ওরা ভাঙ্গা ইটের মতই মিশে গেল। প্রায় দশ মিনিট, পুলিশ প্রবর চলে গেলেন সোজা, আবার ওরা বেরিয়ে এল সেই ডাষ্টবীনের কাছে। হয়তো ঝগড়াটা আবার লাগত কিন্তু বড় ছেলেটা এসে বললে মেজোটাকে—এই, ইধার আও; থোড়া কুছ দেখেগা, ইসমে কুছ নেই হুয়া। দুজনে ওরা চলে গেল কোন দিকে কে জানে। বাকী তিনটে ঐখানেই একটা ভাঙা বাড়ীর রকে শুয়ে পড়লো। ছোট মেয়েটি বললে শুয়েই—বড্ড খিদে পাচ্ছে।

—ঘুমো ঘুমো! বললো বড়টা!—ঘুমুলেই খিদে থাকবে না!

জীবনের এই নিষ্করুণতা আর নিঃসহায়তা দেখছিল আলোক একটা আধ ভাঙা বাড়ীর ভগ্নপ্রায় একটি কুঠরীতে শুয়ে শুয়ে। খবরের কাগজ পেতে ও শুয়ে আছে, গ্যাসলাইটের একটু আলো এসে পড়েছে সেখানটায়, সেই আলোকেই আলোক একখানা বই পড়তে চেষ্টা করছিল—বইটা মহা বিপ্লবী রাসবিহারীর ক্ষুদ্র জীবনী। ক্ষুদ্র জীবনী। ওঁর বৃহৎ জীবনী প্রকাশ করার কথা বাংলা দেশ ভুলে গেছে, ভারত মাতা হয়তো মনে রাখেন না তাঁর এই আজন্ম-বিপ্লবী স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক পুত্রটিকে? পুত্র হয়তো ভাগ্যদোষে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে নি, কিন্তু স্বাধীনতার তপস্যা-ভূমিতে সেই যে অগ্রজ, একথা কে আজ মনে রাখে? কীইবা মনে রাখে এই জাতি? কতটুকু? যে বাঙালী স্বরাজ সাধনার আদি মন্ত্রের উদ্গাতা, আজ সেই বাঙালী, উপেক্ষিত ভারতবাসীর কাছে, ভেদে বিভেদে বিযাক্ত, আত্মকলহে আত্মহত্যা করতে বসেছে! যে বাঙালী জীবনের সাধনায় জগৎ সভায় বরেণ্য হয়েছে, তাকে হীন করার জন্য আজ কত না প্রচেষ্টা প্রদেশান্তরে, কত না কুট কৌশল বড় বড় নেতার মস্তিষ্কে! বড় বড় বাণী আর উদার নীতিকথার আড়ালে বাংলাকে শোষণ করার সবরকম উপায় আর উদ্যোগ তাঁদের ব্যবহারে প্রকাশ,—তবু বাঙালী

ওঁদেরই গুণগান করে, ওঁদের কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে কবিতা লেখে, ওঁদের পায়ে শ্রদ্ধার সহস্র প্রণতি জানায়।

রাসবিহারীর জীবন-কথা পড়তে পড়তে আলোক ভাবছিল, এত বড় বীর এই বাংলার সন্তান—অগ্রজ আমাদের, তার জন্য কি-কতটুকু আমরা করেছি? তাঁর মৃত্যুর সংবাদ কবে যেন কাগজের এক কোণায় পড়েছিলাম মনে আছে—ঐ পর্য্যন্তই। ভারতের অন্য প্রদেশের কাগজে সে সংবাদটুকুও ছাপা হয়েছে কি না কে জানে? এই জাতি, এই আমাদের জাতীয়তা! এরই গৌরবে আমরা বুক ফাটিয়ে চীৎকার করি—স্বরাজ দাও, নাহলে উপোস দিয়ে মরবো—অহিংস হব, অসহযোগ করবো!

হুড়হুড় একটা শব্দ। আলোকের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। পরক্ষণেই হুটপাট করে ঢুকলো দুটো ছেলে ওর সেই প্রায়ান্ধকার ভাঙা ঘরটুকুর মধ্যে। ঘরের কোণায় অন্ধকারে ওরা মিলিয়ে যেতে চাইছে, আলোক ব্যাপার কি, বুঝতে না পেরে মৃদু গলায় শুধালো—ক্যা হুয়া রে?

—চুপ! শালা পুলিশ! হাত ইসারায় ওরা বারণ করলো কথা কইতে। আলোক বাইরে উঁকী দিয়ে দেখলো, দুজন পাহারওয়ালা প্রকাণ্ড লাঠি হাতে খুঁজতে খুঁজতে আসছে, এখুনি এসে পড়বে এবং ঐ ছেলে দুটোর সঙ্গে অলোককেও ধরে নিয়ে যাবে। সে উঠে বসে হাতের বইখানা ওদের সুমুখে ধরে দিয়ে বললো—পড়ো পড়ো—আলেফ, বে—পে—তে

—আলেফ, বে, পে, পে

—পে নেহি—তে—পড়ো ঠিক্‌সে

—আলেফ—আলেফ—আলেফ—বড় ছেলেটা বার তিন চার বললো কথাটি। পুলিশ দুজন উঁকি দিয়ে দেখলো, মৌলুবী দুটো ছেলেকে

পড়াচ্ছে। নিঃশব্দেই চলে গেল তারা। অনেকটা দূর যাওয়া পর্য্যন্ত আলোক পড়াতে লাগলো—জীম্ চে হে খে দাল্

—জীম্ চে হে খে দাল······বেশ পড়ছে ছেলে দুটো। আলোকের মাথায় ভাগ্যিস একখানা গান্ধীটুপী ছিল, দূর থেকে তাকে মৌলুবীর টুপী ভেবেছে পুলিশ দুজন।

—কি হয়েছিল র‍্যা? এতক্ষণে আলোক জিজ্ঞাসা করলে বড় ছেলেটাকে।

—আপনাকে বহুৎ বুদ্ধি আছে বাবুজী। হইছিল কি জানেন, হইয়ো খাবার ওয়ালা—শালালোক ঝাঁপ বন্ধ করছিল; উসকো ঘরমে যাইলাম কুছ খাবার মাংনে; হাত বাড়ায়ে দুটো জিলিবী আউর চারঠো পুরি লিয়েছি আর ও শালা চিল্লাচিল্লি করে দিল, শালা পুলিশ লোকভি কুথাসে আইল—হামিলোগ ভাগলাম—ব্যাস্! আউর কুছ্ হইছিল না। আচ্ছা বাবুজি, সেলাম। আপ আজ জান বাঁচাই দিলে—বহুৎ বহুৎ সেলাম। আওরে দুধ-পুরিয়ার!

দুধপুরিয়ার হয়তো ছোটটার নাম। আলোক বড়টার নাম জানতে চাইলো।

—তোর নাম কি?

—হামার! হামার নাম আছে নওকিশোর। হামার মাই রাখিয়াছে! সেলাম।

ওরা চলে গেল বেরিয়ে। ঠিক স্কুলের ছুটির পর ছেলেরা যে আনন্দে বাড়ী যায়, তেমনি আনন্দেই যাচ্ছে। একটু আগে যে ওদের পুলিশ তাড়া করেছিল, সে কথা মনেই নাই হয়তো! আলোক চেয়ে দেখতে লাগলো, সেই রকটার কাছে গিয়ে নওকিশোর ডাক দিল—রাধা, এই রাধা উঠ, উঠ খা!

রাধা অর্থাৎ বড় মেয়েটা উঠে আবার ডাকলো ছোটটাকে—ঝুমলি...

এ ঝুমনি সবাই ওরা উঠে পড়লো। নওকিশোর কোঁচড় থেকে বার করলো পুরি আর জিলেপি। আপন হাতে ভাগ করে দিল সকলের মধ্যে; নিজে অবশ্য সিংহের ভাগই নিল।

কী অদ্ভুত জীবন ওদের! পরম আনন্দে ওরা সেই সামান্য খাদ্য ভাগ করে খেতে লাগলো। জীবনের রুদ্র ওদের ক্ষুধাদেবতা! সাম্য, মৈত্রী, প্রীতির বন্ধনে ওদের আবদ্ধ রেখেছেন। দুঃখে সুখে ওরা সমব্যথী সম অংশীদার। আলোক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো,—রাস্তার পাশের কলটার নাটখুলে ফেললো কিশোর, পেটভরে জল খেল সবাই, তারপর ঝুমনিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে নওকিশোর রকটার একদিকে শুয়ে পড়লো—ঘুম যা রে, এ ঝুমনি! আনন্দ বা নিরানন্দ দুঃখ বা অবসাদ ওদের কাছে একাকার। ওরা জীবনকে রক্ষা করে কেন? কি উদ্দেশ্যে? কে জানে!

শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে করতে কখন যে আলোক ঘুমিয়ে গেছে, কে জানে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বৃষ্টি নেমেছে, ছাট্ আসছে ঘরের মধ্যে। স্তিমিত গ্যাসের আলোতে দেখতে পেল—রক্ থেকে সেই নওকিশোরের দল উঠে একটা ভাঙা ঘরের কোনায় জড় সড় হয়ে বসছে গিয়ে। আলোকের কাছ অবধি এলে ওরা আর একটু ভাল ভাবেই থাকতে পারতো, কিন্তু এতটা আসতে হয়তো ভিজে যাবে।

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি! বহুদূরে সাবধানী আলোগুলোর লাল চোখ যেন হিংস্র জানোয়ারের চোখের মতই দেখা যাচ্ছে। আলোক আর ঘুমুতে পারবে না; গভীর রাত্রির নির্জ্জনতায় ওর চিন্তাশক্তি যেন তীব্র হয়ে উঠছে! জীবনকে জানবার সাধনায় ও যেন আজ শবসাধক

সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক কাপালিকের মত মহানগরীর এই মহাশ্মশানে তপস্যানিরত;

লম্বা একটা ছায়া ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ভাঙ্গাবাড়ীটার পাশের সরু গলি দিয়ে। কে আসে এত রাত্রে, এই দুর্যোগের মধ্যে? আলোক মাথাটা সরিয়ে আত্মগোপন করলো। ছায়া এগিয়ে আসছে; প্রেতের ছায়া, নাকি মানুষের? ধীরে, অতি সাবধানে বেরুলো একটা মূর্ত্তি গলি থেকে, আপাদমস্তক চাদর ঢাকা। কিন্তু ও নারী! নারী—সেটা বোঝা যাচ্ছে ওর চলন ভঙ্গীমায়, ওর পশ্চাতের নিতম্ব-দোলনে! নারী—এবং যুবতী। ও কাঁপছে যেন, জলে ভিজে হয়তো শীত লেগেছে, কিম্বা ওর অন্তর হয়তো কোন কারণে সিক্ত, করুণাক্ত হয়ে উঠেছে। আলোকের মনে হোল, হয়তো ও নিরাশ্রয়া, কিম্বা, অভিসারিকা, কিম্বা,—কিন্তু কিছুই ভাববার দরকার হোল না। নারী ধীরে এগিয়ে গেল ডাষ্টবীনটার কাছে—চাদরের ভেতর থেকে ছোট একটা পুঁটলি নামালো প্রথম ডাষ্টবীনের বাইরে শানবাধানো যায়গাটুকুতে, নির্নিমেষ নয়নে হয়তো দেখলো একবার, তারপর চলে আসছে, কিন্তু আবার ফিরে গিয়ে পুটলিটি তুলে ডাষ্টবীনের ভেতর অতি সাবধানে রেখে দিল। আলোক দেখলো,—ফিরে যাচ্ছে হতভাগী, গ্যাসের আলোতে ওর দুটো গাল চক্‌চক্ করছে জলের ধারায়। পুষ্পের মত পেলব, সুন্দর একখানি মুখ—আলোক নিমেষমাত্র দেখতে পেল।

চলে গেল মেয়েটা, গলিপথে ঢুকে পড়লো। আলোকও বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে গলিটার ভেতর ঢুকে অনুসরণ করলো তার। এ গলি, ও গলি পার হয়ে প্রায় দশ মিনিট হেঁটে সে এসে থামলো মস্তবড় একটা তিনতলা বাড়ীর খিড়কী দরজায়। ঠুকঠুক টোকা দিল—দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে পড়লো মেয়েটি।

ফিরে এলো আলোক। ফিরে এসে গেল ডাষ্টবীনটার কাছে।

পুটলিটি নড়ছে, ভালো করে চেয়ে দেখতে পেল, সদ্যজাত শিশু একটি। মুখখানা চমৎকার। গায়ের রঙ দূরস্থিত গ্যাসের মলিন আলোতেও পদ্মপাতার মত মনে হচ্ছে। ওকে বিসর্জ্জন দিয়ে গেল হয়তো ওর মা, জন্মদাত্রী ধাত্রী ওর!

আলোক ফিরবে কিনা ভাবছে, কোথা থেকে শঙ্খধ্বনি কাণে ভেসে এলো। আবার কে জন্মালো হয়তো—যাকে শুভ আবাহন জানাবার জন্য শঙ্খ বাজে—উৎসব জাগে!

ডাষ্টবীনের ছেলেটাও হঠাৎ কেঁদে উঠলো,—টুয়াঁ! বিকৃত শঙ্খধ্বনি ওর!

ওর আবির্ভাবের তুর্য্যনাদ ও নিজের কণ্ঠেই ধ্বনিত করলো। ওর জীবন দেবতার মন্দিরে উৎসর্গীত হবে না—শান্তির দেবতা, গৃহের অধি দেবতা ওকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু রুদ্র দেবতা ওকে কোল দেবেন—ওকে রক্ষা করবেন!

পুলিশ ডাকবে নাকি আলোক ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্য? ডাকাই তো উচিৎ মনে হয়।

পথে-পড়া এমনি কত ছেলেমেয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছে; আবার কত লক্ষ পথের ধূলায় মিশে গেছে—আলোক ভাবতে লাগলো এই ছেলেটার কি হবে! কী ওর নিয়তি? কিন্তু এমন করে আর বেশীক্ষণ পড়ে থাকলে ও তো এখুনি মরে যাবে। মরে না গেলেও জলে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে ওর নিউমোনিয়া হবে—তারপর দুচার দিন ভুগে মরবে; কিন্তু ভোগাবার জন্য ওর জীবনটুকুকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধবার তো কেউ নেই! স্নেহময়ী জননী ওকে ত্যাগ করে গেল, জগতের শ্রেষ্ঠ স্নেহ থেকে ও বঞ্চিত হোল; তথাপি ও বাঁচতে চায়। উঃ কি আকুলি-বিকুলি করছে বাঁচবার জন্য? একটু মুক্ত বায়ুতে শ্বাস নেবার জন্য কী প্রাণান্ত পরিশ্রম ওর! স্নেহ নাই, মমতা নাই, পিতৃ-মাতৃ পরিচয় নাই,

বাঁচার কোন আশা পর্য্যন্ত নাই, তবু ও বাঁচতে চায়। একেই বলে জীবনের বন্ধন, কঠোর, নিষ্ঠুর অনস্বীকার্য্য অনতিক্রম্য বন্ধন। কিন্তু ওকে স্নেহ দেবে আঁকাশ বাতাস, মমতা মাখিয়ে দেবে ধরণীর ধূলিকণা, রূপরস-গন্ধের আস্বাদ দেবে শ্যামা ধরিত্রী, সূর্য্যালোক, চন্দ্রকিরণ, অনন্ত নীলাকাশ—কিছু নাই কেন? আছে—সবই আছে—নাই শুধু স্বাধীন-ভাবে। পরাধীন জীবনের বন্ধনবেদনায় দ্বিশতাব্দীর ইতিহাসের কলঙ্কিত মসীতে লিপ্ত হয়ে আছে সবই। সে কলঙ্ক স্খালিত না হলে শ্মশানচারী এই জীবনের রুদ্র গৃহবাসী হবেন না—গ্রহণ করবেন না পূজা।

আন্ম্যারেড্ মাদার্শ—ইল্লেজিটিমেট্ চাইল্ড ;—অবাঞ্ছিত কিন্তু জাতির কি কেউ নয়? কেন: নয়? কার বিধানে নয়?—আলোক ভাবছে; বৃষ্টিটা আবার চেপে এলো—ভিজে যাচ্ছে ন্যাকড়ার পুট্‌লিটা, তার সঙ্গে কান্না—টুয়া···আর দেরী করতে পারে না আলোক, দুহাত বাড়িয়ে ওকে তুলে নিল—নিয়ে এল তার আস্তানায়। খবরের কাগজপাতা বিছানায় সযত্নে শোয়ালো তাকে, দেখলো, সুন্দর শাদা রং—যেন সাহেব বাচ্ছা! হবে! যুদ্ধের বাজারে বহু সাহেবই তো এদেশে বহু কেলেঙ্কারী করে গেছে—এই শিশু যে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী নয়, কে বলবে! রবীন্দ্রনাথের গোরার কথা মনে পড়লো, কিন্তু না, গোরা সত্যি গোরা! জাবালাপুত্র সত্যকামের কথা মনে হোল, মনে হোল পরাশর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কথা, মনে পড়লো ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথা। ঐতিহাসিক চন্দ্রগুপ্তের কথা এবং আরো অনেকের কথা হয়তো মনে পড়বে, ভারতের শতশতাব্দীর সঞ্চিত ইতিহাসে উদাহরণের অভাব নেই, কিন্তু ছেলেটা চিঁচিঁ করে চেঁচাচ্ছে। ওর ঠাণ্ডা লাগছে, হয়তো খিদেও পেয়েছে। আলোক তার শুকনো গামছা দিয়ে ওকে মুছতে গিয়ে দেখতে পেল, গলায় দাগ—ওকে গলাটিপে মেরে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছিল নিশ্চয়—ওর মা'ই সেই নিষ্ঠুর কার্য্যের নিয়ন্ত্রী। কিন্তু মা নিষ্ঠুর হতে পারে নি—হতে পারে নি, তার প্রমাণ,

মা'র আঙ্গুলের দৃঢ়তা শ্লথ হয়ে গেছে, নাহলে ও মরেই যেতো। মারতে গিয়েও মা মারতে পারে নি। মা—সবসময়েই সে মা।' তবুও মানুষের বিধান, মাতৃত্বকে অতিক্রম করেও সে বিধান সন্তানের গলায় ফাঁসির আঙ্গুল বসিয়ে দেয়।

আলোক মুছে ফেললো ছেলেটার সর্ব্বাঙ্গ। চমৎকার রং, সুন্দর গড়ন—সবল, সুস্থ, প্রাণ-চঞ্চল শিশু। ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদছে। "ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাং"—হে মহাদেবী, মহাজননী, সর্ব্বভূতের ক্ষুধারূপে তুমিই বিরাজমানা,—খাদ্যরূপেও তুমি। ক্ষুধিতের খাদ্য যুগিয়ে দাও মা—আলোক প্রার্থনা করে উঠে পড়লো কিছু সংগ্রহের জন্য। কিন্তু এখনো রাত রয়েছে। কোথায় খাদ্য এই ভাঙ্গা বাড়ীর অরণ্যে? ইট-কাঠ-পাথরের মরুভূমিতে, মানুষের পরিত্যক্ত শ্মশানে খাদ্য কোথায়? তবু আলোক চেষ্টা করবে। বৃষ্টির মধ্যেই সে বেরিয়ে পড়লো!

যতদূর যায়, আশা ক্ষীণতর হয়ে আসে। কোথাও কেউ জেগে নেই। আধমাইল প্রায় এসে পড়লো আলোক। এতক্ষণ হয়তো কুকুর শেয়াল গিয়ে ছেলেটাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। হয়তো তার জন্য বিশ্বমাতা কোনো খাদককে প্রেরণ করেছেন, যে ওকেই খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে; ওকে মুক্তি দেবে জড়-জগতের ক্ষুধা-তৃষ্ণার বন্ধন থেকে! হয়তো এতক্ষণে মুক্ত হয়ে গেছে সে!

আলোক ফিরতে লাগলো ত্বরা করে। পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল। যদি বেঁচে থাকে তো, ওকে কোনো আতুর-শালায় দিয়ে আসবে আলোক! ভোর হয়ে এলো। পূর্ব্বাকাশ অরুণের প্রকাশ-বেদনায় রাঙা হয়ে উঠেছে। অন্তরের অন্ধকার ভেদ করে আলোকের জীবন-রুদ্র জটাজাল মেলে ধরছেন। ধূসর-পিঙ্গল জটা, দীপ্ত মরীচিকাময়,—রহস্য যেন তাতে অবলিপ্ত। ভালো দেখা যায় না—তবু যেন দেখা যায়, আলোকের জননীর ক্রোড়ে আলোক—অসহায়, আর্ত্ততায় সন্তানস্নেহাতুরা

মাতা ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন—অন্ন দাও, দাও

আলোক সেদিনের কথা স্মরণ করতে পারে না, শ্রুতিতে জাগছে জননীর কণ্ঠস্বর—'বড় দুঃখে তোকে মানুষ করেছি আলোক, দেশজননীর সেবায় তোকে উৎসর্গ করে দিলাম!' —উৎসর্গ করে দিয়ে তিনি অমরলোকে চলে গেছেন। আলোক এরপর দেশমাতৃকার পূজাবেদীমূলে আত্মবলি দেবে। কিন্তু আরো অনেককে সে ঐ বেদীমূলে আনতে পারে —ঐ নওকিশোর, ঐ রাধিয়া, ঝুমনি, ঐ সদ্যজাত শিশুটি—তাদের সকলকে আলোক আনতে পারে তার আরাধনার আশ্রয়ে। ঐ শিশুটি দেশমাতার সন্তান—সম্পদ। ওকে অমন করে মরতে দিতে পারে না আলোক। আলোক প্রায় ছুটে এসে পৌঁছালো।

আশ্চর্য্য ব্যাপার! কোথা থেকে একটা ভিখারী মেয়ে এসে জুটেছে। শিশুকে কোলের ভেতর নিয়ে ঘুমপাড়ানি গান বলছে—'খোকা ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো···" অদ্ভুত! খাদকের বদলে পালককে পাঠিয়ে দিয়েছেন বিশ্বমাতা! কিন্তু কে এই ভিখারিণী—কে তুমি! তুমি কোত্থেকে এলে?—আলোক প্রশ্ন করলো। মেয়েটা ভয় পেয়ে গেছে। শিশুটিকে আঁচল ঢাকা দিতে দিতে বললো,—আমি অপন্না গো, ভিখিরি!

—অপর্ণা? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কোথায় বাড়ী তোমার?

—বাড়ীঘর কি আছে বাবু? সে-সব অনেক কাল, সেই যুদ্ধুর বাজারে খোয়া গেছে! ছিলুম ঐ যে ঐ আঁধারপারা জায়গাটি, ঐখানে। ছেলেটার কাঁদন শুনে ছুটে এলুম!

—ও! কিন্তু ওকে নিয়ে কি করবে তুমি?

—তোমার ছেলে নাকি বাবু? তাহলে নাও,—মা কোথায় ওর? আছে? নাকি, নাই!

—আছে, কিন্তু সে আর আসবে না! তুমি ওকে মানুষ করতে পারবে?

—হাঁ, খুব—একগাল হাসলো অপর্ণা—কেউ ফেলে দিয়ে গেছে, নাকি বাবু? বুঝেছি! তাহলে ছেলে এখন আমার। ঘুমা-ঘুমা চু চু চু!

মাতৃত্বের স্বতঃপ্রকাশক অব্যক্তধ্বনি! স্নেহের বিগলিত অমৃত! আলোক মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলো—শীর্ণ-মলিন মেয়েটি! বয়স বাইশ কি বত্রিশ বোঝা যায় না—তবে তার বেশি নয়। একদিন ও সুন্দরী ছিল, সুরূপা ছিল, ছিল হয়তো সাধারণ গৃহস্থ ঘরের কন্যা, বধূ! কে জানে কোন দুগ্রহের ফেরে আজ ও পথে পরিজনহীন অবস্থায় পরের ছেলের মা হতে এসেছে। ওর মাতৃত্বের মধ্যেও সেই বিশ্বজননীর প্রকাশ! ধাত্রী ধরণীর সহিষ্ণুতায় সমাধিস্থ অনায়াস মূর্ত্তি! এই মাতৃত্বই মানুষকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেয়, পৃথিবীর সঙ্গে তার বন্ধন স্নেহের বন্ধন। প্রকৃতির শিক্ষায়তনে জীব প্রথম থেকে শিখতে পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কি—কোথায় তার স্নেহ-দয়া-মায়া,—ত্যাগ-ক্ষমা-তিতিক্ষার উৎসভূমি; কিন্তু আজকার বৈজ্ঞানিক যুগ একে অস্বীকার করছে, অপ্রাকৃত উপায়ে লালন করছে মানুষের ভ্রূণাঙ্কুরকে! কলে আর কৌশলে তৈরী মানুষ তাই যান্ত্রিক মানুষ,—সৈন্যদলে তার কাজ কলের কামানের কৌশলের সঙ্গে, সমাজে তার কাজ কলের মতই একঘেয়ে, শাশনতন্ত্রে তার কাজ স্বপ্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা, স্বৈরতন্ত্রে সে স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল, অমানুষ! কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে—বিপ্লবী হয় তার প্রাকৃতিক মন, তার সহজাত সংস্কার, তার সাধারণ আলোবাতাসে আসবার আকুতি! তাই মানুষের শিক্ষা মানুষের রাজ্যে যতই বৈজ্ঞানিক হোক, ব্যক্তিগত মানুষকে পূর্ণ মানুষ করার দাবী বিজ্ঞান কোনদিন করতে পারবে না। পূর্ণ-মানুষ শ্রীকৃষ্ণ পিতা-মাতার স্নেহ-বিচ্ছিন্ন হয়েও নন্দ-যশোদার অগাধ স্নেহে সন্তরণ করেছেন, উদ্দাম আনন্দে মাঠে-ঘাটে-বাটে খেলা করেছেন,

—অন্তরের স্বতঃ উৎসারিত প্রেমের পথে অবাধে বিচরণ করেছেন—তাই তিনি পূর্ণ, প্রকৃতির শিক্ষালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্র, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, সমাজ নীতিক, সাম্যবাদী।

—দুধ একটুক যোগাড় হয় না বাবু?

অপর্ণা বললে! আলোক জানে না, এককোটা দুধের জন্য মাতৃ অন্তর কেমনভাবে কাঁদে কিন্তু সে অনুভব করতে পারে। তার গর্ভধারিণীর অন্তরের উত্তরাধিকারী সে।—তাইতো! সকাল হয়ে এলো। দেখি যদি কোথাও কিছু পাওয়া যায়।

বলে আলোক ডাষ্টবীনটার দিকে অকারণে হেঁটে এলো খানিকটা। মনের অস্বস্তির আবেগ ওকে স্থির হতে দিচ্ছে না। বৃষ্টিটা আবার থেমেছে। আলোক আরো খানিক দূরে এসে দেখলো রকের উপর নওকিশোরের দল তখনও ঘুমিয়ে আছে। নিস্তব্ধ শান্ত ঘুম ওদের, নির্ভাবনায় নিবিড়! এখুনি উঠে কি খাবে, কোথায় যাবে কোনো চিন্তাই ওরা করে না। ওরা প্রকৃতির খাঁটি সন্তান। ওরা জীবনকে সত্যের আলোকে দেখতে শিখেছে, সে আলোক সূর্য্যের মত সত্য আলোক—চন্দ্রের ছায়াস্নিগ্ধ রহস্য যাতে একবিন্দুও নেই। যাতে নেই কল্পনার লেশমাত্র অনুরঞ্জন।

নিজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলো আলোক অকস্মাৎ; তার জরুরী প্রয়োজন রয়েছে একটু দুধ যোগাড় করবার আর কি সব বাজে, আগ্‌ডম্‌-বাগ্‌ডম্‌ ভেবে সময় নষ্ট করছে সে! এখন কি ওসব ভাববার সময়? ভেবে লাভই বা কি! আলোক গট্‌গট্‌ করে অনেকদূর হেঁটে চলে এলো। হ্যাঁ—দুধ দোয়ানো হচ্ছে একটা গোয়ালে। আট দশটা গরু, মোষ, দু' তিনজন গোয়ালা দুধ দোয়াচ্ছে। ঠিকানা না জেনেও ঠিক এসে পড়েছে আলোক দুধওয়ালাদের কাছে। একেই বলে নিয়তি, ভাগ্যচক্র। আলোক একজনকে বললে—চার আনার দুধ দিতে পার ভাই?

—হুঁ—লেবে কিসে বাবু? বর্ত্তন কাঁহা?

পশ্চিমে গোয়ালা ওরা, বাংলা দেশে পশ্চিমের গরু মোষ এনে দুধের সঙ্গে বাংলার জল মিশিয়ে বাঙালীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাচ্ছে। ওরা হেসে কথা কয়, মিষ্টি করে ডাকে, দিব্যি গেলে বলে—'এ্যায়সা দুধ আউর কাঁহা নেহি মিলেগা!' বাড়ী বাড়ী গিয়ে দিয়ে আসে দুধ। বাংলার জননী আর শিশু ওদের আশাপথ পানে চেয়ে থাকে। কিন্তু বর্ত্তন তো নাই, দুধ নেবে কিসে আলোক! দূরে একটা পশ্চিমা পিত্তলের পাত্রে গরম চা বিক্রি করে যাচ্ছে। তার কাছে মাটির ভাঁড়, আলোক তাকে ডেকে চার পয়সার চা খেলো, আর বড় একটা ভাঁড় সংগ্রহ করলো! চার আনার দুধ এমন কিছু বেশী নয় আজকাল! জলে দুধে পোয়াখানেক হবে। তাই নিয়ে আলোক ফিরছে। পেটে গরম চা পড়ায় ওর শক্তিটাও বেড়েছে একটু।

মা ছেলেবেলায় আলোককে দুধ খাওয়াতে পারেন নি। কতবার দুঃখ করে বলেছেন, দুধের বদলে ভাতের ফেন খাওয়াতেন আলোককে। সেই মা আজ নেই, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে কেমন করে কে জানে, কটি টাকা তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর গোপন কুলুঙ্গীর মধ্যে। শ্রাদ্ধের পর সেই টাকা কয়টি নিয়েই আলোক বেরিয়ে পড়েছে। সেই টাকা থেকে চার আনা নিয়ে আজ দুধ কিনলো, মা স্বর্গ থেকে দেখুন—মা'র সঞ্চিত টাকায় আলোক একটি নিরাশ্রয় শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারছে। আলোককে দুধ না খাওয়াতে পারার দুঃখ মা'র যেন না থাকে আর। কিন্তু হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মা এদেশে ছেলেকে দুধ খাওয়াতে পারে না—কে তা দেখছে! কে খবর রাখছে, দ্রোণাচার্য্যের মত কত পিতা ছেলেকে পিঠুলি জল খাইয়ে বলে—দুধ খাওয়াচ্ছি। নিরন্ন ভারতের নির্য্যাতিত জীবন শতাব্দী ধরে তো এমনিই চলে এলো।

চল্‌কে উঠছে দুধটুকু। আলোক অতি সাবধানে হেঁটে এলো; দূর থেকেই দেখতে পেল নওকিশোরের দল ঘুম ভেঙে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে

তার আস্তানার কাছে। দেখছে হয়ত ছেলেটাকে ওরা। আলোককে দেখে সবাই ওরা পথ ছেড়ে দিল। অপর্ণা বললে—দুধ পেলে বাবু? দাও!

ততক্ষণ অপর্ণা তার শুকনো মাইদুধ ওকে চোষাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সদ্যজাত শিশুর পক্ষে মাইদুধ টানা কষ্টকর। তবু ছেলেটা চুপ করে আছে। বড়লোকের বাড়ীতে জন্মালে এই ছেলের জন্য কত কি ব্যবস্থা হোত। রাস্তা যার আশ্রয়, তার জীবনীশক্তিও অসাধারণ। প্রকৃতি এসব সূক্ষ্ম ব্যবস্থা করে রেখেছেন—যে প্রাণী যতখানি যত্নে সন্তান পালন করতে পারে, তার সন্তানের জন্য ততখানি স্নেহ মমতাই দরকার। বাঘের বাচ্চা দুমাসেই স্বাবলম্বী হয়, গরুর বাচ্চা পাঁচ সাত দিনেই, কিন্তু মানুষের বাচ্চার স্বাবলম্বী হোতে বহুবছর লাগে। কারণ মানুষ প্রকৃতির দানকে স্বাভাবিক জীবনের গণ্ডীতে বদ্ধ রাখেনি। সে ঘর বেঁধেছে, সে রান্নাকরা খাদ্য খেতে শিখেছে. সে আধুনিক যন্ত্রপাতির সহযোগে অনেকখানি অপ্রাকৃতিক হয়ে উঠেছে। তার সন্তান পূরোমাত্রায় প্রাকৃতিক নয়, অনেকাংশে অপ্রাকৃতিক।

দুধটা এগিয়ে দিল—ধারোষ্ণ দুধ কিন্তু এতখানা পথে আসতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; গরম করে নিতে হবে। নওকিশোর চট করে ঢুকে পড়ল ঘরে। আলোকের বিছানার জন্য পাতা খবরের কাগজখানা গুটিয়ে গোল করে ট্যাঁক থেকে দেশালাই বের করলো। আগুন জ্বেলে গরম করে দিল দুধ। এর মধ্যে অপর্ণা একটা পলতে তৈরী করে নিয়েছে। আলোক এবং আর আর সকলে দেখছিল। পলতে চুষিয়ে দুধ খাওয়ানো চলতে লাগলো। যেন একটা উৎসব হচ্ছে, এমনি সাগ্রহে ওরা দেখছিল। বেশ খাচ্ছে ছেলেটা। নবকিশোর মিনিট দুই দাঁড়িয়ে দেখে বললে—চল সব—এ ঝুমনি, আ—যা।

ওর দল চলে যাচ্ছে এবার। আলোক বললো অপর্ণাকে—আমি কিছু খাবার আনি তোমার জন্য, কেমন?

—হুঁ—অপর্ণা মুচকী হাসলো।

আলোক সে-হাসির কোনো অর্থ করতে চাইলো না, চলে গেল। যাচ্ছে গত রাত্রের দেখা সেই মস্ত বাড়ীটার পাশ দিয়ে। প্রকাণ্ড পাঁচ-তালা বাড়ী ফ্লাট্-সিষ্টেমে তৈরী হয়তো—হাজার পরিবার ওতে বাস করে। ওদের পারিবারিক বন্ধনকে এ বাড়ীতে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব। ওদের পল্লীজীবনের সাংস্কৃতিক সংযোগ, দোল-দুর্গোৎসব, ব্রত-পার্ব্বণ; তুলসীমঞ্চ, শঙ্খপ্রদীপ এখানে প্রবেশাধিকার পায় না। এখানে নীড়বাসী বিহঙ্গের মত ওরা একবৃক্ষে হাজার পাখীর মত আরণ্যক। জীবন এখানে স্বস্থ এবং সুস্থ নয়। অনাচার আর ব্যভিচার এখানে আশ্চর্য্যের বিষয় তো নয়ই, বরং অনায়াসলভ্য! কিন্তু এই ফ্লাট-শিষ্টেম্ চালু হয়ে গেল এদেশে। চালু হতে বাধ্য, কারণ এমনি করে হাজার ছিদ্র দিয়ে এদেশের মানুষের মনের প্রাচীনতম দৃঢ়তা ভাঙবার চেষ্টাই চলেছে আজ দুশো বছর ধরে। শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমাজ, জীবিকা, জীবনোপায়, জন্মহার সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত, আর সে নিয়ন্ত্রণ বৈদেশিকের সুবিধার জন্য। এদেশের সুপ্ত জীবন-রুদ্র আজ নেশায় আচ্ছন্ন,—মাঝে মাঝে শুধু স্বপ্ন দেখে, যেন সে জেগে উঠেছে।

উঠেছে জেগে;—জাগরণের শঙ্খধ্বনি আজ আকাশে-বাতাসে ঝঙ্কারিত; যুদ্ধোত্তর ভারতের শিল্প-সম্পদ, সমাজচেতনা, শাসন-নীতি সব কিছুর মধ্যেই জাগরণের ইঙ্গিত এবং সঙ্গীত। কিন্তু এই জাগরণ যাদের স্বার্থকে প্রতিহত করবে, তারাও চুপ করে বসে নেই। ভেদনীতির সঙ্গে বিদ্বেষের বিষে আর বিজাতীয়তার স্বৈরাচারে তাহা কলঙ্কিত করে দিচ্ছে পূতঃ গঙ্গোত্রীর স্বচ্ছ সলিল, মলয় বাতাসের স্বাস্থ্য সঞ্চারণ; অপবিত্র করে দিচ্ছে আহিতাগ্নিকে অনায়াসলভ্য, অন্যায়ভাবে লভ্য ধন-জন-যশ-ঐশ্বর্য্যের ইন্ধন দিয়ে।—এ জাগরণ তাই আত্মহত্যাকেই আশ্রয় করে রয়েছে—আত্মরক্ষার উপায় করতে সে এখনো সচেষ্ট হোল না।

বড়ো বাড়ীখানা পার হয়ে আলোক একটা বড় রাস্তায় পড়লো। সারিবন্দী মিলিটারী গাড়ী চলেছে—ছেদহীন শ্রেণী, উল্লাসে উদ্দাম ওদের চালকগুলো। লাল মুখ—মদ্যপানে স্ফীতচক্ষু ভোগের অবসাদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ওরা, তাই ভোগের অনুপান সংগ্রহেই চলেছে হয়তো, হয়তো এই শ্রেণীবদ্ধ অভিযান ভোগকেন্দ্রকে লক্ষ্য করেই পরিচালিত হচ্ছে। কয়েকদিন আগের একটা সংবাদের কথা মনে পড়ে গেল, চট্টলের সংবাদ, মহাদেবী যে চট্টলে লকলক লোলজিহ্বা বিস্তার করে অবিশ্রাম জ্বালিয়ে রেখেছেন ভারতের যুগার্জিত পুণ্যাগ্নি শতাব্দী-সঞ্চিত ধর্ম্ম-শিখা। কিন্তু সব চলে যাবে, সমস্তই নষ্ট হয়ে যাবে। শক-হূণ-তাতার, গ্রীক, পাঠান-মোগল, যা করতে পারেনি অস্ত্রবলে,—ইংরাজ বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে তাই করলো,—দেশটাকে সত্যরিক্ত, ধর্ম্মদ্বেষী, মনুষ্যত্ববিরোধী নীতিতে অভ্যস্ত করিয়ে সোণার খাঁচায় পুরে বুলি পড়াচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়েকটা তাঁবেদারের কণ্ঠে। বড় বড় বুলি, মোটা মোটা শ্লোগান, গালভরা ইংরাজী নাম—গণতন্ত্র, বিপ্লববাদ, ইন্‌ট্রিম গভর্ণমেণ্ট, কোয়ালিশেন, প্রপোজ্যাল, গ্রুপিং—কতকি! ওর ভেতরে ভেতরে ভেদ-নীতির ধ্বংসাগ্নি,—আত্মকলহের অচিকিৎস্য গরল, আত্মনাশের অদৃশ্য আঘাত!—চমৎকার!

খাবারের দোকানগুলো এখনো খোলেনি। ভেতরে তারা কচুরী সিঙাড়া ভাজছে। ভেজাল ঘি-এর বিশ্রী দুর্গন্ধ, মানুষের খাদ্যের মধ্যে প্রেতভোগ্য আবর্জনা! কিন্তু ওইগুলোই খেতে হবে—খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে। জীবন্মৃত করে বাঁচিয়ে রাখার আয়োজন সম্পূর্ণ করে এনেছে ওরা—নেশায় নিস্তেজ, অখাদ্যে অপদার্থ, বিলাসে ব্যাভিচারী জীবনের ক্লৈব্য-ক্লিন্ন বেঁচে থাকা—বন্ধনদশাকে বিলম্বিত করবার জন্য বাঁচিয়ে রাখা! কিন্তু ওরা জানে না, এদেশে বিষপায়ী নীলকণ্ঠ জন্মায়—নেশায় নির্জীব শিব শ্মশানে শুয়ে বিশ্বের কল্যাণের স্বপ্নে বিভোর

থাকে;—তাঁর ধ্বংসের শূল একদিন জাগবে—জাগবেই। সেই রুদ্র-দেবতার জাগরণের কাজটাই ওরা আপনার অজ্ঞাতসারে করে দিচ্ছে! ওদের নিয়তি, ওদের শতাব্দীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন নিকট হয়ে এলো—নিমিলিত আঁখি জীবনরুদ্র আজ চোখ মেলছেন—তাঁর বিশ্বধ্বংসী শূল উদ্যত হচ্ছে।

আলোক একটা দোকানের কাছে এলো। জিলিপী আর খান কয়েক কচুরী কিনলো—ঠোঙায় ভরে ফিরছে। ওর কাছে এখনো আছে কয়েকটা টাকা-পয়সা। আরো দু-দশ দিন চলে যেতে পারে, তারপর! তারপর কি? চিন্তা করবার কোনো দরকার নাই। আজকার দিন, এবং আজকার এই মুহূর্ত্তই পার করবার কথা। 'তার-পর' তার পরেই চিন্তণীয়। আলোক ফিরছে!

নওকিশোরের দল হৈ-হল্লা করে দাঁতন করছে একটা জলকলকে ঘিরে। ঝুমনির হয়তো ঠাণ্ডা লেগে জ্বরমত হয়েছে। নওকিশোর ছেঁড়া ন্যাকড়াটা ওর গায়ে ডবল করে জড়িয়ে দিল, ওর মুখ ধুইয়ে দিল, নিজের ছেঁড়া ফতুয়ার পকেট থেকে কাগজমোড়া একখানা সস্তা বিস্কুট বার করে দিল ওর হাতে। তার পর ওর হাত ধরে আসছে আলোকের আগেই।

—কিশোর!—আলোক ডাক দিল!

—হ্যাঁ বাবুজি! কুচ বোলতে হেঁ?—

—কোথায় যাবে তোমরা!

—দানা-পানি কুচ্ নাই তো বাবু! ঝুমনিকে বুখার হইল। উথাকে শোয়াবে, তব্ যাবে।

—কোথায়?

—কুছ্ দানা-পানির জুগাড় করতে হোবে না বাবুজি!

আলোক পকেট থেকে একটা সিকি বার করে দিল কিশোরের

হাতে। কিশোর হাত পেতে নিল, হাসলো অনাবিল সরল হাসি। হেসে বললো,—আপ বহুৎ দিলদার আদ্‌মী আছে বাবু। বহুৎ বহুৎ সেলাম! লেকিন একঠো বাত—উ জেনানাকো কাঁহাসে লে আয়া? উ তো আচ্ছা আদমী নেহি!

—ওকে তো আমি চিনি না! আপনি এসে ঐ বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসেছে।

—হামি জানে। সব হামি দেখিয়েছে রাতমেঁ! লেকিন ঐ বদমাস ছোঁড়ী উ লেড়কাকো নিয়ে ভিখ মাঙবে। উস্‌কো বহুৎ সুবিস্তা হোয়ে যাবে। আউর থোড়া রোজ বাদ, উ লেড়কা জেরাসে বড়া হোনেসে গুণ্ডালোককো পাশ বিক্রী করে দেবে। গুণ্ডালোক উসকো পকেটমার বানায়েগা নেইতো, উসকো আঁখ বন্ধ করকে ভিখ মাঙায়েগা, নেইতো, হাতপা-কাটকর উসকো রাস্তামে ফেক্ রাখেগা—যেইসে বাবুলোক দুচার পয়সা ফেক্ দেনা—পয়াসা গুণ্ডালোক লে যায়গা উসকো দেগা রাস্তামে ঝুঠা খানেকো। হামি জানে—উ লেড়কা কভভি ভালো নেই রহেগা!

আতঙ্কিত হয়ে উঠলো আলোকের অন্তর। কিশোর আরো কিছু বলতে যাচ্ছে, আলোকই শুধুলো—আমি তার কি করতে পারি?

—কুছ নেহি! আপলোক কুছ কর নেই সেকেগা! আচ্ছা! মাগী দুচার মাহিনা রহে যাক—তব হাম ছিনাই লেঙ্গে উ লেড়কাকো। আচ্ছা বাবু, কোন্ মকানসে উ জেনানা, ওহি লেড়কাকো মাই আয়া রহে? বড় বাড়ীর কাছাকাছিই এসে পড়েছে ওরা। আলোক আঙ্গুল তুলে দেখালো—ঐ বাড়ী।

—ওঃ! উস্ বাড়ীকো জেনানা লোক রাতমে যাতা রহা চৌরঙ্গী মহাল্লামে! মেই দেখা রহা। মেই দেখা রহা উন্‌লোককো আনা-যানাকো! উঃ!

অন্তরটা যেন গভীর বিস্ময়ের আর্ত্ততায় স্তব্ধ হয়ে আসছে! বাংলার সতী নারীর সর্ব্বশেষ সম্বল অপহৃত হোল, অপমানিত হোল বাঙালীর শ্রেষ্ঠ গৌরবপতাকা। যুদ্ধের বিপর্য্যয় যুদ্ধোত্তর জগতের বুকে যে বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, বাংলার শ্যামল বুকেও তার সংক্রমণ যেন অতিরিক্ত মাত্রায় ঘটেছে! সহরে, গ্রামে—সর্ব্বত্র! বিবাহিত জীবনের বন্ধনে গিয়ে ওরা নিজেকে আজ নিষ্ঠাবতী করতে পারে না, সেখানে কালা-ধলার ব্যবধান—স্বাধীনতা-পরাধীনতার ব্যবধান,—ব্যবধান উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে, অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে, খাদ্য আর খাদক সম্বন্ধে। মানুষের উপর এটা অমানুষের প্রদত্ত লাঞ্ছনা বলে স্বীকৃত হবেনা, অমানুষের দান বলে গৃহীত হবে! এই দান যে একজনের ঘরে অগ্নিদান, একজনের জীবনকে মৃত্যুদান, তা ওরা স্বীকার করবে না! কেন করবে? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। যারা বীর তারা ভোগ করবে; ভোগকরার জন্য তারা যে-কোনো পন্থার, যে-কোন অজুহাতের আশ্রয় নিতে পারে। যুদ্ধকাল বা শান্তির সময়, কিছুতেই আটকায় না! প্রবলের কাছে দুর্ব্বল এমনি অসহায়!

কিন্তু ভেবে ফল নাই! দুর্ভাগা ভারতের জীবনদেবতা আজো নিদ্রিত! আজো তার বুকে পরদেশীর কুঠারাঘাত সে অনুভব করে না! যেটুকু করে তাতে তার নিবিড় সুপ্তি শুধু ক্ষুণ্ণ, সামান্য ক্ষুণ্ণ হয় আর সে স্বপ্ন দেখে! ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধের প্রশস্ত পথ, ভাষায়-ভাষায় ঠোকাঠুকির স্ফুলিঙ্গ, প্রদেশে প্রদেশে কাটাকাটির তরোয়াল, ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়ার অন্ধকার জাহান্নম্! এসে পৌছালো আলোক তার আস্তানায়। অপর্ণা এর মধ্যে ছেলেকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ফেলেছে। আলোককে দেখে হেসে বলল,—ঘুমুচ্ছে! তুমি বসো বাবু! আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি।

আলোক কিছুই বললো না। কিশোরের কথায় জাগ্রত আতঙ্কটা তখনো ওঁকে চিন্তাশীল করে রেখেছে। অপর্ণা চলে গেল! খাবারের

ঠোঙাটা নামিয়ে রেখে আলোক তাকিয়ে দেখলো, রাস্তা তৈরীর কাজে লোক লেগে গেছে। বড় বড় লরী বোঝাই চুণপাথর, শাবল-কোদালী, কুলি মজুর এসে পড়েছে। এই আধভাঙা বাড়ীটাই হয়তো ভেঙে শেষ করবে ওরা। আলোককে এখুনি আস্তানা ওঠাতে হবে। কিন্তু ঐ শিশুকে কেমন করে তুলবে আলোক! কোথায় গিয়ে রাখবে! এমন করে নিজেকে কেন সে বিপদে জড়িত করতে গেল!

কিন্তু বিপদ কিছু ঘটবার পূর্ব্বেই অপর্ণা এসে পড়লো। মুখ ধুয়ে চুলগুলো বেশ করে গুছিয়ে কতকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে, বেশ দেখাচ্ছে ওকে! শাড়ীখানা পরিষ্কার থাকলে ভদ্রলোকের বউ বলেই মনে হোত! এসেই ছেলেটাকে তুলে নিয়ে আলোককে বলল—চলো বাবু! ঐ কোণায় একটা জায়গা আছে! ভালো জায়গা!

কথা না বলে আলোক চললো ওর সঙ্গে; মিনিট দু-এর রাস্তা! এসে দেখলো, ছেঁড়া একখানা কাঁথা ভাঁজ করে পাতা, তার উপর খোলা আকাশকে ঢেকে আছে একটি বকুল গাছ। চমৎকার আশ্রয়। শিশু-টিকে কাঁথায় শুইয়ে দিতে গিয়ে অপর্ণা বললো—এ্যাঁ ভিজে!

রাত্রের বৃষ্টিতে কাঁথাখানা ভিজে গেছে কিন্তু শুকনো কাঁথা কোথায় আর পাওয়া যাবে এখন! আলোক কোন কথা না বলে ঠোঙাটা ওর সামনে রেখে আস্তে চলে যাচ্ছে, অপর্ণা বললো—যাবে কোথা বাবু?

—আসছি! অকারণে কথাটা বললো আলোক। ওর ফিরে আসবার আর ইচ্ছে নেই। ওর অন্তর বিরক্ত এবং বিষাক্ত হয়ে উঠেছে অপর্ণার হাসি দেখে। কারণে অকারণে মুচকী হাসি, মধুর ইঙ্গিত। যেন ও ঐ ছেলেটার মা আর আলোক বাবা—এই সত্যটা সর্ব্বাবয়ব দিয়ে ও প্রচার করতে চাইছে আলোকের কাছে। ছেলেটাকে বাঁচিয়ে তুলবার মত মাতৃত্ব ওর কোনো অবয়বে খুঁজে পাচ্ছে না আলোক। শুধু নিজেকে আকর্ষণীয় করবার জন্য ওর সকল চেষ্টা পরিমার্জ্জিত, প্রসারিত।

আলোক অনেক দূরে চলে এলো, একটা পার্কে বসলো একটা বেঞ্চে। বসেই রইল ঘণ্টা দু-তিন। কি সে ভাবছে আর কেন সে ভাবছে, নিরাকরণ নেই। অকস্মাৎ কে ডাকলো—কি হচ্চে—বাবুজি?

নবকিশোরের ছোট দলটি। হাতে দুটো ফজলি আম!

—এসো কিশোর, আম কোথায় পেলে?

—নিয়ে নিলাম! কুত শালা বড়া আদমী আম খাইছে আর হামি খাবে না?

কিশোর এসে বসলো আলোকের পাশে, ছোট বন্ধুর মতই বলল, —খাইয়ে বাবুজি! বহৎ মেহনৎসে লিয়েছি শালা লোকের কাছ থেকে! এ ঝুমনি, শো যা, শো যা, বহিন্।

কিশোর ঝুমনিকে কোলে টেনে শুইয়ে দিল বেঞ্চেই। কিশোরের দেওয়া আমটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো আলোক; অনুভব করতে লাগলো সর্ব্বহারা ঐ হতভাগ্য বালকের আশ্চর্য্য প্রাণ-শক্তি—অদ্ভুত স্নেহ-বাৎসল্য আর অসাধারণ বন্ধুপ্রীতি! এ আম যেমন করেই কিশোর সংগ্রহ করুক—না গ্রহণ করলে মনুষ্যত্বের অপমান করা হবে। আলোক ছুরি বের করে আমটা কাটলো।

প্রকাণ্ড বাড়ীটার চারতালার এককোণে বড় একটা কুঠরী। মাঝারি রকমে সাজানো। নতুন ডিজাইনের খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলমারী, সেলুফ ইত্যাদি তো আছেই, কয়েকটা দামী ছবি আর ষ্ট্যাচুও আছে। বেশ ঘরটি, কিন্তু ঐ ঘরে বসে আছে এক বিষাদ প্রতিমা। এতো ক্লান্ত

যে বসে থাকা ওর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হচ্ছে, তবুও বসে আছে, কষ্টকে যেন সাগ্রহে বরণ করবার জন্যই। জীবনের উপর যেন ওর কিছুমাত্র মায়া-মমতা নেই, এবং জীবন যেন ওকে কঠোর বন্ধন থেকে মুক্তি দিলে ও বেঁচে যায়। কোণার দিকে ছোট্ট একটা রেডিও যন্ত্র,—তার থেকে মৃদুস্বরে গান ভেসে আসছিল—

"স্বপন যদি মধুর এমন, হোকনা মিছে কল্পনা—
জাগিও না, আমায় জাগিও না…'

সত্যি! স্বপ্নের মধুরতার মধ্যে যদি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারতো না জেগে! কিন্তু স্বপ্ন সব সময় মধুর হয় না! বীভৎস ভয়ঙ্কর হয়—নারকীয় ভীষণতায় কদর্য্য কুৎসিত হয়, সময় সময় এত বেশি ভয়ঙ্কর হয় যে মানুষ ঘুমুতে ভয় করে; ওর তাই হয়েছে। কয়েকদিন থেকে ওর ভালো ঘুম হচ্ছিল না,—কারণ ওর আত্মীয়রা ওকে একটা ভীষণ দুষ্কার্য্য করবার জন্য প্ররোচিত করছিল। জাগ্রত অবস্থায় মনের বল সঞ্চয় করে ও সে কাজ করতে সম্মত হোত, কিন্তু নিদ্রায় যখন ওর মনের স্নায়ুকেন্দ্র থাকতো দুর্ব্বল আর অসহায়, তখন সেই কার্য্যের কদর্য্যতা ওর চেতনার গভীরে যে আতঙ্কের, যে অন্ধায়িত নারকীয় দৃশ্যের ছবি আঁকতো তাতে ওর সর্ব্বাঙ্গ উঠতো কেঁপে কেঁপে। আকস্মিক ঘুম ভাঙার আঘাতে ও চাৎকার করে উঠতো। ওঘর থেকে তৎক্ষণাৎ ওর মা এসে সাহস দিত, —ভয় কি! অমন হয়।

কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনাটি গত রাত্রের গভীর দুর্য্যোগের মধ্যে সত্য হয়েছে। সত্য হয়েছে ওর জীবনে—ওর জাগরণে এবং স্বপ্নেও। সব শেষ করে এসে ও শুয়েছিল ঘুমুবার জন্য। কিন্তু স্বপ্ন—মধুর নয়, বীভৎস, কুৎসিৎ, কদর্য্য স্বপ্ন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল ওর চেতনায়। চমকে চেয়েছে, ভয়ে হাত-পা কেঁপে উঠেছে, পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে।—কিন্তু কাল ও চীৎকার করে ওঠে নি। ওর মনে হয়েছে, ওর কেউ আত্মীয় নেই,

চীৎকার করে কাকে ডাকবে। কেউ তো আপন জন নাই! যারা আপন বলে কাছে আসে তারা সবাই স্বার্থান্বেষী। নইলে অতবড় কদর্য্য কাজটা ওকে দিয়ে করালো কেমন করে!

—উঠেছিস! আয়, মুখ ধুয়ে দুধ খা!—দরজার বাইরে থেকে বললো ওর মা।

—হুঁ! বলেও কিন্তু বসেই রইলো। উঠবার কোন লক্ষণ নেই। ওর মা কাছে এগিয়ে এসে বললো আবার—অমন কত হয়, কত যায়। ওর কথা ভাবছিস্ কেন? আয়।

হাসলো মেয়েটা! হাসি নয়, একটা জ্বালার অন্তিম প্রকাশ যেন! যেন আকস্মিক ছিট্‌কে পড়া উল্কার প্রজ্বলন্ত মৃত্যু-হাসি! আস্তে বললো, —কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না মা—আর একটু ঘুমুবো!

শটান শুয়ে পড়লো ও বিছানায়। ওর মা আধমিনিট দেখলো, —কিছু না খেলে হবে না। খেয়ে নে, তারপর ঘুমুবি। শরীর দুর্ব্বল হয়ে যাবে যে!

—যাক্ গে! শরীরের দাম উস্থল হয়ে গেছে। তোমাদের কাছ থেকেই তো পেয়েছিলাম এই শরীর—মম্বন্তরের মরণকে তাই দিয়ে ঠেকিয়েছি। ব্যাঙ্কের অঙ্কও কিছু বাড়িয়েছি—তোমাদের আর ভয় নাই মা। এবার এ শরীর যাক্—দেহটা বদ্‌লে নিই গে···বালিশে মুখ গুঁজে ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো!

—ছিঃ উৎপলা! কী সব যা-তা কথা বলছিস্! কী এমন হয়েছে তোর যাতে করে······

—কিছু না মা—কিছু হয় নি! আমায় একটু ঘুমুতে দাও! তুমি যাও দেখি এখন!

অনুনয়ের সঙ্গে আদেশের অগ্নি যেন উৎপলার কণ্ঠে! ওর মা মন্ত্রশ্রান্ত হয়েই যেন চলে গেলো, যাবার সময় শুধু বলে গেলো।

—থাক্-মা !—ঘরের বাইরে গিয়ে বললো, এই বয়েসে অনেক দেখলুম বাছা ! এ আর এমন নতুন কি ! মানুষের কত হয়, কত যায় !

কিন্তু উৎপলা ওসব শুনতে পেল না—শুনতে চাইলো না। সে শুধু ভাবছিল স্বার্থান্বেষী পৃথিবার কথা, স্বার্থপর মানুষের কথা, স্বার্থ-জড়িত সংসারের কথা ! শুয়েশুয়েই ভাবছিল উৎপলা। তিনি-চারটে বছরের ঘটনাগুলো ওর জীবনের উপর দিয়ে ষ্টিম্-রোলারের মত চলে গেছে। ওকে থেঁতলে, পিষে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল—অথচ মেরে গেল না। ওকে বেঁচে থাকতে হবে—জীবনের রিক্ততাকে উপভোগ করবার জন্যই ওকে বেঁচে থাকতে হবে।

কিন্তু উৎপলাই একমাত্র নয়—আরো অনেকে, হাজার হাজার—কন্যা, বধূ, কুলনারী মহারণের মরণোৎসবের মধ্যে জীবনের উৎসবও সম্পন্ন করেছে ! উৎসব ! হাঁ, ক্লাবে, ক্যাম্পে—পানে—ভোজনে,—লীলায় বিলাসে পূর্ণাঙ্গ উৎসব। এই উৎসবের প্রেরণার পেছনে ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আত্মীয়তা—অর্থ ! আরো ছিল আপনার জনের সমর্থন, আর আপনার পরাধীনতার অসহায়তা। কিন্তু এ সব ভেবে আর কিছু ফল নেই। যদি বেঁচেই থাকতে হয়, তবে এদিনের কথা ভুলে যেতে হবে। ভুলে যেতে হবে কবে কোন্ শ্বেতবরণ জন্তু উৎপলার শরীরের মাংস খুব্‌লে খেয়েছে, তীব্র পানিয়ে উচ্ছিষ্ট করেছে, কুৎসিৎ ভাষণে কলঙ্কিত করেছে।

কিন্তু ভোলা যায় না। প্রথম যৌবনের গোপন প্রেমের একটা কথা মনে পড়ে গেল উৎপলার। কথাটা বিকাশকে নিয়ে, ইচ্ছা ছিল বিকাশের উৎপলাকে বিয়ে করবে। বড় লোকের ছেলে বি. এ. পড়তো—স্বপ্ন দেখতো উৎপলাকে পাশে বসিয়ে কবিতার—

“এইখানে এই তরুতলে তোমায় আমায় কুতূহলে
এ জীবনের যেকটা দিন কাটিয়ে যাব প্রিয়ে—”

কিন্তু গরীব বাবা দিতে পারলো না উৎপলাকে বিকাশের হাতে। বিকাশ কোথায় আছে, কে জানে। উৎপলার ইচ্ছা করছে, আর আজ এই পর্য্যুষিত দেহমন নিয়ে একবার তার সঙ্গে দেখা করে আসবে। শুনে আসবে, সে কি বলে। সেদিন টাকার জন্য বিকাশের বাবা উৎপলাকে ঘরে নেয় নি। আজ উৎপলা অনেক টাকা দিতে পারে—অনেক হাজার টাকা। আজ কি বিকাশের বাবা টাকার সঙ্গে উৎপলাকেও নিতে পারে? না—উৎপলার টাকা হয়েছে কিন্তু তার বিনিময়ে দিতে হয়েছে সর্ব্বস্ব, যুগ যুগ ধরে যে শুচিতা রক্ষা করে এসেছে হিন্দুনারী উৎপলার সেই শুচিতা নষ্ট হয়ে গেছে। উৎপলা হত্যা করেছে তার সংস্কার-সংস্কৃতিকে, তার আভিজাত্যকে, তার জন্ম ক্ষেত্রকে।

কিন্তু এসবই ভুলে যাবে উৎপলা। ভুলে তাকে যেতেই হবে—নইলে সে বাঁচতে পারবে না। কোনো রকমে দিন কয়েক ঘরের মধ্যে থেকে, শরীরটা একটু ঠিক করে নিয়েই উৎপলা আবার বেরুবে শিকার সন্ধানে। বাজারের মেয়েতে আর উৎপলায় আজ তফাৎ শুধু সরকারী ছাড় পত্রের। —উঃ—টুঁ—য়া—টুঁয়া—! কোথায় যেন সদ্যজাত ছেলে কাঁদছে। উৎপলা সচকিত হয়েই কোলবালিশটা টেনে নিল—না—না; ওর ভুল হচ্ছে। ওর তো ছেলে নাই। ছেলে আবার কখন হয়েছে ওর। ওতো কুমারী—ওর ছেলে হোতে নেই। ওর মাতৃত্ব-কোমল অন্তর আকস্মিক বেদনায় রক্তাক্ত হয়ে গেল—উঃ-উঃ! উৎপলা বালিশে মুখ গুজলো।

শান্তিকামী পৃথিবী! চতুঃশক্তির বৈঠক হচ্ছে—কখনোবা তিন প্রধানের আলোচনা চলছে; যুদ্ধবন্দীদের বিচারের প্রহসনও চলছে ঐ সঙ্গে এবং আরো অনেক কিছু চলছে; তার সঙ্গে চলছে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের একটা অতি গুরুতর অধ্যায় রচনা। ইতিহাস কেমন

হতে পারে তাই নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে, এমন কি—ঘোষণা করেছেন—'স্বাধীনতা এসে গেছে'—এবার ভাগাভাগি হোক। গান্ধী মহারাজও বলেছেন—'স্বাধীনতা আর দূরে নহে; স্বাধীন হইবার জন্য প্রস্তুত হও' জহরলালজী রাষ্ট্রপতি হবার অনুমোদন পেয়েছেন—কাশ্মীরে যাবার জন্য তিনি বীর হুঙ্কার দিচ্ছেন; ওদিকে ভারতের দেশীয় রাজ্যের অলিতে গলিতে চলেছে অত্যাচার, উৎপীড়ন, অমানুষিক হত্যালীলা! ইংরাজের সহিত বাৎসল্য দিনে দিনে বেড়ে উঠছে ভাগ-বাঁটোয়ারার বানর বুদ্ধিতে—বিড়ালের ভাগে পিষ্টক কবে পড়বে কে জানে। ইত্যাকার যখন পৃথিবীর শান্তিময় অবস্থা তখন অশান্তির কথা লেখা অন্যায় হবে—তাই শান্তির খোঁজ করতে হোল। জিনিষ পত্রের দুর্মূল্যতা আর কালো বাজারের কসরতীতে মানুষগুলো যখন প্রায় হন্যে কুকুরের মত মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছে, তখন একদল চালাক মানুষ রাশিয়ার বুলি আউড়ে নেতা হয়ে উঠলো রাতারাতি—তারপর সুরু হোল ধর্ম্মঘট—গণ বিক্ষোভ, পিকেটিং এবং পকেটমারা। মানুষের লাঞ্ছনার অন্ত রইল না—দেশের মানুষেরই কথা বলছি! ধর্ম্মঘট করে মালিকদের জব্দ করতে গিয়ে ওরা জব্দ করলেন দেশবাসীকে বেশী। কারণ মালিকরা বহু অর্থ কামিয়ে বসে আছেন অনেক আগেই। যুদ্ধের বাজারে যখন মালিকদের কাছে একটি কর্ম্মী-মানুষের দাম ছিল লক্ষ টাকা—যখন ধর্ম্মঘট করলে মালিকরা শ্রমিকের পায়ে ধরতেও কসুর করতো না—তখন এদের দল ঘুমুচ্ছিলেন না,—জনযুদ্ধ করছিলেন। পাঁচটা পুরো বছরের যুদ্ধকালে কোথাও কোন ধর্ম্মঘট হয়েছে বলে শোনা যায়নি—হোল আজ—শান্তির আবহাওয়াকে বিষাক্ত করার জন্য। তাও একসঙ্গে একদিনে সবগুলো হলে হয়তো অচল অবস্থার সৃষ্টি হোতে পারতো, কিন্তু কায়দা করে একটার পর একটা করে ধর্ম্মঘট বাধানো হচ্ছে; আর শ্রমিকদের পাঠানো হচ্ছে দেশবাসীর সমর্থন এবং চাঁদা যোগাড় করতে। খবরের কাগজগুলিতে বড় বড় আর্টিকেল লিখে

ধর্ম্মঘটীরা জানাতে চাইছেন—আজ তাঁরা না খেয়ে মরতে বসেছেন। ধর্ম্মঘট একান্ত দরকার—না হলেই চলবে না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কিছুদিন আগে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন তাঁদের বেশ চলে যাচ্ছিল ঐ মজুরীতেই!

কিন্তু কেন এমন হচ্ছে! হচ্ছে কেন—ভাবতে গেলে বহু কথা এসে পড়ে। তার প্রধানতম হচ্ছে, স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুপণে অগ্রসর ভারতের চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করা, বিপর্য্যস্ত করা—বিপন্ন করা, বিলম্বিত করতে হবে স্বাধীনতার স্বীকৃতিকে—তাই রকমারী ফিকির, রহস্যঘেরা চক্রান্ত—রকম রকম বিভেদ-বিদ্বেষ-বিপ্লব-বুলেট্! অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করেই বেশ আছ—স্বরাজের স্বপ্নও মাঝে মাঝে দেখো—ওটা স্বপ্নেই থাক ওর বাস্তবরূপ তোমাদের দেখতে নেই—পাপ হবে!

উৎপলা আকাশের পানে চেয়েই শুয়েছিল—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—জয় হিন্দ, পুলিশ জুলুম বন্দ্ করো—ইত্যাদি ধ্বনির গম্‌গম্ শব্দ কানে এলো। ওর শয্যা চার তলায়—প্রায় আকাশের কাছাকাছি, কাজেই ঠিক ঠিক ও ধরতে পারছে না শব্দটা কিসের। তবে একটা যে প্রশেসন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু উঠে বসে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখবার মতও মন বা শরীরের অবস্থা নয় ওর! শুয়েই ভাবতে লাগলো—দেশে জাগরণ এসেছে, এই কথাই বলছে সকলে। গণ-শব্দটার ইদানিং বহুল প্রচলন হয়েছে। নিতান্ত নিরক্ষরের মুখেও শোনা যাচ্ছে এই 'গণ'—কথাটা! খুবই আশা এবং আনন্দের কথা। গণমন জাগলেই বিদেশী শাসকের শোষণশক্তি রুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু স্বদেশী শাসক! উৎপলা তার জীবন দিয়ে অনুভব করেছে যুদ্ধের গ্লানি, যুদ্ধোত্তর কদর্য্যতা। কিন্তু উৎপলাও দেশের মেয়ে, দেশকে সেও ভালবাসে; দেশের স্বাধীনতার জন্য তার আকাঙ্ক্ষাও কিছু কম নয়। হতে পারে, উৎপলা আজ অপমানিতা, অনাদৃতা, অসহায়ভাবে লাঞ্ছিতা কিন্তু উৎপলার অপরাধ তাতে কতখানি—ভগবান জানেন।

গোলমালটা নিকট হয়ে আসছে। সামনের বড়ো রাস্তা দিয়েই যাচ্ছে মিছিল। নিশ্চয় ধর্ম্মঘটের মিছিল। উৎপলা শুয়ে শুয়েই অনুমান করছে। ধর্ম্মঘট, শ্রমিক জাগরণ, শ্রমিকের দাবী—মজুরী বাড়াও! ওদিকে শাসকের আশ্বাস—ফসল বাড়াও; ধন বৃদ্ধি কর—সম্পদ বাড়ুক —শিল্পে এবং কৃষির খরচখাতে মোটামোটা অঙ্কের টাকা, আর বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞের বরাদ্দ হোক;—গৌরী সেনের টাকা যত খুসী খরচ হোক! কণ্ট্রোলের সঙ্গে কাঁচা টাকার যোগ-সাজশ করে চুরির পথে সদুপায়ে উপার্জ্জন চলুক। এখানে, এই আত্মজ্ঞানের পথে জাতিভেদ নাই, ধর্ম্মাভেদ নাই,—প্রয়োজনের স্বার্থে এই লুণ্ঠনের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠছে দিনে দিনে। নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্য তাই কমানো চলে না, খাদ্যদ্রব্য তাই অপচয় না করলে চলে না—আবার প্রচুর অর্থব্যয় করে বিজ্ঞাপন না দিলেও চলে না—অপচয় নিবারণ করো, অল্প খাদ্য গ্রহণ করো,—নষ্ট করিও না—দেশের প্রত্যেককে বাঁচতে দাও—চমৎকার! এর ইতিহাস আজ কালোবাজারের অন্ধকারে তলিয়ে রইল, কিন্তু দিন আসবে, সেদিন ঐ অন্ধকারকে বজ্রের আলোকে বিদীর্ণ করে আবিষ্কার করবে অনাগত ভবিষ্যৎ-সন্তান অন্ধকার এই স্বার্থলোভী শয়তানদের। সেদিন ওরা হয়তো ফাঁসিকাঠে ঝুলবার জন্য বেঁচে থাকবে না—কিন্তু ওরা যাদের জন্য এই সম্পদ আজ আহরণ করছে, তারাই তখন হবে ওদের বিচারক। তারা—ওদেরই সন্তানগণ!

সন্তান! চমকে উঠলো উৎপলা। আপনার সন্তান একদিন বিচারকের পদে আসীন হতে পারে, মা-বাবার কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করতে পারে, কেন তাকে পৃথিবীতে আনা হয়েছিল—পাপের পথে কেন তার জন্মদান করলো তার পিতামাতা! হ্যাঁ, নিশ্চয় কৈফিয়ৎ চাইতে পারে! উৎপলার কাছেও কি তার গর্ভজাত সন্তান কোনোদিন কৈফিয়ৎ চাইতে আসবে নাকি? না-না—সে তো এ পৃথিবীতে নেই আর!

উৎপলা নিজের হাতে তার গলা টিপে শেষ করে দিয়েছে। ভারী সুন্দর হয়েছিল সে—গলা টিপতে বড্ড মায়া করছিল উৎপলার, কিন্তু উৎসাহ দিচ্ছিল উৎপলার মা। উৎপলা শেষ পর্য্যন্ত শেষ করে দিল ছেলেটার নিশ্বাস। মনে পড়ছে—বেশ মনে পড়ছে, ঐ টুকু বাচ্ছা কি-রকম আকুলি ব্যাকুলি করেছিল—কি-রকম হতাশ চোখে অভিযোগ জানিয়েছিল—উঃ! পৃথিবীর সব আলো ঈশ্বর, তখন নিবিয়ে দিয়েছিলেন বর্ষা ধারা দিয়ে। বিদ্যুৎও জ্বলেনি একবার, কিন্তু উৎপলার মা, গর্ভধারিণী স্বয়ং দাঁড়িয়ে ছিল, একশ বাতির ইলেক্ট্রিক আলো জ্বেলে। সেই আলোতে দেখেছিল উৎপলা ওর মুখ! কচি পদ্মফুলের মত মুখখানা—টানা দুটি নীলাভ চোখ আর লতানো চুলগুলি! কেন দেখেছিল উৎপলা। ঈশ্বর দেখাতে চান নি তাই অত দুর্যোগ ছিল আকাশে, হয় তো শয়তানও চোখ বুজেছিল তখন কিন্তু জেগেছিল উৎপলার মা। আশ্চর্য্য! মা নিজে কিছুই করলো না—শুধু নির্দ্দেশ আর উপদেশ দিল। এমন কি, ঐ দুর্যোগের মধ্যেও বাইরের ডাষ্টবীন পর্য্যন্ত উৎপলাকে যেতে হোল অতরাত্রে একা। মা জানে ও কাজ বড় বেশী পাপের কাজ। নিজের হাতে ওকাজ না করে মা পাপটাকে এড়িয়ে গেল! কী চালাক মেয়ে মা! পাপটা হোল এখন উৎপলার—একার উৎপলার কিন্তু······উৎপলা মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে নিলো।

উচ্চ কলরোল আকাশে গিয়ে উঠছে। উৎপলার ঘরেও এসে পৌছালো। রুক্ষ, দুর্ব্বল দুঃখপীড়িতা উৎপলা বিরক্ত হচ্ছে, কিন্তু কিসের এতো গোল? দেখতে ওর আগ্রহটা ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগলো। মেয়েদের মনের চিরন্তন কৌতুহল ওকে উঠতে বাধ্য করলো বিছানা ছেড়ে। জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো উৎপলা। নীচে বড় রাস্তায় বিরাট মিছিল। বড় বড় সব অক্ষরে কত কি লিখে রেখেছে—তার মধ্যে কাস্তে-কুড়ুল বেশ স্পষ্ট। শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের মিছিল নিশ্চয়, কিন্তু ওর

মধ্যে অনেক মেয়েও রয়েছে। হবে—আজকাল তো শ্রমিকদের মধ্যে মেয়েরাও কম নেই। উৎপলা নিজেই তার একটা বড়ো প্রমাণ। গৃহকোণ-বাসিনী নারীকে আজ পথে বের করেছে পাশ্চাত্য সভ্যতা। সংসারের শৃঙ্খলা রক্ষায় যে ছিল কম্যাণ্ডার-ইন্-চিফ—বাহিরের বিশ্বে সে পদাহত পদাতিক হবার সাধনায় মেতেছে। যুগ-যুগান্তরের সংস্কৃতির বাহিকারূপে যে জন্ম দিত ভবিষ্যত-জীবন বর্ত্তিকার—সে আজ সংস্কার মুক্তির বিভ্রান্তিতে যন্ত্রদানবের পরিচর্য্যায় লেগেছে! জীবনের ধারাকে বহমান রাখবার জন্য যে-নারীর সৃজনীশক্তি সন্তান ধারণ আর পালনের সীমায় বন্দী ছিল—সে বন্ধনকে সে আজ অস্বীকার করছে লেবরেটরীর বৈজ্ঞানিক শক্তিবলে! হয়তো অদূর ভবিষ্যতে পুরুষায়িত এই নারীকুল পুরুষেই পরিণত হবে—কিম্বা পৌরুষশক্তিতে পৃথিবীকে যন্ত্র করে তুলবে! যান্ত্রিক করে তুলবে জীবনের ভ্রূণাঙ্কুরকে টেষ্টটিউবে—তার সূচনাও দেখা দিয়েছে!

কিন্তু উৎপলার অকস্মাৎ চোখ পড়লো ঐ মিছিলের পরিচালকের দিকে! বিকাশ—না? এত উঁচু থেকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না। উৎপলা তাড়াতাড়ি ড্রয়ার টেনে বাইনোকুলার বের করলো। সুন্দর দামী বাইনোকুলার কোন এক বিদেশীর কাছ থেকে উপহার পাওয়া—মনে পড়লো উৎপলার নিজেকে পণ্য নারীর মত মনে হচ্ছে ওটা হাতে করে; অথচ একদিন ঐটা মহা সমাদরে সে উপহার গ্রহণ করেছিল তার কাছ থেকে! এবং আরেক জনের কাছ থেকে একটা ভালো ক্যামেরা। ঐ ড্রয়ারেই রয়েছে সেটাও। কিন্তু এ সব ভেবে মন খারাপ করে কি আর হবে। ঐ লোকটা বিকাশ কি না, দেখা দরকার। উৎপলা জানালায় এসে বাইনোকুলার চোখে দিল। চাকা ঘুরুচ্ছে! হ্যাঁ,—বিকাশই! উচ্চকণ্ঠে সেই চীৎকার করছে—আমাদের দাবী—পুলিস জুলুম—বাকি লোকারণ্য থেকে ধ্বনিত হচ্ছে - মানতে হবে—বন্ধ করো! ইত্যাদি, বিকাশ তাহলে লীডার অর্থাৎ নেতা হয়ে উঠেছে। বাঃ ঐ

কাপুরুষ নারীলোভী কুকুরটাও নেতা হোল! কাদের নেতা ও? কোন হতভাগ্য নির্ব্বোধদের! কিন্তু নেতা মাত্রেই বুদ্ধিমান, আর বক্তা—এদুটো গুণ না থাকলে নেতা হওয়া চলে না। বিকাশের ছিল—ঐ দুটো-গুণই অত্যন্ত বেশী ছিল বিকাশের। কলেজে পড়বার সময়ই উৎপলা তাকে জেনে আকৃষ্ট হয়েছিল তার দিকে—তার পর আরো বহুদূর এগিয়ে যায় দুজনে।

হ্যাঁ ঐ তো, আজো ওর পাশে রয়েছে দুটি মেয়ে একটি কালো, বেঁটে, দাঁত উঁচু স্থূলাঙ্গী, প্রৌঢ়া, কিন্তু অন্যটি উৎপলা গভীর মনোযোগ দিয়ে বাইনোকুলারে কাচের ভেতর দিয়ে দেখতে লাগলো—হ্যাঁ, অপরূপ কিছু নয় তবে তন্বঙ্গী, গৌরাঙ্গী আর যুবতী। বিকাশের ভোগের যোগ্য সামগ্রী! নেতা বিকাশ—জয় হোক ওর নেত্রীত্বের!

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচ্কিয়া বাইনোকুলারটা নামিয়ে রাখলো উৎপলা। ওর আর দেখতে ইচ্ছে করছে না! কিন্তু এ দেশের মানুষগুলো কী নির্ব্বোধ! যে-ওদের সর্ব্বনাশ করে, ওদের সর্ব্বস্ব চুরি করে ওদের ঘরের বধূ-কন্যাকে অপমান করে, সেই হয় ওদের দলপতি। ওরা শক্তের ভক্ত। হুম্‌কীতেই ওরা জব্দ, ওদের জন্য ঈশ্বরের করুণা চাইতে হয়। ওরা নেতা বানায় তাকেই যে জোর গলায় প্রচার করতে পারে, সেই এক এবং অদ্বিতীয় নেতা। ওরা হাজার হাজার টাকা তুলে দেয় তার হাতে, যাকে একবার স্বীকার করে নেতা বলে;—তার পর আর বিচার করতে চায় না—বিবেচনা করে দেখে না, নেতার গুণ ওর আছে কি না? চিরদিনের ভক্তিবাদী অন্ধ চৈতন্য এই হতভাগ্য দেশ এমন পাথরের ঈশ্বরের পূজো ছেড়ে রাজনৈতিক নেতার পূজোয় মেতেছে। সে পূজোর অন্য মন্দির গড়তে ওরা সতত প্রস্তুত, নিজের জীবনকে বলি দিয়েও। প্রণাম আর পূজাতেই ওদের স্বাধীনতা লাভ হবে; কাজেই নেতার সব থেকে বড়ো ধুর্ত্তামী হচ্ছে রাজনৈতিক বুলিতে ধর্ম্মের কোটিং;—অর্থাৎ আবরণ

দওয়া! বিকাশও তাই করছে—উৎপলা শুনতে পেল 'জীবনকে আমরা সুন্দর করতে চাই, সুষমাময় করতে চাই, সার্থক করতে চাই—আমরা চাই ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করতে! কোনো জাতিকে পরের অধীন রাখা নিশ্চয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়—তাই আমাদের মধ্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন গণদেবতা রূপে, গণচেতনার মধ্যে……'

মিছিলটা দূরে চলে গেল, তার সঙ্গে বিকাশও। উৎপলা আর শুনতে পেল না—শুনতেও চাইলো না। অকারণে ঈশ্বরকে ডেকে কাকুতি জানাবার ও পক্ষপাতি নয়। ব্যাচারা ঈশ্বর সব সময় সকলের কাজের কৈফিয়ৎ দেবেন—শুনলে হাসি পায়। যুদ্ধের সময় হিটলার বলতো, 'ঈশ্বর জার্মেনীকে পৃথিবী শাসন করতে পাঠিয়েছেন'—জাপান আরো এক কাঠি বেশী বলতো—'তারা ঈশ্বরের পুত্র!' ইংলণ্ড-আমেরিকাও কিছু কম বলতো না। হাজার হাজার মানুষের হত্যার উৎসবেও ঈশ্বরকে ডাকতে ওরা লজ্জা বোধ করে না। যে-স্বদেশ রক্ষার জন্য ওরা ঈশ্বরকে ডেকে একাগ্নী বাণ ছাড়ে—সেই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একটু মুখ ফোটালেই ওরা ঈশ্বরকে ডেকে জেলে ভরে ঈশ্বর পরায়ণ অপরাধীকে! ভাগ্যিস্ ঈশ্বর ছিলেন—নইলে ·····হাঃ হাঃ হাঃ!

হেসে উঠলো উৎপলা আপন মনে! ওর মা একটু আগে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছিল গোপনে। হাসি শুনে আতঙ্কিত হয়ে কাছে এলো। সস্নেহে বললো—কি হোলরে? হাসছিস?

—কিছু না! এমনি! উৎপলা সাম্‌লে গেল!

দুধের গেলাসটা উৎপলার ঠোঁটের কাছে ধরে ওর মা বলল—খা!

নিঃশব্দে খেল উৎপলা; খেয়ে আবার বিছানায় এসে শুলো। শুয়ে থাকতে বড্ড ভালো লাগছে ওর। কতদিন এমন করে একলা ঘরে আরামে যেন ও শুতে পায় নি! মা চলে গেলে উৎপলা ভাবলো,—বিকাশ নেতা হয়েছে। পয়সা আছে, গাড়া-বাড়ীও আছে—আর্মী হবে।

নেতা হতে হলে ওসব দরকার—তার পর বাকি সব আপনি জোটে! চিত্তরঞ্জনের মতন কে আর সর্ব্বস্ব বিলিয়ে নেতা হবে, বলো?—সেনগুপ্তের মতই কি সবাই নেতৃত্বের জন্য না খেয়ে মরবে? সুভাষের মত কেইবা রাজার ঘরে জন্মে ভিখারীর বেশে স্বেচ্ছানির্ব্বাসন নিতে যাবে দেশের জন্য? ওরকম করলে কি আর সংসারে বাস করা যায়? নেতা হয়ে দুপয়সা কামাতে হবে, টাকার তোড়ায়, ফুলের মালায় আর খবরের কাগজের ঢাকে আর চাটুকারের তোয়াজে ফুলে না উঠলে নেতা কি? মিল-ওনার আর মালটিমিলিওনিয়ার হবার ঐ তো বড়ো রাস্তা! বিশেষ এদেশে। কিন্তু ওসব ভেবে লাভ কি উৎপলার। চুলোয় যাক্! উৎপলা এখন নিজে কি করবে তাই ভাবা উচিৎ ওর। কী আর করবে উৎপলা! সিনেমায় অভিনয় করবে কিম্বা সেবিকা হয়ে যাবে হাসপাতালে। কিম্বা ভিক্ষে করবে—না হয় যোগিনী হয়ে বসবে!

ঊর্দ্ধে আলো-ঝলমল আকাশের পানে চেয়ে আলোক দেখলো, বেলা বেড়েছে, অফিসের বাবুরা প্রায় সকলেই চলে গেছে, ট্রাম-বাসের ভিড়ও কমে আসছে ক্রমশঃ। এবার ওকে এখান থেকে উঠে কোনো একটা কিছু করবার চেষ্টায় যেতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে? যেতে মোটে ইচ্ছে করছে না ওর। চাকরীর চেষ্টা করবার মত মন আর নেই; কার জন্য করবে চাকরী! মা নেই, মাতৃভূমির মুক্তির জন্য কারাবরণ করে ফিরে এসে ও মার পদধূলি নিতে পেলে না। মন যেন টন-টন করে উঠলো আলোকের—চোখদুটো জলে ঝাপসা হয়ে আসছে।

—আপ্ রোতে হেঁ বাবুজি! কাহে! কি হইছে আপনাগার, বাবু?

প্রশ্নটা করলো রামধনিয়া। ওদের দল এখনো বসে রয়েছে ওখানে, কেউবা শুয়ে। ঝুমনির জ্বর, তাই রাধিয়া আর রামধনিয়া তার কাছেই বসে আছে। একটা ভাঙা টিন, পোলসন্‌স মাখনের খালি টিন কুড়িয়ে

এনেছে, তাতেই জল রেখেছে ঝুমনীর জন্য! মাখন যারা খাবার, খেয়ে গেছে, ফেলে দিয়ে গেছে ভাঙ্গা টিনটা! এমনি যেদিন ওরা চলে যাবে—চলে একদিন যেতেই হবে ওদের—সেদিন ফেলে যাবে খোসাটা মাত্র। আলোক রামধনিয়ার পানে চাইল, উত্তর দিল না কিছু, ভাবতে লাগলো। ঝুমনির জ্বরটা বেশ জোরে এসেছে, মাথায় জলপটি দিলে জ্বর একটু নামতে পারে। আলোক উঠে এসে ময়লা ন্যাকড়ার একটা ফালি ভিজিয়ে ঝুমনির কপালে জলপটি লাগিয়ে দিল। নাড়ী দেখলো ঝুমনীর,—প্রবল জ্বর।

আম খাইয়ে সেই ছেলেটা যে কোথায় গেল কে জানে, আলোক শুধুলো—কিশোর কোথায় গেল?

—ক্যা জানে, কুছ ধান্দামে গিয়া হোগা!—রাধিয়া বললো। বলার সুরে যেন আবেগ বা আত্মীয়তার লেশমাত্র নেই; অথচ আলোক গত রাত থেকে দেখছে, নওল কিশোরকে নিয়ে এরা কর্জনায় যেন একটি যাযাবর পরিবার! নওল কিশোর যেন ওদের বাড়ীর কর্ত্তা—কিন্তু রাধিয়া কেন অমন নির্লিপ্ত সুরে কথা বললো? কেন বললো, তা বুঝতে দেরী হোল না আলোকের। এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে, অথচ প্রত্যেকে স্বাধীন; আবেগ বা উদ্বেগ প্রকাশ করা ওদের কাছে বাহুল্য! ওরা সকলে পৃথক হয়েও এক, আর এক হয়েও পৃথক! পারিবারিক বন্ধনের সামাজিকতা ওদের নেই, অন্তরের দরদ ভাষায় প্রকাশ করতে ওরা অক্ষম—আপনাকে অপরের গলগ্রহ ভাবতে ওরা লজ্জিত। তাই নির্লিপ্তভাবটাই প্রকাশ পায় ওদের কথায়—কিন্তু সত্যি ওরা নির্লিপ্ত নয়, তার বড়ো প্রমাণ ঝুমনির জ্বরের এই শুশ্রূষা!

শুশ্রূষাতেই কিন্তু সারবে না—ওষুধ পথ্যেরও দরকার। কিন্তু কোথায় ওরা পাবে? ওদের জন্য ভাববার কেউ নাই; ওরা জন্তু থেকেও নীচে। গৃহপালিত পশুরও আশ্রয় থাকে, অসুখে ওষুধের ব্যবস্থাও থাকে, ওদের

তাও নেই। ওরা পরাধীন দেশের সন্তান, সর্ব্বহারার সন্তান—ওদের ভগবানও নেই! তবু ওরা ভগবানকেই ডাকে—ডেকে মরে। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের কবিতা :—

'বারেক ডাকিয়া দরিদ্রের ভগবানে, মরে সে নীরবে।'—হ্যাঁ নীরবেই মরবে। এদের নীরব মৃত্যুকে সরব করবার জন্য, সহস্র কণ্ঠে বজ্রঝঞ্ঝনা বাজিয়ে তোলবার জন্য কোনো জাতীয় ইতিহাস রচিত হবে না—জাগরণী-গান গাওয়া হবে না!

কিন্তু এ সব ভাবা বৃথা। আলোক শুশ্রূষার ভার রাধিয়ার হাতে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। যদি কোনো পথ্য যোগাড় করতে পারে। তাছাড়া এমন করে এখানে বসে সময় কাটালে তারও চলবে না। জীবনের রুদ্র রূপকে যতদূর সম্ভব সে প্রত্যক্ষ করবে। পার্ক থেকে বেরিয়ে এলো আলোক। বিরাট প্রসেশন চলেছে রাস্তায়। ত্রিবর্ণ পতাকা, কাস্তে-কুড়ুল মার্কা পতাকা আর একরকম অদ্ভুত পতাকা—আলোক জানেনা, ঐ পতাকা কাদের জাতীয়তা-যজ্ঞের উর্দ্ধশিখা।

এই প্রবহমান জনস্রোতে আলোকও ভেসে পড়লো। ওদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চৈস্বরে ধ্বনি করলো কয়েকবার—বেশ মজাই লাগছিল প্রথমটা; কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই আলোক নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো। ওর যেন বড্ড ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। কিসের এই শোভাযাত্রা—কাস্তে কুড়ুলের সঙ্গে এদের কি সম্পর্ক এবং এরা কে—আলোক কিছুই জানে না, অনর্থক এদের সঙ্গে ঘুরে সময় নষ্ট করতে ওর ইচ্ছে হলো না—দল ছেড়ে চলে আসছে, হঠাৎ নজরে পড়লো, নওল কিশোর একটা কাস্তে-কুড়ুল মার্কা পতাকা নিয়ে দলের মধ্যে হাঁটছে।

—কী ব্যাপার? তুমি এ দলে?—আলোক গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

—হুঁ, বাবুজী, কুছ দানাপানির যোগাড় করতে হবে, সেই ফিকিরে আছি।

—মিলবে দানাপানি ?—এরা কারা ?

—ক্যা জানে ! তব্ ইন্‌লোক জরুর কুছ খানাপিনা করবে, সরবৎ, আইসক্রীম, লেবু, সন্দেশ-রসোগোল্লাভি খাবে। হামি ভি কুছ কুছ পাইয়ে যাবে।

—ও—আচ্ছা! বলে আলোক বেরিয়ে পড়লো। কিশোরের হিন্দি-বাঙ্গালা মেশানো কথার অর্থ সে যা বুঝলো, তাতে মনে হলো, ঐ প্রসেশন কোথায় যায়, এবং কি করে, কিশোর তার কিছু কিছু খবর রাখে। আলোক ওদের সঙ্গে গিয়ে ব্যাপারটা ভাল করে জানতে পারতো কিন্তু শরীর-মনের ক্লান্তি এবং ভবিষ্যতের চিন্তা ওকে অন্য পথ ধরালো !

যাচ্ছে। অনেক দূর চলে এলো আলোক। আপনার মনেই হাঁটছিল। —রোদটা রাস্তার এইদিকে খুবই প্রখর ; অন্য দিকে বড় বড় বাড়ীর ছায়া পড়েছে ফুটপাতে। রোদের দিকটা ছেড়ে আলোক ছায়ায় হাঁটবার জন্য রাস্তা পার হয়ে এ-ফুটে আসছে—প্রকাণ্ড একখানা দোতালা বাস সবেগে আসছিল, আলোক অন্যমনস্কতার জন্য প্রায় চাপা পড়ে আর কি—ড্রাইভার কদর্য্য একটা গাল দিয়ে গাড়ী প্রায় থামিয়ে দিল—আলোক ছুটে এসে উঠলো এ-ফুটে।

বহুদিন কলকাতার পথে হাঁটেনি আলোক, অভ্যাস নাই ওর সতর্ক-ভাবে চলার—খুব বেঁচে গেছে। বুকটা এখনো ধক্‌ধক্ করছে আলোকের। বাসখানা সম্পূর্ণভাবে না থামলেও একজন নেমে পড়লো—একটি যুবক, উমাপদ মুখুজ্জ্যে।

উমাপদ ডাক দিল বাস থেকে নেমেই—আলোক !

অকস্মাৎ নাম ধরে ডাক শুনে আলোক সচমকে ফিরে দাঁড়ালো। উমাপদ হেসে এগিয়ে এসে বলল,—কিরে ? কেমন আছিস্ ? ছাড়া পেলি কবে ! এখন করছিস কি ?

—ছাড়া পেয়েছি গত মাসে, করছি রাস্তায় রাস্তায় পায়চারী, আছি বহাল তবিয়তে!

উত্তর দিতে দিতে আলোক ফুটপাতে উঠলো। উমাপদও উঠলো। আলোক খানিকটা সুস্থ হয়েছে এতক্ষণে, বললো—তোর খবর কি? কোথায় যাচ্ছিস?

—চাকরীতে! ভাল একটা চাকরী মিলে গেছে ভাই। ভাগ্যিস হরিজন বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ছিলাম।

—চাকরী! বাঃ! আলোকের কণ্ঠের সাবাস ধ্বনিটা ব্যঙ্গের কাছাকাছি, কিন্তু উমা বললো,

—জানিস—দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে, তার সঙ্গে বাংলাদেশে নানারকম পরিকল্পনার জন্য মস্ত মোটা টাকার বরাদ্দ হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে হরদম চাকরীতে লোক বাহাল হচ্ছে, অবশ্য সাম্প্রদায়িক হারাহারিতে। কাষ্ঠ হিন্দুর বিশেষ কোন আশা নেই—হ্যাঁ, হরিজন হয়ে যেতে পারবি? তাহলে আজই একটা চাকুরী পেতে পারিস!—উমাপদ বলেই চললো,

—আয় আমার সঙ্গে; বলবি যে তুই হরিজন ক্লাসের লোক—উপাধিটা স্রেফ ছেড়ে দে—নাম বলবি 'আলোক দাস' জাতি যা হয় একটা বলে দিবি, 'হরিজন জাতি' বল্‌লেও হবে। কাজ বিশেষ কিছু নেই, শুধু খোসা-মুদী করতে শেখা, সে বিদ্যায় পাকা হলেই উন্নতি হবে। ওদের দলে থাকতে পারলেই উন্নতি—ব্যাস্‌।—ব্যাস্‌।—চল, যাবি?

আলোক মিনিট দুই কোন কথাই বলতে পারলো না, ভাবতে লাগলো। গ্রাম উন্নয়ন-পরিকল্পনার কথা সে কাগজে পড়েছে এবং তার জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ের কথাও অবগত আছে। এইসব পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে কি ভাবে কাজ চলছে, কি উদ্দেশ্যে কাজ হচ্ছে, সে সব কথাও আলোক জানে। ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য বিভাগের ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক তথ্য তার জানা হয়ে গেছে—কিন্তু আলোক সে সব ভাবছিল না—ভাবছিল এই

উমাপদর অধঃপতনের কথা। উমাপদ তার পাঠসঙ্গী—রাজনৈতিক জীবনেও উমা তার সাথী হয়েছিল, এমন কি সেদিন যখন আলোক ধরা পড়ে, তখনো উমাপদ তারই দলে—আর আজ সেই উমাপদ নিজেকে চাকরীজীবি ভেবে আনন্দ পায়! একটা ভাল চাকরী—যাতে অর্থ এবং অনর্থই বড় কথা, তাই পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়—এবং অপরকে সেই কাজ গ্রহণ করতে অনুরোধ করে' আত্মপ্রসাদ লাভ করে! কী ভীষণ দুর্গতি এই দেশের মানুষগুলোর হচ্ছে! উঃ! আজ বুঝতে পারা যায়,—গত আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে কত রকমের চাকরীর সৃষ্টি হয়েছিল এবং যুবশক্তি কিভাবে দাসত্বের নিগড় পরেছিল। মানুষের নৈতিক জীবনকে অর্থনৈতিক শোষণের দ্বারা এমন এক স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে যেখানে মানবত্ব বা দেশাত্মবোধ একান্তভাবে তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। আপনার দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ আজ এত বেশি আত্মহারা যে জাতিগত গৌরব, বংশগত মর্য্যাদা বা সংস্কারগত বিবেককে বিসর্জ্জন দিতে তার কিছুমাত্র বাধে না। লাভের লোভে নিজেকে সে আজ কুকুরের থেকেও নীচে নামিয়েছে—নীরন্ধ্র নরকে নামিয়ে দিয়েছে!

—যাবি! কথা বলিস না যে!—উমাপদ একটা দামী সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললো কথাটা। আলোক সিগারেট খায় না জানে, তবুও প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। আলোক গম্ভীরভাবেই বললো,

—না! স্বার্থের জন্য নিজেকে মিথ্যা পরিচয়ে পরিচিত করবার মত নির্ল্লজ্জতা আমার নেই। বিশাল হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে আশ্রিত হয়েও যারা আজ বৈদেশিক বিভেদের সুবিধা গ্রহণ করবার জন্য নিজেকে বিশেষ কোন জাতি ভেবে গর্ব্বিত হয়, আমি তাদের দলের নই—সুবিধাবাদ আমার সয় না! তুমি যাদের হরিজন বলছো, তাঁরাও আমারই হিন্দুভাই। পৃথক একটা নাম সৃষ্টি করে আমি তাঁদের আত্মীয়তা হারাতে চাই না!

—কিন্তু নেতৃগণ সকলেই এর সপক্ষে।

—হ্যাঁ—লোকত্তর নেতাদের কথা আলাদা। কিন্তু আমি লোকায়ত্ত নেতার অন্বেষণ করছি! আজ ব্যষ্টির সুবিধা দেখতে গিয়ে সমষ্টির অগ্রগতি যে কতখানি ব্যাহত হচ্ছে সেটা ভেবে দেখছে ক'জন? ব্যষ্টিরও মঙ্গল হচ্ছে না।

উমাপদ আশা করতে পারে নি, বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোক এতবড় কঠোর মন্তব্য করবে। একটান সিগারেট টেনে দম ছেড়ে সে বললো আবার,—বিরোধ বিস্তর হলেও বর্ত্তমানে এই আমাদের পথ এবং আমাদের আশা।

—জীবনের রুদ্ররূপ যারা দেখেনি—তাদের কাছে আশা অনন্ত কিন্তু—মৃত্যুর শ্মশানে যারা শ্মশানচারী তারা ওসব কথার ন্যায়ের ফাঁকি ধরতে পেরেছে! যাঁরা আজ ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নিজেরাই ঈশ্বরের পর্য্যায়ে উন্নীত হচ্ছেন—মানুষের সুখ-দুঃখের উর্দ্ধে উঠছেন—আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অর্জ্জন করছেন, তাঁরা আমার নমস্য। কিন্তু এদেশে দরকার রাজনৈতিক নেতার—আধ্যাত্মিক গুরুর তো অভাব নেই! উপাসনা করলে কি ভাবে ভগবদ্দর্শন লাভ হয়, সে কথা জানবার অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতার দরকার হয় না, বেদ-উপনিষদ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে সে তত্ত্ব জানিয়ে গেছেন ভারতকে! ওদিকে রাজনৈতিক নেতাদের মুখে আধ্যাত্মিক বুলির সুযোগ বিদেশী শাসক গ্রহণ করতে ত্রুটি করছে না —বেশ দেখা যাচ্ছে—দেশের যুবশক্তি আজ ঐ আধ্যাত্মিক সুরের আশ্রয় গ্রহণ করেছে,—তার বড় প্রমাণ তুমি। তুমি মিথ্যা হরিজন পরিচয়ে চাকরী পেয়ে পরমার্থ লাভ করেছ—এমন বহুলোকেই করছে। কে করলো এই হরিজন জাতির সৃষ্টি? অখণ্ড হিন্দু কি জন্য বিভক্ত হোল? কার জন্য আজ প্রাদেশিক বিভাগ বণ্টন? হিন্দু-মুসলমান-শিখ-হরিজনে মারামারি-কাটাকাটি? তলিয়ে বুঝে দেখো, ইংরাজ নিজের সুবিধার জন্য যা করছে তাতে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছে কে! আগামী যুগের

ইতিহাস সেই সব লোকদের সমালোচনা করতে দ্বিধা করবে না। মনে রেখো, একটা জাতির জীবনে যাঁরা নেতৃত্ব করবেন, তাঁদের দায়ীত্ব কত বেশী—তাঁদের ভুল হওয়া কত মারাত্মক—তাঁদের ত্রুটি কত ক্ষমার অযোগ্য। তথাপি যাঁরা আজো দেশের নেতা, একদিন যাঁদের সুযোগ্য পরিচালনায় দেশ এতখানি এগিয়েছে—তাঁদের বারম্বার আমি নমস্কার করি! কিন্তু আজ দেশ চায় যোগ্যতম নেতা—যিনি জীবনকে রুদ্রের আহ্বানে সাড়া দিতে বলবেন। বজ্রের ঝঞ্ঝনায় এগুতে বলবেন! তোষণ এবং পোষণ নীতিকে যিনি ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করবেন।

উমাপদ কয়েক মিনিট কিছু না বলে সিগারেট টানতে লাগলো। আর একখানা বাস আসছে। ওতে চড়ে সে কর্ম্মস্থানে চলে যাবে—সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বললো—তাহলে যাবি না তো? আচ্ছা, আমি চললাম।

বাসে উঠে পড়লো সে। আলোক ফিরেও তাকালো না। এই সুবিধাবাদী লোকটির সঙ্গে কয়েকমিনিট কথা বলার জন্য ওর মনটা যেন খারাপ বোধ হচ্ছে! এর থেকে নওলকিশোরের দল কত ভাল, কত উজ্জ্বল!

আলোক একটা ডিম্বাকার পুকুরের কাছে এল—হেদুয়া! বসলো গিয়ে গাছের ছায়ায়। রাস্তার ট্রাম-বাস যথারীতি চলছে। মানুষের ভীড়ের জন্য মানুষের জীবন রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠছে ওখানে! এই নাগরিক সভ্যতার বিরুদ্ধে মন ওর বিদ্রোহ করেছে বরাবর। ওর নদীকূলের শান্ত পল্লীজীবন আজ আর ফিরে আসবে না; ওকে এই নাগরিক জীবনেই অভ্যস্থ হতে হবে! কিন্তু কেমন করে হবে! হবে একদিন, আর সেদিন খুব দূরেও নয়, কারণ ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ সবই সইতে পারে, সব নীচতাকেই আশ্রয় করতে পারে—তাই এদেশে এত ক্ষুধা, এত তৃষ্ণা জাগিয়ে রাখা হয়েছে। শ্বাপদ জন্তুর মত দীর্ঘদিন অনাহারে থাকার

পর, শ্মশানের মৃত দেহের সন্ধান দিয়েছে কে যেন তাদের। ক্ষুধায়, পিপাসার তাড়নায় ওরা ছুটছে—ওরা শব-খাদক শৃগাল। ওদের জন্য হাজার রকম অভাব সৃষ্টি করে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য দেবার সুমহৎ পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছে—আপনাদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে তাই খাবে ওরা!—আলোককেও যেতে হবে নাকি ঐখানে! না—আলোক যাবে না। প্রলোভনকে সে জয় করবে যেমন করে হোক! কিন্তু ক্ষিদে তার ইতিমধ্যেই ভয়ানক হয়ে উঠেছে। আলোক দীঘির ওপাশে তাকালো; কে একটা ভিখারিণী রাস্তার ধারে বসে—পাতা আঁচলে একটা কচি ছেলে। পয়সাও দিচ্ছে কেউ কেউ। আলোক আস্তে উঠে গিয়ে দেখলো, গত রাত্রের সেই মেয়েটি। শিশুকে আঁচল পেতে শুইয়ে সে জনগণের দয়া আকর্ষণ করবার দিব্যি সুব্যবস্থা করে নিয়েছে! বাঃ—বেশ বুদ্ধি তো! আলোক নিজের মনেই প্রশংসা করলো ওর—ঘৃণায়? নাকি গৌরবে?

পাঁচ হাজার একার জায়গা কেনা হয়ে গেছে নদীর ধারে। তিন চার খানা গ্রাম আর হাজার হাজার বিঘে ধানী জমি, তার সঙ্গে আম-কাঁঠালের ফলন্ত বাগান—মাছ ভর্ত্তি পুকুর—সব গেছে। জায়গাটায় নাকি গরু-ছাগল-ভেড়া ইত্যাদির চাষ হবে—আর গ্রাম উন্নয়ন স্কিমের কি-সব কাজ হবে। হবে অনেক কিছুই; হবার জন্য বিস্তর জায়গা পড়েছিল নদীর কিনারে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের নজরে পড়লো এই গ্রাম তিনখানা,—ভালো ভালো আমন ধানের জমিগুলো, গ্রামের মধ্যস্থ একটি প্রাচীন কালী মন্দির আর প্রাচীন বাস্তু ভিটে। ক্ষুদ্র জমিদার আর ক্ষুদ্রতম দীন প্রজাপুঞ্জের ক্ষীণতম আবেদন কারো কাণে পৌঁছুলো না—গ্রামশুদ্ধ মানুষগুলো হণ্যে হয়ে কে-কোথায় চলে যেতে বাধ্য

হোল। সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে যাবার দিনে চোখের জল ওদের আগুনের চেয়েও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল কি না, কেউ খবর রাখে না—কারণ আজকার এই অতিমানবীয় যুগে চোখের জলের উত্তাপ নিতান্তই উচ্ছ্বাসের প্রলাপ। তাই গ্রামকে উৎসন্নে দিয়ে এই গ্রামোন্নয়ন। সমষ্টীর প্রয়োজনে ব্যষ্টির ত্যাগ আজ প্রয়োজনীয়, এই অজুহাতে ওদের জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর, পুকুর-বাগান, মন্দির-মসজিদ সব কেড়ে নিল অতিমানবের দল। ওরা নিঃসহায়, নিশ্চুপেই চলে গেল।

অবন্তীর বাবাও গেলেন। ছোট গ্রামের ছোট জমিদার তিনি; অতি মাত্রায় আধুনিকপন্থী মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে একবার বিলাত অবধি ঘুরে এসেছিলেন; নিজেকে অতিশয় বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ মনে করতেন। এ পর্য্যন্ত বহু টাকাই তিনি রাজসেবায় ব্যয় করেছেন এবং শেষে রায়বাহাদুরও হয়েছেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হোল না। প্রয়োজনের তাগিদে বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক,—তাঁর জমিদারী সমেত ঘরবাড়ী অপরপক্ষের দ্বারা ক্রীত হয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে ভদ্রলোক পত্নী-কন্যাকে নিয়ে কলকাতা যাত্রা করলেন যে-কটা টাকা জমিদারী বিক্রির দরুণ পেলেন তাই সম্বল করে। অনেক পূর্ব্বেই একমাত্র পুত্র আগষ্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজদ্বারে অতিথি হয়েছে।

কিন্তু অনেকের ভাগ্যও ফেরে এইরকম বিপর্য্যয়ের মধ্যে। ঐ গ্রামেরই একটা ছোকরা—নাম সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী—গ্রামের পুরোহিত ঠাকুরের একমাত্র বংশধর—ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত পড়েই বুঝে নিয়েছিল যে বর্ত্তমানকালে পৌরহিত্য করবার জন্য আর বেশি বিদ্যার দরকার হয় না—কাজেই স্কুল ছেড়ে গাঁজা এবং তালের তাড়িতে বেশ লায়েক হয়ে উঠেছিল। এবং আনুষঙ্গিকভাবে গ্রামের দু'চারটি দুশ্চরিত্রা মেয়েদের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা ঘনায়মান হচ্ছিল বিশেষভাবে। পিতৃ বিয়োগের পর সিদ্ধেশ্বর বিঘে চার পাঁচ ধানী জমি আর প্রায় বিঘে পঞ্চাশ ব্রহ্মোত্তর

ব্রহ্মডাঙ্গার মালিক হয়ে পড়লো ; হাতে এল গ্রামের যজমানগুলোও! বছরখানেক বেশ কেটে গেল, কিন্তু যজমানেরা অবিলম্বে বুঝতে পারলেন যে এরকম পুরুত দিয়ে ধর্ম্মের কাজ করানোতে অধর্ম্মই অনেক বেশি হচ্ছে—তাঁরা ভিন্ন গ্রাম থেকে পুরুত আনতে লাগলেন। গাঁজা-মদ-তাড়ির খরচে টান ধরায় সিদ্ধেশ্বর পৈতৃক ধানী জমিটুকু বিক্রী করতে বাধ্য হোল—বেশ চললো আবার দিনকতক। তারপরই এলো পঞ্চাশের মহামন্বন্তর। সিদ্ধেশ্বর অকুল পাথারে ভাসলো, তার পঞ্চাশ বিঘে ব্রহ্মডাঙ্গায় কোনো ফসল জন্মায় না—পাথুরে মাটি, সেখানে জন্মাতে ঘাসেরও ভয় করে, কাজেই কেউ সে-জমি কিনলো না। ঠিক এই সময় বরতাফেরে উন্নয়নপরিকল্পনার আওতায় পড়লো তার ব্রহ্মডাঙ্গা! বেশ চড়া দামই পেয়ে গেল সিদ্ধেশ্বর—হাজার কয়েক টাকা একসঙ্গে! উঃ! সে কি স্ফূর্ত্তি! সিদ্ধেশ্বর টাকার বাণ্ডিলটা নিয়ে বাড়ী ফিরবার পথে জামিদার বাড়ীর সামনে দিয়ে ফিরছে—জমিদারবাবু পত্নী আর কন্যাকে নিয়ে কলকাতা যাচ্ছেন। দাঁড়িয়ে গেল সিদ্ধেশ্বর—চোখাচোখী হয়ে গেল অবন্তীর সঙ্গে। উঃ! কী আশ্চর্য্য রূপ মেয়েটার! এত বড় হয়ে উঠেছে নাকি! অনেকদিন সিদ্ধেশ্বর ওকে দেখেনি! দেখে আজ একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু অবন্তীকে পাবার মত কোন যোগ্যতা নেই তার—সে জ্ঞানটুকু আছে সিধুর। তবে বুদ্ধি এবং বল তার কম নেই। তাছাড়া গ্রাম ছেড়ে যখন যেতেই হবে তখন ভয়ইবা কিসের? সিধু সবিনয়ে রায় বাহাদুরকে প্রশ্ন করলো—এই নটার ট্রেণেই যাবেন?

—হ্যাঁ! কালকার দিনটাও সময় আছে বটে, কিন্তু থেকে আর লাভ কি!

—সে কথা ঠিক! আমিও আজই যাব। এখন ক'টা বাজলো?

রায় বাহাদুর ঘড়ি দেখে বললেন—সাতটা কুড়ি—যাবে তো চলো; এখনো যথেষ্ট সময় আছে। তোমার সব গোছানো আছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! আমার আর গোছানো কি! আপনারা এগোন, আমি ষ্টেশনে গিয়ে মিট করছি।—অবন্তীকে শুনিয়ে সিধু 'মিট' কথাটা বললো! এরকম দুটো-একটা ইংরাজী কথা সে বলতে পারে। সিধু বাড়ী চলে যাবার পর রায়বাহাদুর ভাবলেন, জিনিষপত্র নিয়ে কলকাতা যাওয়া, সঙ্গে মেয়েছেলে, গাড়ীতে ভীষণ ভীড়, তার উপর মিলিটারীদের আনাগোনা—সিধু থাকলে সুবিধাই হবে। তিনি উল্লসিত হলেন সিধুর কথায়।

সিধু বাড়ী এসে পড়লো যেন ছুটেই। সন্ধ্যা হয়েছে কিন্তু সন্ধ্যাদীপ আর জ্বালাবার দরকার হবে না এ ভিটেতে। ভিটে এখন অন্যের। তাছাড়া সময় কৈ? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিধু পুরোনো ট্রাঙ্কখানায় কাপড় চোপড় ভরে নিয়ে, আর তার চামড়ার নতুন সুটকেশটাতে টাকার বাণ্ডিল এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি নিয়ে গৃহত্যাগ করলো। আজন্মের বাস্তুভিটে ত্যাগ করতে তার আধঘণ্টার বেশী সময় লাগলো না। আশ্চর্য্য! ও একবার ভেবে দেখলো না, জন্মভূমিকে সে জন্মের মত ত্যাগ করে যাচ্ছে। কিন্তু বাড়ী থেকে বেরিয়েই মনে পড়লো, ওর বাবার পূজোকরা শালগ্রামের নুড়িটা এখনো ঘরে আছে; কিন্তু কি হবে ওটা নিয়ে! অনর্থক বোঝা বাড়ানো, তথাপি সিধু কয়েক পা এগিয়ে গিয়েও আবার ফিরে এলো ঘরে—পেতলের ছোট সিংহাসনটা থেকে লাল কাপড় জড়ানো শিলাটুকু পকেটে ভরে আবার বেরিয়ে পড়লো।

ষ্টেশনে এসে দেখলো, গরুর গাড়ীতে রায়বাহাদুর সেই মাত্র এসে পৌছলেন। সিধু সোজা হাঁটাপথে চলে এসেছে। নিজের বাক্স সুটকেশ নামিয়ে সে রায়বাহাদুরের জিনিষ নামাতে সাহায্য করলো যথেষ্ট। গায়ে প্রচুর তার শক্তি এবং কাজে সে সত্যিই দক্ষ। এমন কি, তার কাজ দেখে অবন্তীও খুসী হয়ে বলে উঠ্‌লো—ভাগ্যিস সিধুদা এসেছিল, নইলে কে এত সব করতো বাবা!

—সত্যি মা, সেকথা সত্যি! সিধু সত্যি ভাল ছেলে!

রায়বাহাদুর প্রশংসা করলেন। অবন্তী সানন্দে সিধুর কাঁধে হাত দিল নিচু প্লাটফর্ম্মে দাঁড়ানো গাড়ীতে উঠ্‌বার জন্য। বলল—তুমিও এই কামরাতেই উঠবে ত সিধুদা?

—হ্যাঁ, উঠবো!—সিধু আনন্দে যেন মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ছে। অবন্তীর আহ্বান ওকে কী এক অপূর্ব্ব সোমরস পান করাচ্ছে যেন! গাড়ীতে উঠে সিধু বসলো এক পাশে! অবন্তীর বসবার যায়গাটা বেশ নিরাপদ এবং আরামপ্রদ হয়েছে তো! সিধু লক্ষ্য করলো। হ্যাঁ, অবন্তী ভালই বসেছে। ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ী—বদল করতে হবে জংসনে! সেই সময় সিধু কার্য্যসিদ্ধি করবে। কিন্তু অবন্তী যে ভাবে 'সিধুদা' বলে ডাকছে—তারপর ওকে বিপন্ন করতে যেন নেশাখোর সিধুর আত্মা আতঙ্কিত হচ্ছে! সিধু বিড়ি বার করবার জন্য পকেটে হাত দিল। হাত পড়লো শালগ্রাম শিলাটার গায়ে; চমকে উঠলো সিধু! ওর মানবত্ব আকস্মিক আঘাতে জেগে উঠলো যেন।

অবন্তী জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। দূরে নদীর কাশবন আর তার ফাঁকে ফাঁকে বালুবেলা দেখা যায়। আজন্মের পরিচিত ক্রীড়াভূমি! ওর ক্রীড়াসঙ্গী আলোক আজ কোথায়? অবন্তীর বুক থেকে একটা সুদীর্ঘ শ্বাস বেরিয়ে এল। এ গ্রামে আর ওরা আসবে না—এ মাটীতে আর ওদের পা পড়বে না। জন্মভূমির মমতা মানুষকে কেমন করে আকর্ষণ করে, আজ অবন্তী তা ভালো করে বুঝতে পারছে। কার অভিশাপে ওরা আজ গৃহছাড়া! শান্ত পল্লীর নিরীহ অধিবাসী ওরা—কারো কোনো ক্ষতি করবার কোন চিন্তাই কখনো জাগে নি ওদের মনে।

ওদের সমাহিত স্তব্ধ জীবন তবুও সংঘাতে ক্ষুব্ধ হোল—সর্ব্বহারা হয়ে গেল একদিনেই। পরাধীনতার অভিশাপ—বিদেশী বণিকের শোষণ-পরায়ণতা ওদের অকারণে গৃহছাড়া করলে।

চোখদুটো ছল ছল করছিল অবন্তীর। আলোকের কথা মনে হোতেই কিন্তু চোখের ভিজে পাতা শুকিয়ে উঠলো উত্তাপে। যেন জ্বালার জ্বলন্ত প্রকাশ সে চোখে।—'এই অভিশাপ আশীর্ব্বাদ হোক'—সহরের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে অবন্তী এই দেশত্যাগের অভিশাপকে আশীর্ব্বাদে পরিণত করবার ক্ষেত্র পাবে। যে ক্ষেত্র স্বদেশের শ্রেয়ঃ লাভের দিকে ওকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যেখানে আলোক সহস্র মুর্ত্তিতে কাছে এসে দাঁড়াবে—মৃত্যু যেখানে অমৃত হয়ে উঠবে।

—অবন্তী!—সিধু আস্তে ডাক দিল। অন্যমনস্ক অবন্তীর মনে হোল, বহু দূর থেকে কে যেন ডাকছে, যেন আলোকই ডাকলো তাকে।—হ্যাঁ—আমিও যাব—আস্তেই বললো অবন্তী। যেন স্বপ্নে কথা কইছে।

আত্মবিস্মৃতের এই কথাটুকু সিদ্ধেশ্বরকে বিচলিত করলো; কোথায় যাবে অবন্তী! সিধু তো তার কল্পনার কথা প্রকাশ করে নি এখনো! অবন্তী কি তার মনের কথা বুঝতে পেরেছে? ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হয়ে গাড়ীটা জংশনের নিকটবর্ত্তী হচ্ছে। সিদ্ধেশ্বরের ইচ্ছা কোনক্রমে অবন্তীকে ভুলিয়ে পশ্চিমগামী কোন মেলট্রেণে উঠতে পারলেই তার আকাঙ্খা পূর্ণ হতে পারে। তার পর বহুদূর দেশে কোথাও গিয়ে অবন্তীকে বিয়ে করে রায়বাহাদুরের কাছে খবর পাঠালেই চলবে। টাকা তো উপস্থিত হাজার পাঁচ আছে, বেশ কিছুদিন চলে যাবে দুজনের; কিন্তু মনের ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করতে বহু বাধা। প্রথম বাধা পকেটের শালগ্রাম শিলাটাই দিয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত কাজ ঠিকমত করে উঠতে পারবে কি না, সিদ্ধেশ্বর ভাবছিল। শালগ্রামটা শুধু শক্ত

মনকে যেন প্রথমেই খানিকটা দুর্ব্বল করে দিয়েছে! কিন্তু সিধু নারীহরণ কার্য্যে এই প্রথম হাতে খড়ি নিচ্ছে না, এর পূর্ব্বে দুচারটা গরীব ঘরের মেয়েকে নিয়ে সে এ কাজে পোক্ত হয়ে উঠেছে! একবার ধরা পড়ে শাস্তি পাবার মতও হয়েছিল, কিন্তু গ্রামের পুরোহিতের ছেলে বলে গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণ কোনরকমে ওকে সে যাত্রা বাঁচিয়ে দেন। রায়বাহাদুরই বিশেষভাবে পরিশ্রম করেছিলেন তখন ওর জন্য! আজ সেই রায়-বাহাদুরের কন্যার উপরই সিধুর লোভ দুর্ব্বার হয়ে উঠলো।

এসব কাজে সিধু অতিশয় সাবধানী। সব দিক বাঁচিয়ে তবে সে কাজটা করতে চায়। হঠাৎ কিছুতে হঠকারিতা করবার মত লোক সে নয়। তাই আস্তে জিজ্ঞাসা করলো—সত্যি যাবে তো?

—কোথায়?—অবন্তী যেন আকস্মিক আঘাতে সঙ্কুচিতা হয়ে উঠলো। জংসন ষ্টেশনটা এসে পড়েছে। গাড়ী প্লাটফর্ম্মে ঢুকলো। গতি মন্থর হয়ে উঠলো ট্রেনের! যাত্রীরা যে-যাঁর জিনিষ গোছাচ্ছে, কারণ ওদিক-কার প্লাটফর্ম্মে কলকাতাগামী ট্রেণ দাঁড়িয়ে আছে, এ গাড়ীর প্যাসেঞ্জার-গুলো উঠার যেটুকু দেরী। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ও-গাড়ীতে গিয়ে চড়তে হবে। সিধু চাপা গলায় বলল,

—দূরে, অনেক দূর, হিমালয়। বদরিকাশ্রম, দিল্লী, কাশী—গয়া! ভূগোল পড়া বা দেশ ঘোরা নাই সিধুর, কোন্ জায়গাটা আগে পড়ে, তার খবর জানে না সে। কয়েকটা নাম-জানা বড় বড় জায়গার নাম করে দিল। কিন্তু অবন্তী শুধু শিক্ষিতা নয়, সুশিক্ষিতা। সিধুর বিদ্যা-বুদ্ধির কথা সে জানে, তাই হেসেই বললো—বেশ তো! আগে তো কলকাতা চলো।

জিনিষপত্র গুছাতে হবে—নামাতে হবে। রায়বাহাদুর সিধুকে ডাকলেন। হাতের চেটোর আড়ালে জ্বলন্ত বিড়িটা লুকিয়ে সিধু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জিনিষ নামাবার জন্য কুলি ডাকতে লাগলো।

বিড়িতে দুটো টানও দিয়ে নিল এই ফাঁকে। জিনিষপত্র নামিয়ে ওদিককার প্লাটফর্মে আসতে সিধু দেখতে পেল, পশ্চিম যাবার গাড়ী আপ্ পাঞ্জাব মেল ঠিক পরের প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে। কোন-রকমে অবন্তীকে ওতে তোলা যায় না? একবার তুলে ফেলতে পারলেই বহুদূর চলে যাওয়া যাবে। সিধুর অন্তরে প্রলোভনটা যেন দৈত্যের মত জেগে উঠছে। অবন্তী পিছনে আসছিল, সিধু আস্তে বললো, —যাবে দিল্লী? ঐতো গাড়ী।

—যাবো! কিন্তু আজ নয়—যেদিন লাল কেল্লায় ভারতের জাতীয় পতাকা উড়বে—বলেই হাসলো অবন্তী।

সিদ্ধেশ্বরের বিদ্যায় অত শক্ত শক্ত কথার অর্থ বোধ হয় না। সে বিশেষ কিছু না বুঝেই কলকাতাগামী গাড়ীর কাছেই এসে দাঁড়ালো। জিনিষ পত্র তোলা হল, অবন্তীও উঠে বসলো কামরায়। তাকে নিয়ে এখন পাঞ্জাব মেলে তোলা অসম্ভব। সে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে গেছে গাড়ীতে। কিন্তু সিধু কি ওদের সঙ্গে কলকাতাতেই যাবে? কেন! ওর হঠাৎ যেন মতলব ঘুরে গেল। কলকাতা তার যাবার কি দরকার? তার চেয়ে দিন কয়েক দেশ বিদেশ ঘুরে এলে বেশ তো হয়। কাশী, গয়া, হরিদ্বার! কি-জানি কেন, সিধু হঠাৎ রায়বাহাদুরের পায়ের ধুলো নিয়ে বলল—আমি তাহলে চল্লাম! কাশীই যাব এখন, তার পরে যেখানে হোক।

বিস্মিতা অবন্তী ছুটে দরজার কাছে এসে বললো—সেকি সিধুদা! তুমি যে আমাদের সঙ্গে কলকাতা যাবে বলেছিলে?

—ওরকম কত কি বলি আমি—ওসব কথা কি ধরতে আছে! আচ্ছা, আসি।

কলকাতাগামী ট্রেণ ছেড়ে দিল। সিধু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। পকেটে হাত দিয়ে শালগ্রামের নুড়িটা

নাড়ছে ও। ওর পিতৃপিতামহের সংস্কৃত রক্তটা যেন শিরায় চাঞ্চল্য জাগাচ্ছে। প্রলোভনটাকে খুব সে সামলে গেছে এ যাত্রায়।

কলকাতায় বাড়ী পাওয়া প্রায় মোক্ষলাভের মতই সাধনার ব্যাপার হয়ে উঠেছিল সেই যুদ্ধের দিনে। রায়বাহাদুর প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি; তাছাড়া শ্বশুর বাড়ীর অর্থাৎ অবন্তীর মামাদের একখানা বাড়ী আছে। ঐ বাড়ীতেই এসে উঠলেন! নীচের দুখান ঘর কোনরকমে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হোল।

যুদ্ধের অবশিষ্ট তিনটা বছর উনি পত্নী এবং কন্যাকে নিয়ে ওখানেই বাস করতে বাধ্য হয়েছেন—কারণ বহু চেষ্টা করেও বাড়ী মেলে নি। অবন্তীর কিন্তু বিস্তর পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে এর মধ্যে। পল্লীবাসিনী অবন্তী সহরবাসিনী হয়েছে—সহুরে কায়দায় পেঁচিয়ে শাড়ী পরে কলেজ যায় এবং সহুরে রেষ্টোরেণ্টে খানাও খায়। যারা চিরকাল সহরে থেকে মানুষ, তারা সহরের বাহ্যিক চাকচিক্যে অত চট করে মজে যায় না, হঠাৎ-সহরে-আসারা যেমন যায়! এর প্রমাণ কলকাতার বনেদী বাসিন্দাদের মধ্যে অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যাবে। কলকাতার আদিম বাসীন্দারা এখনো লক্ষ্মী-ষষ্টির পূজো করেন, উচক্কার মত এখনো রাস্তায় বেরুন না—এখনো তাঁরা বাঙ্গালী কন্যা-বধূ, কিন্তু হঠাৎ-আসা পল্লীকন্যারা দুদিনেই মেম্‌সা'ব বনে যান। এত সহজে তাঁরা নিজেকে সহুরে করে তোলেন যেন এই সাধনায় না সিদ্ধিলাভ করতে পারলে পরমার্থই লাভ হোত না।

অবন্তীরও পরমার্থ লাভ হোল। রায়বাহাদুর একেই তো যথেষ্ট আধুনিক পন্থী, তারপর কলকাতায় এসে কন্যার রূপ এবং গুণের

প্রশংসা চতুর্দ্দিকে শুনে ভেবে নিলেন যে কন্যা তাঁর অসাধারণেরও অসাধারণীয়া। তৈরী করতে পারলে সে একখানা ওয়ার্লড্-ফিগারে দাঁড়াবে। তিনি যত-রকম আপ্-টু-ডেট হবার উপায় প্রচলিত আছে সবগুলোই ব্যবস্থা করে দিলেন অবন্তীর জন্য। মামাতো বোন রাগিনী অবন্তীর সমবয়সী। দুটিতেই বেশ আধুনিকা হয়ে উঠলো কয়েক মাসের মধ্যেই। রায়বাহাদুরও বিলাত ফেরৎ ঘুঘু ব্যক্তি। সম্বন্ধীর কারবারে যোগ দিয়ে কালোবাজারের কসরৎ চালিয়ে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জনও করতে লাগলেন। অর্থাৎ কলকাতায় এসে গ্রাম্য জমিদার রায়বাহাদুর বেশ ফুলে-ফেঁপেই উঠতে লাগলেন—অবন্তীও আধুনিকত্বের আলেয়ার পিছনে ছুটে চলতে লাগলো। অবন্তীর মা প্রথম দিকে বাধা দেবার চেষ্টা একটু করেছিলেন। কিন্তু ভাই, ভাই-বৌ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীর বাক্য-বাণে বিদ্ধ হয়ে তিনি নীরব হয়ে যান। বর্ত্তমানে অবন্তী পরিপূর্ণা আধুনিকা, মোটর বিলাসিনী বাঙ্গালী মেম্‌সাব্।

কিন্তু উন্নতি আরো নানা দিকে হয়েছে অবন্তীর। বাবার সঙ্গে বড় বড় অফিসারদের কাছে গিয়ে সে মোটা টাকার কন্‌ট্রাক্ট সই করিয়ে আনে। মামাতো বোন রাগিণীর সঙ্গে রাত দুটো অবধি রেষ্টুরেণ্টে খানা খেয়ে বাড়ী ফেরে। যুদ্ধের প্রয়োজনে আরো নানান কাজে নারী-নিয়োগের ক্ষেত্রে অবন্তী একটা বড় পাণ্ডা। কিন্তু দুর্নীতি এসব ব্যাপারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। অবন্তী বা রাগিণী তার আবহাওয়া থেকে বাদ গেল না। দেহ এবং মন যখন তাদের নিত্য কলুষিত হতে লাগলো মাংসলোলুপ পাশবত্বের বুভুক্ষার আগুনে—তখনো রায়বাহাদুর জানতে পারেন নি, কন্যা তাঁর কতখানি আধুনিকা হয়েছেন। যেদিন জানলেন পত্নীর মারফৎ, সেদিন তিনি বিপুল অর্থের মালিক—এই মন্দার বাজারেও লেকের ধারে আধবিঘা জমির উপর তিনতলা প্রাসাদ বানাবার প্ল্যান করছেন—কিন্তু খবরটা জেনে প্রায় দুমিনিট 'থ' হয়ে রয়ে

তাকে স্বহস্তে গলাটিপে হত্যা করার সময় ওর মনে হোল—কি যে ঠিক মনে হয়েছিল, উৎপলার মনে পড়ে না—শুধু মনে আছে, সে শুধু একটা যন্ত্রকে চিরদিনের মত বিকল করে দিচ্ছে না, একটা বিশ্বব্যাপিনী চৈতন্যশক্তির বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করছে। যন্ত্রকে বিকল করে দেবার চেষ্টা করলে যন্ত্র কিছুমাত্র প্রতিবাদ জানায় না—কিন্তু সেই একফোঁটা মাংসের ঢেলাটা সশব্দে প্রতিবাদ জানিয়েছিল—নিজেকে রক্ষা করবার জন্য অদ্ভুত চেষ্টা সে করছিল শেষ অবধি, শেষে অসহায় হয়ে আত্ম-সমর্পণ করলো উৎপলার বজ্রমুষ্টির তলায়—কিন্তু তখনো উৎপলা দেখে-ছিল, ঐ অতি ক্ষুদ্র শিশুর চোখে সে কী নিষ্ঠুর ঘৃণা—কী অসহায় আর্ত্ততার মধ্যেও ওর কচিঠোঁটে জীবনকে রক্ষা করবার অনমনীয় দৃঢ়তা! ও যেন কিছুতেই মরতে চায় না—কোন রকমেই বিকল হতে চায় না। উৎপলার তখুনি মনে হয়েছিল—ও যন্ত্র নয়—ও জীবন! অনন্ত ব্যাপিনী জড়-প্রকৃতির চৈতন্য-স্পন্দন ওর মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে—যেমন হচ্ছে এই সারা বিশ্বের প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে। ঐ প্রাণের ধ্বংস নেই—ও দেহ থেকে দেহান্তরে আশ্রয় করবে—আবার এই পৃথিবীর আকাশ বাতাসে চোখ মেলবে—হাসবে, কাঁদবে—আবার কোনো মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলবে—'গত জন্মে তার নিজের মা তার গলা টিপে…'—উৎপলা বালিশের উপর নেতিয়ে পড়লো ; অজ্ঞান ঠিক হয় নি—অর্দ্ধমূর্চ্ছিত! এখনো ও বড় দুর্ব্বল। বড় বড় আদালতের বিচার এবং দণ্ড নয়—সামান্য একটা শিশুর ঘৃণা এবং দৃষ্টির বিচারই ও আজ সইতে পারছে না—মনটা ওর কতখানি অসহায়! ঐ শিশু যেন ওর বিচারকর্ত্তা। কি দণ্ড দেবে কে জানে?

কিন্তু ওর মা এসে পড়লো। ওর মা—একটা ডায়নামিক স্পিরিট—আশ্চর্য্য মেয়ে! দরকার মত কথা বলতে এবং বক্তৃতা দিতে ওর জুড়ি নেই। বালিশ থেকে উৎপলার মাথাটা তুলে তাকে বসিয়ে দিয়ে

বললো,—মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে অনেক কিছুই করতে হয় পলা—বুঝলি! এই পৃথিবীতে তুই একাই এ কাজ করিস নি। ইতিহাস ঘেঁটে দেখ—শত সহস্র ঘটনা পাবি এমন। এর জন্যে অতখানি হা-হুতাশ তুই করবি, জানলে—আমি তোকে অন্যত্র বিদায় করে দিতাম কী এমন হয়েছে যে তুই অমন করছিস দিনরাত?

—কিছু না মা, কিছুই না—উৎপলা এর বেশী আর কোন কথা বলে না।

—কিছু না তো অমন করছিস কেন? একটা জন্মেছিল গেছে। তাতে কি এমন ক্ষতি হবে তোর? ঐ যে বুড়ো নিম গাছটা—পঞ্চাশ বছর ধরে কত ফল ও ফলিয়ে এল—তার বীজের কটা গাছ হয়েছে?

—ও তার কোন ফলকে গলা টিপে মারে নি—উৎপলা বললো

—ও মারেনি, আর কেউ মেরেছে! সব ফলগুলোর বীজ বড় গাছ গজালে এই পৃথিবীতে নীমগাছ ছাড়া আর কিছুই থাকতো না; প্রকৃতি এ সব ব্যালান্স রেখেছে। মারার কর্ত্তা তুই নোস!

—জ্বর-বিকারে মরলে একথা বলা তোমার মানাতো মা—প্রকৃতির ধ্বংস-লীলার দোহাই এ ক্ষেত্রে না দেওয়াই ভাল; কিম্বা প্রকৃতিই আমার মধ্যে রাক্ষসী প্রকৃতি সৃষ্টি করেছিল।

—অতসব আজগুবি কথা ভাবিস না উৎপলা। ওকে বাঁচিয়ে রাখলে সমাজে-সংসারে তোর বেঁচে থাকা চলতো না। দেশের একটা সমাজ আছে, নীতি আছে, ধর্ম্ম আছে, সে সব তো অগ্রাহ্য করতে পারি না বাছা! নিজের জীবনটাই আগে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

উৎপলা কিছুই বললো না, চুপ করে রইল। ওর মা আবার বললে—নিতান্ত ছেলেমানুষ তুই, বিয়ে করতে হবে, সংসার করতে হবে! হ তো মিটে গেল। এখন আবার মানুষকে সমাজ-সংসারের দিকে

তাকাতে হবে। কিছু টাকাকড়িও হয়েছে—যাতে সব দিক ভাল হয়, তাই আমরা করলাম। নে, ওঠ, গরম জলে গা' মুছে কিছু খা দেখি।

উৎপলা তবু কিছু বললো না। ওর মা গরম জল আনতে গেল। বিছানায় বসে বসেই উৎপলা দেখতে পেল, দূরে একটা মাঠে অনেক লোক জমা হয়েছে। জাতীয় জীবনে আজ নিশ্চয় কিছু একটা বিশেষ দিন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির সঙ্গে নব প্রচলিত 'জয় হিন্দ' ধ্বনিও আকাশকে ভেদ করে উর্দ্ধে উঠছে কে জানে কোন্ দেবতার চরণতলের উদ্দেশে! উৎপলা ভাবতে লাগলো—এই যে জাতীয় জীবন এবং তার জাগরণ, এর মধ্যেও সেই শাশ্বত অমর প্রাণই স্পন্দিত হচ্ছে। জাতির আত্মারই জীবনাকাঙ্ক্ষা, নিজেকে এই নিরুপায় অসহায়তার মধ্যেও বাঁচিয়ে তুলবার জন্য প্রাণপণ প্রতিবাদ। ঠিক যেমন ওর শিশুটি প্রতিবাদ জানিয়েছিল—অসহায়তাকে অগ্রাহ্য করেও জানিয়েছিল প্রতিবাদ। উৎপলা অনুভব করলো—ভারতীয় জাতীয় জীবন অমনি অসহায় শিশু—তার এই প্রাণপণ প্রতিবাদ হয়তো অপর পক্ষের নির্ম্মম বেয়নেটের তলায় পিষ্ট হয়ে যাবে—হয়তো এই জাতীয়ভাবোধ ঐ জাতীয় পতাকার সঙ্গে ডাষ্টবীনেই পড়বে গিয়ে! কিম্বা কে বলতে পারে—এই জাতীয়তাবোধ একদিন জাগ্রত পৃথিবীকে জানিয়ে দেবে—জীবন কখনো পরাভূত হয় না। সে অনন্তবার জন্মায়, অনন্তকাল ধরে সংগ্রাম করে এবং শেষে একদিন জয়ীই হয়। এই বিজয় লাভ তার পুরুষাকার দ্বারা অর্জ্জিত।

ওর মা গরম জল আর তোয়ালে নিয়ে এল। গা মুছে কিছু খাবে উৎপলা। খাবে! সে আর একবার ভাল করে বেঁচে থাকবে, বেঁচে দেখবে, জীবনকে সার্থক করবার জন্য কিছু সে এখনো করতে পারে কি না। রুদ্রের আহ্বান যেন জাগছে ওর অন্তরে—যে রুদ্র জীবনরূপে জগতের প্রতি প্রাণীর মধ্যে বাস করেন। উৎপলা বিছানা থেকে নেমে

জাতীয় পতাকাকে নমস্কার করলো—বললো—হে জীবনের জাগরণের প্রতীক, তোমাকে মাথায় তুলে সগৌরবে এগিয়ে চলবার শক্তি আমায় দান কর!

সিদ্ধেশ্বর সেই যে জংশনে অবন্তীদের ছেড়ে গেল, তারপর থেকে তার জীবনের গতি ভিন্নমুখে ফিরলো। সেদিন পশ্চিমগামী একখানা মেলট্রেনে উঠে সে প্রথম এল বেনারস—বাঙালীটোলায় তার বাবার এক বন্ধুর বাড়ী। পিতৃবন্ধু সযত্নে তাঁকে গ্রহণ করলেন এবং নানা সদুপদেশ দিয়ে কিছু একটা ব্যবসা করবার কথা বললেন। সিদ্ধেশ্বর এযাবৎ কারো সদুপদেশে কখনো কর্ণপাত করে নি, কিন্তু আজ ওর মনে হোল, জীবনটাকে নিয়ে এভাবে লটারী খেলার কোনো মানে হয় না। 'ঈশ্বর কৃপায় (ঈশ্বরকে আজ প্রথম স্মরণ করলো সিদ্ধেশ্বর) টাকা যখন অকস্মাৎ অসম্ভাব্যরূপে কিছু এসে গেছে তখন নিশ্চয় ঈশ্বরের ইচ্ছা, সিদ্ধেশ্বর ব্যবসা করে ধনী হবে। কিন্তু কাশীতে কোন্ ব্যবসা করা যেতে পারে, পিতৃবন্ধু সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। সিদ্ধেশ্বর এই সময় কাশী সহরটা ভাল করে ঘুরে জীবনের ভ্রূণাঙ্কুর সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করতে লাগলো। কাশী—মর্ত্ত্যের পবিত্রতম স্থান—বিশ্বেশ্বরের বিহারক্ষেত্র এবং ভারতের প্রাচীনতম নগরীর অন্যতম। কত পুণ্য যে নিত্য হেথা অনুষ্ঠিত হয় তার হিসাব রাখবার জন্য নিশ্চয় স্বর্গে একটা স্বতন্ত্র ডিপার্টমেণ্ট আছে; কিন্তু কত পাপ যে এখানে প্রতি মুহূর্ত্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার হিসাব রাখতে অন্ততঃ পাঁচটা আলাদা ডিপার্টমেণ্ট দরকার। কত রকমের পাপ, কত পুণ্যের ছলনা মাখা, পবিত্রতার মুখোস পরা পাপ এখানে চলছে, ইয়ত্তা নেই। সিদ্ধেশ্বর দিন কয়েক ঘুরে একদিন একটা বহু প্রাচীন,

প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের গলির মধ্যে এক আড্ডায় গিয়ে পড়লো। চমৎকার আড্ডা, নারী এবং পুরুষে ভর্ত্তি, নেশায় সেখানে সকলে নৈর্ব্যক্তিক। সিদ্ধেশ্বরকে তারা মুহূর্ত্তে আত্মীয় করে নিল।

আত্মীয় তারা করলো সিদ্ধেশ্বরকে, কিন্তু সিদ্ধেশ্বর সে আত্মীয়তা গ্রহণ করতে পারলো না। কি জানি কেন, ওর মনের মধ্যে একটা হতাশা দিনে দিনে আগুনের মত দীপ্ত হয়ে উঠছে। টাকাগুলো ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছে সিদ্ধেশ্বর কিন্তু শালগ্রাম শিলাটি এখনো ওর পকেটে পকেটে ঘোরে। মাঝে মাঝে মনে করে, কোথাও বসে একপাতা তুলসী দিয়ে পূজো করবে, কিন্তু সময় হয়ে ওঠে না—অথচ সময় ওর অফুরন্ত! যে আড্ডায় সিদ্ধেশ্বর গেল সেখানকার কদর্য্যতায় সিদ্ধেশ্বর বিশেষ অনভ্যস্থ নয়, এবং ইদানীং ওর মনের পরতে কার-যেন একটা আহ্বানবাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়—'পশ্চিমে যাব সেই দিন যেদিন অভিযান হবে লাল…' কথাটা মনে পড়ার সঙ্গেই একখানি সুন্দর মুখও মনে পড়ে—অবন্তীর মুখ—আশায় উচ্ছ্বাসে দীপ্ত অরুণালোকের মত মুখখানা। সিদ্ধেশ্বর লেখাপড়া খুবই কম জানে। আপনার অন্তরের বিচিত্র রহস্যময়তা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ওর নাই—কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের সংস্কার সংস্কৃতির প্রভাব এবং এই জন্মের বংশগত অভ্যাস ওকে কোথায় যেন দুর্ব্বল করে তুলেছে; ওর মনের মধ্যে কোথায় যেন ব্রাহ্মণমন লুকিয়ে আছে। ওর মনের ব্রাহ্মণত্ব ক্ষমা-দয়া-ত্যাগেই নিবদ্ধ নয়—তপোনিষ্ঠায় বিশ্বামিত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ত্ব ওর মনের মাঝে ওতঃপ্রোত বিজড়িত। কিন্তু এত কথা সিদ্ধেশ্বর ভাবতে পারে না। ওর তবু অবন্তীর শেষ কথাটা মনে হয়;—মনে হয়, অবন্তী কি চায়—কি পেলে সে সুখী হয়—কেমন হ'লে অবন্তীর মনের মত সে হতে পারে!

আড্ডায় দিন আট দশ যাতায়াত করেই সিদ্ধেশ্বর ক্লান্ত হয়ে পড়লো। সর্ব্বদা কদর্য্য-বৃত্তি, কুৎসিৎ পরামর্শ—কুশ্রী জীবন! এখানে ওর ব্রাহ্মণ-মনে

গ্লানি জন্মাচ্ছে, ওর ক্ষত্রিয় মন বিদ্রোহ করছে—ওর সাধারণ মানুষমন পীড়িত হচ্ছে! একদিন গভীর রাত্রে সিদ্ধেশ্বর ঐ আড্ডায় একটা গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ব্যাপার দেখার পর বাকিটা আর দেখলো না—আড্ডা ত্যাগ করলো।

নিজের মনেই গান করছিল সিদ্ধেশ্বর গভীর রাত্রে। কাশী সহরের বুকের বহু বীভৎসতা সে এই কয়দিনেই প্রত্যক্ষ করেছে। ওর ধারণা, শিবের এই মোক্ষভূমে যতকিছু অশিব আড্ডা গেড়ে আছে। কাজেই লোকালয় ত্যাগ করে সে শ্মশানের দিকে কিঞ্চিৎ ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসলো। বসলো সিদ্ধেশ্বর—হয়তো শুয়েই পড়তো ঐখানে, কিন্তু ওর কাণে গেল কয়েকটা কথা—ফিসফাস কথা হলেও, সিদ্ধেশ্বর শুনতে পেল—'স্বরাজ, স্বাধীনতা, লালকেল্লা'। হঠাৎ একজন লোক এসে সিদ্ধেশ্বরকে ধরলো বজ্রহস্তে। ভয়ে চীৎকার করে উঠবার পূর্ব্বেই লোকটা বলল, —চুপ–কথা কয়েছ কি মরেছ! লোকটার হাতে ঝকমক করছে ছোরাখানা। ভয়ে সিদ্ধেশ্বর চোখ বুঝলো। কিন্তু আগন্তুক তার হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে উঠিয়ে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চললো—কোথায় কে জানে!

চলে এলো বহু দূর লোকটা অন্ধকারেই সিদ্ধেশ্বরের হাত ধরে। সহরের রাস্তায় চলেছে কি মাটির তলায় গুহায় মধ্যে চলছে, ঠিক বুঝতে পারছে না সিদ্ধেশ্বর। ভিজে মাটি এবং কাদায় ওর খুবই অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু ও এখন বন্দী। জীবনের উপর কেমন একটা নিস্পৃহ ভাব এসে পড়লো তার—মৃত্যুর হাত থেকে ওর আজ যেন রক্ষা নাই—কিন্তু কী তার অপরাধ? হয়তো এই লোকটা ভেবেছে যে তার কাছে প্রচুর টাকা আছে। টাকা সিদ্ধেশ্বরের আছে, কিন্তু আছে ব্যাঙ্কে। তাতে কি? চেক লিখিয়ে নিতে পারে ওরা। সিধু কিছু টাকা দেবার কথা লোকটাকে বলবে নাকি? কিন্তু ভয়ে তার গলা দিয়ে কথাই বেরুচ্ছে না।

ইতিমধ্যে একটা আলোকিত স্থানে এসে পড়লো ওরা। আলো কেরসীনের কিন্তু বেশ উজ্জ্বল। জনকয়েক লোক বসে আছে সেখানে। সিদ্ধেশ্বরকে দেখে তাদের মধ্যে প্রধানতম একব্যক্তি বললো,

—কোত্থেকে আনলে ওকে ?

—ব্যাটা গুপ্তচর ! লুকিয়ে কথা শুনছিল আমাদের।

—শুনেছে নাকি কিছু ?

—হ্যাঁ—বলেন তো এখুনি সাবাড় করে দিই। জন্মের মত টিকটিকি-জন্ম শেষ হোক।

—আগে ওর দেহখানা তল্লাস করো।

সিদ্ধেশ্বরকে উলঙ্গ করে ফেললো ওরা ; কিন্তু তার কাছে সামান্য কিছু টাকাপয়সা আর শালগ্রাম শিলাটি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। সিদ্ধেশ্বর এতক্ষণে সাহস সঞ্চয় করে কাতর স্বরে বললো—

—আমি গুপ্তচর নয়—সন্ন্যাস নেবার জন্য শ্মশানে গিয়েছিলাম।

—ওঃ। এই পাথরের নুড়িটি কিসের ?

—শালগ্রাম শিলা ! বহুদিন ওঁর পূজা করতে পারিনি—আপনারা যদি পূজা করেন তো নিন—আমি নিতান্তই পাপী-তাপী ব্রাহ্মণ।

—আমরা দেশ-মাতার পূজা করি—তিনি ছাড়া আমাদের কোনো ঠাকুর নেই। কিন্তু তুমি যদি একটা কাজ করতে পার তো তোমার মৃতদেহের সঙ্গে এই শালগ্রামশিলাটিকেও আমরা পুড়িয়ে দেব—পরলোকে গিয়ে পূজা করো।

সিদ্ধেশ্বর নিরুপায় : বললো—যে আজ্ঞে ! আমাকে যদি মরতেই হয় তো ওকে নিয়েই মরবো।

সবাই হেসে উঠলো।

সবাই দুপয়সা কামিয়ে নিয়েছে যুদ্ধের দৌলতে। কেউ আজ কর্ম্ম-হীন নেই—এবং কর্ম্মের মজুরীও যথেষ্ট বেড়ে গেছে। গভর্মেণ্ট রাশি রাশি টাকা ছাড়ছেন—টাকার ইনফ্লাশেন চলছে। বাড়লইবা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম—দু-আনার জিনিষ দু-টাকায় কিনতেও কারো আটকায় না। হাতে অজস্র টাকা—আরামসে খরচ করো!

কিন্তু টাকা তো আর চিবিয়ে বা গিলে খাওয়া যায় না। খেতে হবে চাল বা আটা। সে-খাদ্যের নাকি বড়ই অভাব; শুধু ভারতেই অভাব নয়, সারা পৃথিবীতেই নাকি খাদ্য-সঙ্কট লেগেছে! সে-সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভের জন্য বড় বড় মাথা মাথা ঘামাচ্ছেন। খবরের কাগজওয়ালারা ভাল একটা বিষয় পেয়ে কাগজ ভরাবার বিশেষ সুবিধা পেয়েছেন—এবং বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা গোপনে খাদ্য মজুত করে বিশেষ লাভের আশায় দাঁত মাজছেন। ঠিক এই অবস্থায় অবন্তীর রায়বাহাদুর-বাবা মেয়েকে নিয়ে কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে উঠলেন। কারণ অবন্তীর অবস্থা এখন দেখলেই বোঝা যায়। যদিও অবন্তী নিজে বিশেষ কিছু গ্রাহ্য করে না—তথাপি তার মা অতিশয় সন্ত্রস্থ এবং স্বামীকে সময় অসময় কেবলই ঐ কথাটা স্মরণ করাচ্ছেন। রায়বাহাদুর শ্যালকের সহায়তায় আরো লাখ কয়েক টাকা কামাবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। এ-হেন শুভ সময় এই বিপদপাত।

নানাদিক বিবেচনা করে রায়বাহাদুর অবন্তীকে কাশী পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। মা আর মেয়ে এক সঙ্গেই থাকবে, তারপর কোথাও কোন এক নিভৃত স্থানে ব্যাপারটা ঝেড়ে মুছে আবার শুদ্ধ পবিত্র হয়ে ফিরে আসবে! 'শুদ্ধ-পবিত্র'—কথাটা ভাবতে রায়বাহাদুরের মত অতি-নাস্তিক লোকেরও মনে ধাক্কা লাগলো, কিন্তু মনের জোরে তিনি সে ধাক্কা সাম্‌লে বললেন,—আমার পুরোনো বন্ধু শচীনকে চিঠি লিখেছিলাম—একখানা বাড়ীর জন্য, বাড়ী ঠিক হয়েছে, তোমরা চলে

যাও। মাস চার-পাঁচ থেকে চলে এসো। ভয়ের কিছু কারণ নেই—ওখানে এরকম হরদম হচ্ছে!

—হুঁ—বলে অবন্তীর মা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন আবার—ছেলে বা মেয়ে যাহোক একটা হবে তো। সেটাকে কি করবো?

—ফেলে দেবে। ওখানে সেরকম লোকও পাওয়া যায়। আমি শচীনকে লিখে সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছি!

—জ্যান্তই ফেলে দেব!—অবন্তীর মার গলার স্বরটা আতঙ্কিত যেন।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ; তার সঙ্গে আমাদের কোন পার্থিব সম্পর্কই থাকবে না।

ব্যাস্! রায়বাহাদুর নতুন কেনা বুইক্ গাড়ীখানায় চড়ে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু অবন্তীর মার চিন্তাধারা অন্যরকম। ভদ্রমহিলা কিছুতেই নিজেকে স্বামী বা কন্যার চিন্তাধারার সঙ্গে মেলাতে পারছিলেন না। নিদারুণ একটা আতঙ্ক, একটা বীভৎস অমঙ্গলের আভাস যেন পিশাচের মত তাঁর চোখের উপর নাচতে লাগলো। কিন্তু ওছাড়া অন্য উপায় নাই—অন্য আর কোনো পথেই অবন্তীর জীবনকে শুদ্ধ, শান্ত, পবিত্র, করে' গৃহবাসিনী কুলবধূর পর্য্যায়ে আনা যায় না। এই গোপনতার—এই হীনতার, এই চক্রান্তের আশ্রয় নিতেই হবে তাঁদের! ধিক্! মনটা যেন কেমন করুণ, কলঙ্কিত হয়ে উঠছে। আজন্ম সতীত্বের নিষ্ঠায় ওতঃ-প্রোতঃ আচ্ছন্ন তাঁর মানসলোক; কিন্তু আজ এই মনের গ্লানি তাঁকে নর-হত্যাকারিণীর পর্য্যায়ে নামিয়ে দিতে চায়। উঃ! ছেলেটাকে ফেলে দিতে হবে! জীবন্তই ফেলে দিতে হবে? তারপর সে মরে যাবে—কাশীশ্বর মহাকাল দেখাবেন—তার মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে অবন্তীর মা! উঃ! উঃ!

কিন্তু সন্তান-স্নেহ আরো ভয়ঙ্কর বস্তু! অবন্তীর ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিকে তাকিয়ে মা নিজেকে প্রস্তুত করলেন—প্রস্তুত করলেন সমস্ত পাপ

মাথায় তুলে নেবার জন্য, কিন্তু তবু তাঁর প্রাণের অন্তঃস্থলে জাগতে লাগলো একটি সূক্ষ্ম প্রার্থনা—ত্রাণ করো পরিত্রাতা !

যথা নির্দ্দিষ্ট দিনে অবন্তীকে নিয়ে যাত্রা করতে হোল তাঁকে ! মেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণীতে বসে অবন্তী খবরের কাগজে চোখ ডুবিয়েছে। প্রশাধন-লালিত সুন্দর তার মুখের পানে তাকিয়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্ম্মের তরুণদল—অবন্তী নির্লিপ্ত বাহ্যিক, কিন্তু অন্তরের অহঙ্কার তার রূপকে আরো তীক্ষ্ণ, আরো উগ্র করে তুলছে। মাতৃত্ব সেই মুখের কোনো রেখায় ধরা যায় না—শুধু একটা গর্ব্বিত দৃষ্টির গোপন পুরে জেগে রয়েছে ভয়—এই রূপ, এই আকর্ষণ-শক্তি যদি ফুরিয়ে যায় তার ! যদি একবার গর্ভ ধারণের পরই সে নশ্বর সুন্দর কদলীবৃক্ষের মত শুষ্ক, পাণ্ডুর হয়ে যায় ! না-না, এরকম অঘটন ঘটতে দেবে না অবন্তী—কিছুতেই না !

ওপাশের বেঞ্চে বসে ওর মা ভাবছে, মানুষকে এমন অসহায় ভাবে পাপের পথে এগিয়ে চলতে হয় কেন ! কি এর কারণ, কার এই রহস্য ! কোন দেবতার এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ! নিজে তিনি নিষ্ঠাবতী পত্নী—পবিত্র বংশে তাঁর জন্ম, আজন্ম সতীত্বের ঔজ্জ্বল্যে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তটি তাঁর ঝলোমল, তবু তাঁকে আজ এই অসতীত্বের, এই অভিশাপের অংশ গ্রহণ করতে হচ্ছে ! কেন ! কী পাপে ! কোন জন্মের কি অপরাধে ?

মা নিজেকে একান্ত অসহায় মনে করতে লাগলেন ! সন্তান-স্নেহাতুরা জননী তিনি, তবু তাঁর মনে হতে লাগলো, কে সন্তান, কেইবা স্বামী ! একদিন তো সকলকে ছেড়েই এই বিরাট বিশ্বের অনির্দ্দিষ্ট অজানা অনন্ত পথে পাড়ি দিতে হবে,—সেদিন কোথায়, থাকবে অবন্তী,

কোথায় বা থাকবে স্বামী-পুত্র-সংসার! তাঁর আজন্মের সংস্কার, অর্জ্জিত পুণ্যের প্রভাব তাঁকে বারম্বার বলতে লাগলো—এ কাজে যোগ দেওয়া তাঁর উচিত হচ্ছে না। যে কর্ম্ম যে করেছে. তার ফল সেইই পাবে। অবন্তীই ভোগ করুক তার পাপের ফল, তিনি কেন সহযোগিতা করে দায়ীত্ব গ্রহণ করতে যাবেন?—তিনি নেমেই যাবেন!

কিন্তু গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে! প্লাটফর্ম্ম ছাড়িয়ে গাড়ী ততক্ষণ ষ্টেশনের বাইরে এসে পড়লো। মুখ তুলে মা চেয়ে দেখলেন—অবন্তী নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরিয়েছে—নরম 'লেডিস সিগারেট'! গন্ধটা মা'র নাকে লাগছে এসে! কী বিশ্রী! ধ্বংশ হয়ে গেল; বাংলার সংস্কৃতির সবটুকুই বিধ্বস্ত হয়ে গেল। বাঙ্গালীর জীবন আজ ভূমিকম্পে টলছে। জীবনের রুদ্রদেবতা বুঝিবা ধ্বংসের লীলায় মেতেছেন! সুদীর্ঘ শ্বাসটা চেপে চেপে মা উচ্চারণ করলেন—'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি!'

পাঞ্চভৌতিক এই দেহটার জন্য মানুষের প্রয়োজন কত কম, অথচ এই দেহের তোয়াজ করবার জন্যই-বা কত রকম ব্যবস্থা করেছে মানুষ! সে বৈজ্ঞানিক হয়ে আজ কত সুখ, কত সুবিধার অধিকারী। আজ অনায়াসে আকাশে সে উড়ে বেড়ায়, একদিনের পথ এক ঘণ্টায় চলে যায়,—আঙুলের একটু ছোঁয়ায় আলো জ্বেলে রাতকে দিনের মত করে তোলে; ঘরে বসে সে আজ শুনছে হাজার মাইল দূরের সঙ্গীত,—পড়ছে হাজার মনীষীর বাণী;—মানুষ আজ সত্যি স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করেছে মর্ত্ত্যে।

এত কিছু করছে, তথাপি, মানুষ দেবতা হলো না, মানুষই রয়ে গেল। তার বাহ্যিক আড়ম্বর যত বাড়ছে, অন্তরের প্রশারতা ততই কমে

যাচ্ছে। ঋষিযুগের যে মানুষ বনের বৃক্ষতলে বসে সারা বসুধাকে কুটুম্ব ভাবতে পারতেন, ভুবনত্রয়কে স্বদেশ ভাবতে পারতেন, এঁরা সারা পৃথিবী ঘুরে, সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করেও সেই ঔদার্য্য দেখাতে সক্ষম হচ্ছেন না। কেন? অন্তরের মানসপদ্ম এঁদের দিনে দিনে সঙ্কুচিত হয়ে গেল, তারই জন্য। এঁরা নিজেকে নিজের গণ্ডীতেই প্রতিষ্ঠিত রাখতে বদ্ধপরিকর—নিজেকে অন্যের প্রভু ভাবতেই সচেষ্ট, এবং স্বপ্রভুত্ব কায়েমী রাখবার জন্য সহস্র অত্যাচার করতেও প্রবৃত্ত। এই নীচতা, এই ক্ষুদ্রতা আধুনিক সভ্যতার দান—বিলাসী মানবের লীলাবিলাস।

আলোক নিশ্চুপে বসে ভাবছিল আপনার মনে। চাকরীর দরকার একটা। যে-কোন রকমের যে-কোন একটা চাকরী—হোক তা যত কম মাইনের—আলোক তাই পেলেই বর্ত্তে যায়। কিন্তু কম-সে-কম একশটা যায়গায় ঘুরেও কিছু হোল না। চাকরী যেখানে খালি আছে সেখানেও জাতিবিচার, সম্প্রদায় বিচার—তারপর গুণবিচার। প্রার্থীর প্রয়োজনের বিচার কেউ করেনা! সবার বড় তাদের কাছে কর্ত্তা-বিচার অর্থাৎ মুরুব্বির জোর। মুরুব্বি কেউ নেই আলোকের—কাজেই চাকরীর আশা তাকে ত্যাগ করতে হলো। কিন্তু করবে কি? পকেটের অবস্থা পাঁচ সিকায় এসে ঠেকেছে। যে-কোনো একটা হোটেলে ঢুকে একবেলা ভাত খেলেই পকেটখানি শূন্য হয়ে যাবে। আগামী কাল অনাহারে থাকতে হবে আলোককে!

কিন্তু ভীষণ-খিদে পেয়েছে ওর! কিছু না খেলেও ওর আর চলে না। আলোক উঠে একটা দোকানে গিয়ে দু আনার চিড়েগুড় কিনলো। পাখীর আহারের মত ছোট্ট একটু ঠোঙ্গায় দোকানী দিল চিড়েগুলি। জলে ভিজিয়ে বসে বসে বেশকরে চিবিয়ে খেল আলোক। ওর মনে হচ্ছে,—জেলে সে ভালই ছিল। খাবারের জন্য কোন ভাবনা অন্তত

করতে হোত না। খাবারের ভাবনা যে কত বড় ভাবনা, তা যেন আজ ভাল করে অনুভব করছে আলোক। কিন্তু ভাবলো,—ওর তো তবু এখনো পকেটে আঠারো আনা আছে! যাদের কিছুই নাই, অথচ—পত্নী-পুত্র-কন্যা হাঁ করে চেয়ে আছে মুখের পানে, তাদের অসহায়তা কতখানি ভীষণ! উঃ! আলোক শিউরে উঠলো কল্পনাতীত তাদের সেই দুরবস্থা ভেবে। অথচ বেশ জানা আছে—এই বিরাট দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের অবস্থা অমনি। পকেটে কিছুই তাদের নেই। কিন্তু খাবার লোকে বাড়ীভর্ত্তি! ওদের কী অবস্থা! কী দুরবস্থা! ওরা খাবারের যোগাড় করবে—নাকি স্বদেশের মঙ্গলের চিন্তা করবে! পেটে খিদে থাকতে কেউ কি কোনো রকম সৎ কাজ করতে পারে—নাকি সুবুদ্ধি মাথায় আসে তার? অসৎ চিন্তা এবং অসৎ উপায় তাদের একমাত্র অবলম্বন হয়; এবং এদেরও হচ্ছে।

আলোকের মনে পড়ে গেল,—হিমালয়বাসী একজন যোগীকে জনৈক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'প্রভু, এই দেশের কল্যাণ কিসে হবে! কি করে স্বাধীন হবে দেশ?' উত্তরে যোগীবর বলেছিলেন—'মাত্র দুটি জিনিষ রক্ষা করলেই এ দেশের পূর্ব্ব অবস্থা আবার ফিরে আসবে। সে দুটি জিনিষ আর কিছু নয়—'বীর্য্য রক্ষা, আর সত্য রক্ষা!'

হায়রে কপাল! বীর্য্য রক্ষা করবার কি যো আছে এদেশে! অন্নাভাবে বীর্য্য তো শুকিয়েই গেল, যেটুকু আছে, তাকে পশ্চিমী সভ্যতার হাজার প্রলোভনে ফেলে নষ্ট করা হচ্ছে। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেকের মানসিক বিকৃত হচ্ছে। শিক্ষায়, সংস্কারে, আর সমাজহীনতায় মানুষগুলোকে জন্তুর পর্য্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হোল। আহার, নিদ্রা, মৈথুন ছাড়া আর কিছু ভাববার পর্য্যন্ত ক্ষমতা তাদের লোপ পেয়ে যাচ্ছে! মানুষকে বহির্মুখী করে তার মনের অন্তর্মুখীন সূক্ষ্ম শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। খাদ্যে, পানীয়ে, অসনে, বসনে,

আচারে, ব্যবহারে তাকে ভোগপ্রবণতায় নারকীয় গর্ত্তেই ফেলে দেওয়া হচ্ছে—বীর্য্য রক্ষা হবে কিসে!

জীবনকে যাঁরা রুদ্রের আশ্রিত বলে চিনেছিলেন, এই ভারতের সেই ঋষি-বংশধরগণ আজ পশ্চিমী সভ্যতার ভোগকুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অথচ ভোগের উপাদানও ওরা পেল না, শুধু তীব্র, তীক্ষ্ম আকাঙ্খাটা ওদের জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। রুদ্রদেবতার মত শ্মশানচারী হয়ে ওরা স্ববীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হতে আর কীভাবে পারবেন! বীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত না হলে তো সবই বৃথা যাবে! বীরপূজার আজ যে একটা আন্দোলন এসেছে দেশে—নেতাজী সুভাষের পুণ্যময় জীবনের আদর্শে যে বীরপূজার আয়োজন চলছে, তাও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে দুদিনেই। রুদ্রদেবতার এই সামান্য জটা আলোড়নের জাগর-মুহূর্ত্তটিতেই ক্ষুধা-রাক্ষসী লেলিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবেন ওঁরা। আর, সত্যরক্ষা! সে তো অনেক দূরের কথা—আজ পলিটিক্সের প্যাঁচে প্যাঁচে কেবল মিথ্যাচার—মিথ্যা ছাড়া তুমি কিছুতেই বড় হতে পারবে না। এমনি মজার এই পাশ্চাত্য পলিটিক্স। যে-দেশে রাজনৈতিক জীবনের সুস্থতা বজায় রাখবার জন্য সত্যাচারী সম্রাট শ্রীরামচন্দ্র প্রাণাধিকা পত্নীকে নির্ব্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, সেই দেশেরই সন্তানগণ রাজনৈতিক জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান আজ মিথ্যাচারের কদর্য্যতায়। অনধিকারীর আয়ত্তে শক্তি রক্ষিত হলে রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক জীবন বিশৃঙ্খল হওয়া অবশ্যম্ভাবী জেনে শ্রীরামচন্দ্র শূদ্রককে হত্যা করতেও দ্বিধা করেন নি; আজ সেই দেশেই অনধিকারীর দলই নেতৃত্ব-নৈতিক ভাগ্যবিধাতা—শক্তির অধিকারী এবং বিশৃঙ্খলতার জনক! কিন্তু নিরাশার এই অন্ধকারেও মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে আলোকমালা—রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ—গান্ধী, জহরলাল, সুভাষ দেখা দেন। কেন? কেন এঁরা আসেন? এঁদের প্রয়োজন কি আজো আছে নাকি ভারতে? রাজনৈতিক স্বাধীনতা কি

সত্যি কোনদিন অর্জ্জিত হবে, তাই এই আলোকবর্ত্তিকা দেখিয়ে নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করে রাখা হয়? বিধাতার এসব কি ভবিষ্যৎ দয়ার প্রবোধবাণীর মতই সান্ত্বনাবাক্য? কিন্তু কৈ? সুদীর্ঘ দিন, রাত্রি, মাস, বৎসর কেটে গেল, স্বাধীনতা এখনো বহু বহু দূরে। আজকার রাজনৈতিক গগনের বিদ্যুৎঝিলিক দেখে যাঁরা দিবালোকের কল্পনা করছেন, তাঁরা মোহগ্রস্থ। এই আলোক, দিবালোক তো নয়ই, অধিকতর দুর্য্যোগ সৃষ্টির জন্য স্বেচ্ছায় ডেকে আনা বজ্রালোক।

আলোকের আশাবাদী মনটা অকস্মাৎ আর্ত্তনাদ করে উঠলো নিরাশায়। কিন্তু আবার মনে পড়লো—'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবেনা দিন?' এই যে দুর্যোগময়ী দীর্ঘ রাত্রি—এই রাত্রি কি ফুরাবে না? প্রভাত কি আসবে না তার আলোঝলমল দীপ্তি নিয়ে? স্বাধীনতার প্রসারিত সূর্য্যালোকে আবার কি হাসবে না মাতৃভূমির শ্যামল দুর্ব্বাদল? মহাকবির আপ্তবাক্য কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? না—না; ঋষিবাক্য কখনো ব্যর্থ হয় না। রাত্রির দীর্ঘ তপস্যার পর দিবসের রৌদ্রালোক আসবেই আসবে। আজ তার জন্য চাই আমাদের প্রস্তুতি! এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তটিতেই গাত্রোত্থান করে সন্ধ্যাবন্দনার আয়োজন করতে হবে প্রভাত সূর্য্যের অভ্যর্থনার জন্য। নিস্তেজ দেহ-মনকে আবার জাড্যমুক্ত করে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলতে হবে সম্মুখের উদয়-সূর্য্যের ঐ আশালোকের পানে!

আলোক নিজেই উঠে পড়লো—হয়তো মানসিক উত্তেজনায়; হয়তো মনের ভুলে! কিন্তু যাবে কোথায়? কিছুক্ষণের জন্য পেটে কিছু খাবার পড়েছে, তাই শরীরটা হয়তো সবল হয়েছে একটু; হাঁটতে পারবে, কিন্তু রাস্তায় শুধু শুধু ঘুরে বেড়ানোতে লাভ কি? তথাপি আলোক ভাবতে ভাবতে এগিয়ে পড়ল। এলো সেই মেয়েটির কাছে; ন্যাকড়ার ফালিতে বাচ্চাটা ঘুমুচ্ছে, আর অনেকখানি ঘোমটা টেনে মেয়েটি বসে আছে ডান হাতখানা প্রসার করে! যেন মা কালী বরমুদ্রা দেখাচ্ছেন। না—না,

ওটা ভিক্ষামুদ্রা! ঐ মুদ্রা একদিন বরমুদ্রাই ছিল, কিন্তু সেদিন ছিল ভারতের গৌরবের সূর্য্যযুগ। আজ সেই বরমুদ্রা কৃপাপ্রার্থী ভিক্ষা-মুদ্রায় পরিণত হয়েছে; যে দাতা ছিল, সেই প্রার্থী হয়েছে, যে দেবী ছিল সে আজ দাসী! যে নারীর দাক্ষিণ্যে পরিপুষ্ট হয়ে ধর্ম্ম-জীবন, সমাজ-জীবন, পরিবার-জীবন ধন্য হয়ে যেত—সেই নারী-জীবনই আজ পথের মিছিলে নেমেছে, দিকভ্রান্তির দীর্ঘ আবর্ত্তে ঘূর্ণায়মানা হয়ে পড়ছে। সে স্বস্থ নেই এবং সুস্থও নাই। এই ভাঙনের গতিবেগ যে বিপর্য্যয় এনে দিল সর্ব্বসহিষ্ণু ভারতের অক্ষয় জীবনে, তাকে আবার স্ব-স্বভাবে ফিরিয়ে আনবার উপায় কিছু আছে কি!

বাচ্চাটা কেঁদে উঠলো। পাঁচ সাত আনা পয়সা এর মধ্যে পড়েছে সেই ছেঁড়া ন্যাকড়াটার উপর। মেয়েটি সেগুলো না তুলেই ছেলেটাকে কোলে নিল। ওর শুকনো মাই দুটির একটার বোঁটাটা দিল তার মুখে গুঁজে। আলোক আশ্চর্য্য হয়ে দেখছে,—কী সুন্দর মাতৃত্বময় চাহনি ওর! ও যেন সত্যিই ঐ ছেলেটির মা। হয়তো ঐ স্নেহের আধিক্যে, ঐ অপরূপ মাতৃত্বের আগুনে ওর সর্ব্বাঙ্গের রক্ত গলে গলে স্তন্য হয়ে ঝরবে ছেলেটার মুখে! মা—এই-ই মা! বিশ্বমাতার মাতৃরূপ!

মা—শব্দটা আলোকের অন্তরের আকাশে যেন সহস্র চাঁদের মত কিরণ বিস্তার করে দিল মুহূর্ত্তের জন্য! মা শুধু সন্তানের জন্মদাত্রী নন, তিনি সন্তানের ধাত্রী এবং পালয়েত্রী; তিনি শুধু ধারণ-ই করেন না, পোষণও করেন। জগজ্জননীর অংশভূতা তিনি; তিনি শুধু নারী নন, তিনি ঈশ্বরী। তাই ঋষি বলেছেন:

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা':

সর্ব্বভূতে তাই মাতৃরূপ দেখেছিলেন অর্য্যঋষি—বারম্বার নমস্কার নিবেদন করেছিলেন তাই বিশ্বের সেই মাতৃরূপকে। সর্ব্বভূতে তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তিরূপে জগজ্জননীকে দেখেই তাঁরা স্তুতি করেছিলেন,—কিন্তু

ভারতের সেই সনাতন, শাশ্বত মাতৃত্ব আজ নেমে এসেছে কোথায়? আলোকের চিন্তাশীলতায় কে যেন ঘা দিল লৌহ মুগ্দরের! যে দেশের পথের ভিখারীও গৃহস্থ-বাড়ীতে গিয়ে মাতৃ সম্বোধনে ভিক্ষার দাবী জানাতো—যে দেশের নারীকে মাতৃ সম্বোধন করা ঈশ্বরকে ভজনা করার অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হোত—যে দেশের শাস্ত্রকার মাতাকে বিশ্ব-জননীর সমান আসনে উন্নীত করে সগৌরবে জানিয়ে গেছেন—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'—আজ সেই দেশের ভবিষ্যৎ জননীগণ জননীত্বে দেউলিয়া হোল! পাশ্চাত্যের পার্থিব ভোগপ্রবণতা কেড়ে নিল ওদের সর্ব্বস্ব, ওদের মাতৃত্বের অহঙ্কার, ওদের পত্নীত্বের গৌরব, ওদের কর্ত্রীত্বের দাবী! অথচ ঐ পাশ্চাত্য সভ্যতাই বলে, নারীকে তারা নাকি স্বাধীকারে প্রতিষ্ঠিত করছে। আশ্চর্য্য বিড়ম্বনা! কোথায় তাদের স্বাধীকার! জীবন পথের জঞ্জাল ঘেঁটে ঘেঁটে কয়েকটুকরো রুটির যোগাড় করে 'ইকনমিক ইন্‌ডিপেনডেন্স' লাভই কি নারীর স্বাধীকারলাভ? গৃহ ছেড়ে, পত্নীত্ব হারিয়ে, মাতৃত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে জীবনকে উপার্জনক্ষম করতে পারলেই কি ওদের পরমার্থ লাভ হবে?

ওরা তাই করছে আজ। ওদের সব অন্তর্মুখ সৎ প্রবৃত্তিগুলি বহির্মুখ হয়ে গেল, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, বিলীন হয়ে গেল অনন্তে। তথাপি আজকার মানুষ ওই সভ্যতাকেই আশ্রয় করেছে, অবলম্বন করেছে। ওরাই আবার তারস্বরে ঘোষণা করে—'নারীকে পরাধীন রেখেই নাকি ভারতের এই দুর্দ্দশা'—আলোকের হাসি পেয়ে গেল! ভারতের দুর্দ্দশার কতই না কারণ আবিষ্কৃত হয়েছে! কেউ বলেন, ভারতের দুর্দ্দশার করণ, নারীর পরাধীনতা; আবার কেউ বলেন, অস্পৃশ্যতা, আবার কেউ কেউ বলেন নাকি ধর্ম্মের গোড়ামীই ভারতের পরাধীনতার একমাত্র কারণ। কিন্তু এ সব গবেষণা করে লাভ কিছু নাই। ভারত আজ পরাধীন, এইটাই প্রত্যক্ষ সত্য, এবং সে পরাধীনতা শুধু রাষ্ট্রগত নয়, সমাজগত,

সমষ্টিগত—ব্যষ্টিগত, চিন্তাগত এবং চেষ্টাগতও। চিন্তার স্বাধীনতাও আমরা হারিয়েছি তাই চেষ্টার স্বাধীনতাও আমাদের নেই! এক একটা ধুয়া ধরে চলার মধ্যেই আজ স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা আবর্ত্তিত হচ্ছে।

মেয়েটা পয়সাগুলো এবং ছেলেটাকে নিয়ে উঠলো। আলোককে ও চিনতে পারেনি! আলোক পিছনে চলতে লাগলো ; দেখবে, মেয়েটা কোথায় যায়!

সিধুর কথায় সবাই ওরা হাসলো দেখে সিধুর মনে আকস্মিক আশা জেগে উঠলো—এরা তাকে ছেড়ে দিতেও পারে। শালগ্রামের নুড়িটি ভাঙা টেবিলটার উপর পড়ে রয়েছে, সিধু কম্পিত হস্তে ডান হাতের একটি আঙ্গুল বাড়িয়ে স্পর্শ করলো সেটি। জীবনে যা করে নাই, আজ প্রাণভয়ে সিধু তাই করলো ; প্রার্থনা করলো,—হে দেবতা, ত্রাণ করো। মনে মনে মানস করলো সিধু, এখান থেকে বেঁচে যদি সে যেতে পারে, তবে আগামী প্রভাত থেকে নিশ্চয় ঐ শিলার যথাবিধি পূজা করবে।

শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন, জগতে চার রকম ব্যক্তিরা তাঁর পূজা করেন—'আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ'—সিধু এখন আর্ত্ত, প্রাণ ভয়ে ভীত—জীবনের রক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ অসহায়। কিন্তু তার পিতৃপুরুষের সংস্কৃত রক্ত তার শিরায় শিরায় আজ ধ্বনিত হয়ে উঠলো, 'সঙ্কটে মধুসূদন'! রক্ষা করো প্রভু! জীবনে কোন দিন তোমায় ডাকিনি, আজ সর্ব্বশেষ দিনের এই মহামুহূর্ত্তে তোমায় শেষ ডাক ডেকে নিই ; জানিনা, কাল আবার তোমায় ডাকবার সৌভাগ্য আমার হবে কি না।

কিন্তু যারা ওর কথা শুনে হেসেছিল, তারা অত সহজে ছাড়বার পাত্র

নয়। সিধুকে কাপড় পরে তৈরী হতে বলে তারা গোপন ভাষায় কি পরামর্শ করলো নিজেদের মধ্যে। ব্যাপারটা যে অত্যন্ত গুরুতর এবং বিপজ্জনক, তা যেন সিধু বুঝতে পারছিল। ভয়ে, ভাবনায় মুখ ওর শুকিয়ে উঠলো। চিরদিনের ডানপিটে ছেলে সিধু—কিন্তু তার ডানপিটেমীর সমস্ত স্পর্দ্ধা গ্রামের কয়েকটা নিরীহ মানুষের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল! কাশীর মত বিরাট সহরের বিশালকায় গুণ্ডাদলের মধ্যে পড়ে সিধু যেন আজ হতচেতন—হতাশ্বাস। দুহাত দিয়ে সে শালগ্রাম শিলাটি তুলে মাথায় রাখলো—যদি এই মুহূর্ত্তেই সে মরে যায় তো তার পিতৃ-পুরুষের এই পবিত্র বিগ্রহের স্পর্শ-সংযুক্ত হয়েই মরবে। এ জীবনে অনেক অসৎ কাজ সে করেছে, অনেক মানুষের প্রাণে ব্যথা দিয়েছে, অনেকের অনেক সর্ব্বনাশ সাধনও করেছে। আজ এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সেই সব কর্ম্মের স্মৃতি ওকে যেন আগুনে গালিয়ে নতুন রূপে ঢালছে। বুকের ভেতর কি যেন এক রকম করতে লাগলো ওর—ভয়ে নয়, ভয়ত্রাতার অভয়বাণীতে। আজন্ম নাস্তিক, অবিশ্বাসী সিদ্ধেশ্বরের অন্তরাত্মা যেন একটা আশ্চর্য্য আশ্রয় লাভ করছে, যে আশ্রয় জীবন এবং মৃত্যুকে জয় করে তাকে অমৃতে নিয়ে যেতে সমর্থ। যে আশ্রয়ে আশ্রিত হলে জীব মৃত্যুকে ঠিক জীবন লাভের মতই আনন্দময় ভাবতে পারে। সিধুর মনে হোল—ভগবানকে সে এভাবে তো কখনো ডাকে নাই—এরকম চিন্তাও কখনো করতে পারে নাই; তবু ওর মানসলোকে এ কার বাণী, কিসের চিন্তার তরঙ্গ—কোন্ আধ্যাত্মিক অনুভূতির আস্বাদ? লেখাপড়া প্রায় কিছুই সে জানে না, তাই বুঝতে পারলো না—তার দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে এক ত্যাগী-তপস্বী বংশের বীজ লুকিয়ে আছে—যাকে বলে সংস্কার, যাকে বলে cult, যে পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত অনুভূতি-প্রবণতা প্রত্যেক ভারত বাসীর অন্তরে আজো রয়েছে সুপ্ত হয়ে—যে সৎ বস্তুকে শক-হূণ্-তাতার-মোগল থেকে আজকার শ্বেতদ্বীপবাসী পর্য্যন্ত ধ্বংশ

করবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেছে এবং এখনো করছে কিন্তু সক্ষম হয় নি। এর নাম ধর্ম্ম,—যা ধারণ করে থাকে জীবনকে—এবং মৃত্যুকেও। সিধুর অন্তরে আজ সেই বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে নাকি! বীজের নিয়ম—অঙ্কুরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার বাইরের আবরণ পচে গলে যায়—সিধুরও বাহ্যিক আবরণটা যেন গলে যাচ্ছে—দেহখানার উপর ওর যেন কিছুমাত্র মমতা জাগছে না আর! যায় যাক এই তুচ্ছ দেহটা! ভয়ের কী এমন আছে আর কেই বা আছে সিধুর যার জন্য মমতা জাগবে? যে কাজই ওরা করতে বলুক, সিধু করবে। কিন্তু কাজটা যদি খুব কদর্য্য হয়? সিধু নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করলো। অন্তরাত্মা বলে উঠলো—'এই জীবনে বিস্তর অন্যায় কাজ তুমি করেছ সিদ্ধেশ্বর, আর নয়। মৃত্যুর ভয়েও আর অন্যায়ের পথে এগিও না। তবে যদি কাজটা ভাল হয়—এই দেহের বিনিময়েও সে কাজ করে ভগবানের প্রসাদ অর্জ্জন করো।' কাজটা কি—শুনবার জন্য সিধু প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

পরামর্শ শেষ করে ওরা বলল—তাহলে তুমি তৈরী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—তৈরী! মরতে আর আমি ভয় করি না; তবে আমার একটি নিবেদন আছে। কোনো নীচ কাজে আমাকে পাঠাবেন না স্যর্।

—নীচ কাজ! নীচ কাজ কি হে? সুমহান কাজ আমাদের। মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য, দেশ মাতার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য আমাদের অভিযান।

সিধু ঠিক ঠিক বুঝতে পারছিল না অত শক্ত সাধু বাংলা, বলল—আজ্ঞে কাজটা অধর্ম্মের না হলেই হোল। অধর্ম্মের কাজ আমি অনেক

করেছি। কত লোকের যে কত সর্ব্বনাশ করেছি তার হিসাব নাই। কিন্তু আজ এই মরবার দিনে অন্ততঃ একটা ভাল কাজ করে যেতে চাই।

—এর থেকে ভাল কাজ আর কিছু নাই! জানো, বারশো বছর ভারতবর্ষ পরাধীন। পরের শাসনে আর শোষণে ভারতবর্ষের কী দুর্দ্দশা হয়েছে, দেখছো তো! আমরা চাই ভারতকে স্বাধীন করতে;—স্বরাজ্য স্থাপন করতে ভারতে—আমরা সৈনিক! তুমিও হবে সেই মহান যুদ্ধ-যাত্রার একজন সৈনিক—আমাদের ধর্ম্ম-যুদ্ধের সৈনিক, যে যুদ্ধে মাতৃ-ভূমির মুক্তি লাভ হবে!

সিধু এবার বুঝলো কথাগুলো। আনন্দে ওর অন্তর ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে। মরবার আগে সে একটা কাজের মত কাজ তাহলে করে যেতে পারবে। বুকখানা ওর প্রশস্ত হয়ে উঠলো।

—যে আজ্ঞে! আমি তৈরী। বলুন কি করতে হবে? মরতে আমি একটুও ভয় করি না—কোথায় যেতে হবে আমাদের যুদ্ধ করতে!

ওর গৌরব এবং গর্ব্বদীপ্ত মুখের পানে তাকিয়ে দলের সেই লোকটি বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল আধমিনিট, তারপর বলল,—লাল কেল্লা! চলো? 'কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে যা'

ওরা বেরিয়ে পড়লো সিধুর হাত ধরে। সিধুর অন্তরে অনেকদিন আগে শোনা একটা কোমল স্বর যেন বারম্বার বাজতে লাগলো—'লালকেল্লা—জাতীয় পতাকা'……কথাটা অবন্তীর মুখে শোনা। সিধু আজ সত্যই যাচ্ছে নাকি সেখানে! বাঃ!

উৎপলা সুস্থ হয়ে উঠলো সপ্তা দুইয়ের মধ্যে। কিন্তু এই কয়দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ক্রমাগত সে ভেবেছে। সকালেই এক সঙ্গে পাঁচখানা খবরের কাগজ ওর কাছে পৌঁছে,—যে কোনো একটা তুলে উৎপলা

মোটামুটি খবর গুলো সর্ব্বাগ্রে পড়ে নেয়, তারপর প্রত্যেকটি কাগজের সম্পাদকীয় এবং সাধারণ কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়তে চেষ্টা করে। বেশ দেখতে পাচ্ছে, প্রত্যেকটি কাগজের সুরে যেন বিস্তর তফাৎ! প্রায় প্রত্যেকেই বলেন—'নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র'—কিন্তু কাগজের লেখায় নিরপেক্ষতা দূরে থাক, সত্যকার জাতীয়তাবাদটাই ও খুঁজে পায় না। যেটা যখন পড়ে তখন তার মতটাই ঠিক বলে মনে হয়—আবার অন্য বিরুদ্ধ মতের কাগজখানা পড়লেই পূর্ব্বের কাগজের মতটা বাতিল হয়ে যায় ওর কাছে। তাহলে জাতীয়তাবাদ—যেটা সকলেরই এক-মাত্র আশ্রয়, সেই বস্তুটির অস্তিত্বটা রহিল কোথায়? সত্য নিশ্চয় এক রকমই হবে—পাঁচটা কাগজে পাঁচ রকম লিখলে সত্য বস্তু কোন্‌টি তা ধরা মুস্কিল! ওর দুর্ব্বল মস্তিষ্ক অনেক সময় ভাবে—হয়তো সে ঠিকমত বুঝতে পারছে না। জাতীয়তা আজ দেশের জীবনে জেগেছে এবং সেটা যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি সমষ্টিগত। খবরের কাগজে নিশ্চয় সেই সমষ্টির মতটাই প্রকাশিত হয়—হওয়াই তো উচিৎ। কিন্তু বহু সময় বিরুদ্ধ মতবাদ ওকে ভাবিয়ে তোলে। তখন নতুন করে ভাবে সে—যাঁরা কাগজের কলমে সম্পাদকীয় লেখেন, তাঁরা দেশের মহাশক্তিমান লেখক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। লেখার গুণে যে-কোনো বিষয়কে সত্যের রূপ দিতে তাঁরা সম্পূর্ণ সক্ষম—তাই প্রত্যেকটি কাগজ পড়বার সময় মনে হয়, ওঁর কথাটিই সত্য; ওর বড়ে সত্য আর নাই!

কিন্তু উৎপলার নিজের একটা চিন্তাশক্তি আছে। সে ভাবে; এতখানি যাঁদের লেখনীর শক্তি—তাঁরা প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই অসাধারণ চিন্তাশীল, এবং তাঁরা প্রত্যেকেই সুনিশ্চিত জাতীয়তাবাদী—এ বিষয়ে সংশয় পোষণ করা শুধু অন্যায় নয়,—পাপ। তথাপি তাঁদের মতের একত্ব হয় না কেন? কিম্বা মতবাদ তাঁদের সর্ব্বত্রই এক, শুধু প্রকাশভঙ্গীর বিভিন্নতার জন্য উৎপলা ঠিক ঠিক ধরতে পারে না? কোন্‌টা ঠিক, উৎপলা-

অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারলো না। কিন্তু ওর মনে অন্য একটা চিন্তাও এলো—এই যে উচ্চ চিন্তাশীল লেখকশ্রেণী,—রাজনৈতিক জীবনে এঁদের স্থান কোথায়? যাঁরা বাংলার এবং ভারতের রাজনৈতিক জীবনকে জীবনদান করেছেন, রাষ্ট্রচেতনাকে আজো যাঁরা সস্নেহে লালন করেছেন বীর্যবান সাহিত্যের স্তন্যদানে—বর্ত্তমান রাজনীতিতে তাঁরা কে কোথায় আছেন? এবং বর্ত্তমান রাজনীতিকগণই বা তাঁদের কতখানি খোঁজখবর রাখেন? উৎপলা অনেক ভেবেও কোনো সাহিত্যিকের সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগ আবিষ্কার করতে পারলো না। হয়তো ওর অজ্ঞানতা, কিম্বা সত্যই সাহিত্যিকগণ পরোক্ষেই রাজনীতিকে পোষণ এবং পালন করেন—মা যেমন সন্তানকে পালন করেন অন্তঃপুরের অন্তরালে। কিন্তু মা অন্তঃপুরে লালন করলেও সন্তান মাকে ভুলে থাকে না—সিদ্ধির সর্ব্বাগ্রে সে মা'র চরণতলে গিয়ে প্রণত হয়। তবে বর্ত্তমান কালের এই রাজনীতির মধ্যে সাহিত্যিকের সেই সম্মানের আসন নেই কেন? ভাবতে ভাবতে উৎপলার মনে হোল—হয়তো আজও এ দেশের সে অবস্থা আসেনি—হয়তো এখনো দেশবাসী সাহিত্যিককে দেশগঠনকারী সংস্কারক, জাতীয় জীবনের হৃদ্‌পিণ্ড রূপে বুঝতে শেখে নি—কিন্তু একদিন শিখবে। একদিন, যেদিন জাতীয় জীবন সত্যই সিদ্ধিলাভ করবে, সেইদিন বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্র-শরৎ থেকে আরম্ভ করে আজকার ক্ষুদ্রতম লেখকটি পর্য্যন্ত জাতির চোখে মহান মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু সেদিনের দেরী আছে!

দেরী যে আছে, তা বুঝতে বাকি থাকে না, যখন দেখা যায় অসাধারণ শক্তিশালী লেখকও কাগজের সুরটি ঠিক রাখবার জন্য নিজের মতের বিরুদ্ধে লিখতেও বাধ্য হন। লেখকের লিপি-স্বাধীনতা কোথায় যে তিনি লিখবেন? সত্যিকারের নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী পত্রিকার তাই এতই অভাব। —এ অভাব পূরণ করা যায় না!

টাকা রয়েছে উৎপলার! অকস্মাৎ মনে হোল—সেও একটা কাগজ বের করে ফেলবে নাকি? একটা কাজের মত কাজও করা হবে এবং দেশ-সেবার সঙ্গে কয়েকজন শক্তিশালী লেখককে সুযোগও দেওয়া হবে। উৎপলা অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো: কিন্তু দৈনিক কাগজ বের করা এক বিরাট ব্যাপার—বিস্তর ঝামেলা এবং বিলক্ষণ অভিজ্ঞতার মধ্যে তাকে চালাতে হয়। বিকাশের কিছু অভিজ্ঞতা আছে এ বিষয়ে, কিন্তু বিকাশ তো এখন নিতান্ত পর হয়ে গেছে। তাছাড়া উৎপলাও তার কোনো সাহায্য আর নিতে চায় না। তার থেকে বড়ো কারণ, বিকাশ নিজেই এখন একটা দলের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। তার দ্বারা চালানো কাগজ কখনো নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাহলে উৎপলা এখন করবে কি? ওর যৌবনের শক্তি এই ক'দিন বিছনায় বন্দী থেকে যেন দ্বিগুণ জোরালো হয়ে উঠেছে। কিছু একটা কাজ তাকে করতেই হবে—কিন্তু কি কাজ!

—যা—পার্কে একটু বেড়িয়ে আয়!—ওর মা এসে বললো।

উৎপলাও যেন প্রস্তুতই ছিল—একটা কাজ পেয়ে বর্ত্তে গেল! বলল,

—হ্যাঁ—যাই—বলেই উঠলো সে। অসুখের পর আজই প্রথম বাইরে বেরুচ্ছে, তাই মা বললো—ঝি-টাকে সঙ্গে নিয়ে যা—কেমন?

—না, কিছু দরকার নেই!—বলেই উৎপলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে-লাগলো! মনে পড়ে গেল—এই অসুখের পূর্ব্বে বাইরে বেরুতে হলে অন্ততঃ পূরো একটি ঘণ্টা তার সাজ পোষাকে সময় লাগতো। আজ লাগলো এক মিনিট—চটি দুটো পায়ে দিতে যা দেরী। নিজেকে সাজিয়ে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করার জন্য কতই না চেষ্টা করেছে সেদিন উৎপলা! আজ আর যেন কিছুরই প্রয়োজন নেই। আশ্চর্য্য! ওর মনটা এই তরুণ বয়সেই এতখানি বৈরাগ্যে আশ্রিত হয়ে গেল নাকি? সত্যিই এটা বৈরাগ্য, নাকি শ্মশান-বৈরাগ্য!

ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে উৎপলা পথে পড়লো। সুপরিচিত পথ আজ যেন একান্ত অপরিচিত বোধ হচ্ছে। বেশ লাগছে! অসংখ্য মানুষের ভিড় ঠেলে ধীরে ধীরে ও চলতে লাগলো যেন কিছুর সন্ধানে, কোনো বস্তুর প্রত্যাশায়।

সেই উৎপলাই কি আজ রাজপথে হাঁটছে যার চলার ভঙ্গিমা দেখবার জন্য হাজার তরুণ ফিরে ফিরে তাকাতো, প্রৌঢ়রা আফ্‌শোষ করতো, বৃদ্ধরা অকারণে পথ বাৎলে দিতে চাইতো, সে কি সেই উৎপলা? কৈ? কেউ তো বিশেষ তাকাচ্ছে না ওর পানে! যারা তাকাচ্ছে, তাদেরও দৃষ্টির মধ্যে কামনার বিশেষ উগ্রতা নেই যেন—যেমন পোলাও-কালিয়া-খাওয়া মানুষ ভরা পেটে ডালভাতের পানে তাকায়, এদের চাউনি ঠিক তেমনি। বাংলা দেশ কি বৈরাগ্য নিল নাকি এই ক'দিনের মধ্যে? না, না, বাংলাদেশ বৈরাগ্য নেয়নি, উৎপলা নিজেই আজ বৈরাগিনী সেজেছে—সাজতে বাধ্য হয়েছে। ওর রূপযৌবন ওকে রিক্ত করে রেখে গেছে একটা চামড়া-ঢাকা কঙ্কাল, যার পানে কৃপাদৃষ্টিপাত ছাড়া মানুষের আর কিছু করবার নেই। নিজেকে এতটা কৃপাদৃষ্টি ভাজন করতে কিন্তু কুণ্ঠিত হচ্ছে ওর তরুণ মন। মনের যৌবন ঠিকই আছে তাহলে! মন তো বুড়িয়ে যায়নি! উৎপলা ভাবতে লাগলো—ভাল সাজ-সজ্জা করে বেরুলে সে এই অবস্থাতেই বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো।—তার মন এখনও সতেজ, যৌবনের দীপ্তিতে প্রখর, দেহকেও সে আবার তৈরী করে নিতে পারবে পূর্ব্বের মতই, কিন্তু ঐ দৃষ্টির প্রসাদ যেন আজ ওর চোখে ঘৃণিত বস্তু হয়ে উঠলো! সাজগোজ করে নিজকে পণ্য-নারীতে পরিণত না করে আজ সে ভালই করেছে। ঐ দেহলোভী ভিক্ষুকদের কাছে একটু দৃষ্টির প্রসাদ আদায় করার জন্য কেন মেয়েদের এতখানি কাঙালপনা? কেন? কী এসে যায় ওটুকু না পেলে!

কিন্তু রাস্তায় চেয়ে দেখলো উৎপলা, বহু কিশোরী, তরুণী, যুবতী

চলেছে—প্রত্যেকের সজ্জিত রূপ চেয়ে দেখবার মতো—অথচ উৎপলা জানে, —সত্যিকার রূপসুষমা তাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে পনর আনা মেয়ের নাই। সে নিজে মেয়ে, তাই মেয়েদের অ-সৌন্দর্য্যের দিকটা তার ভাল জানা আছে। সেগুলোকে কেমন করে সামলে রাস্তায় চলতে হয়, কোন্ কৌশলে পুরুষের চোখে ধূলো দিয়ে নিজেকে অপরূপ রূপসী প্রমাণ করা যায়—তার সব বিজ্ঞানটুকুই উৎপলার আয়ত্তিভূত, কিন্তু আজ যেন সেই বিজ্ঞান উৎপলার কাছে নিষ্প্রয়োজন? কে বললো নিষ্প্রয়োজন? হয়তো আবার যেতে হবে তাকে তেমনি করে শিকার সন্ধানে, তেমনি মায়ার ফাঁদ পেতে ধরতে হবে মানুষকে, শোষণ করতে হবে তার সর্ব্বস্ব! কিন্তু না!—উৎপলার ঘেন্না ধরে গেছে! জীবনকে সে এই বয়সেই বেশ করে দেখে নিল;—দেখে নিল, মানুষ যতই সভ্যতার বড়াই করুক, সত্যকার মানবত্বে সে পশু থেকে তিলমাত্র এগোয়নি! শুধু তফাৎ, পশুরা আহার-নিদ্রা-মৈথুন যা কিছু করে প্রাকৃতিক ভাবে, সহজভাবেই তারা করে; আর মানুষ সেগুলোকে বুদ্ধিবলে আরো বিলাসের এবং ব্যসনের ব্যাপার করে তুলেছে! তার আহারের পারিপাট্যের জন্য, নিদ্রার সুকোমলতা বিধানের জন্য এবং আনন্দের আনুসঙ্গীকতার জন্য কত কত প্রাণ বলি হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই! মানুষের জীবন থেকে পশুজীবন খারাপ কোন্‌খানটায়, উৎপলা যেন বুঝতে পারছে না!—হ্যাঁ, মানুষের মধ্যে মানবত্ব বলে একটা পদার্থ আছে —দয়া-মায়া-ক্ষমা, সত্য, অহিংসা ইত্যাদি কতকগুলো ধর্ম্মও আছে ঐ মানবত্বকে বিকশিত করবার জন্য। কিন্তু পশুদের যে ওগুলো নেই তা কে বললো? পশুরা অবশ্য বড় বড় মন্দির, মসজিদ বা গির্জ্জা গড়ে ভগবানকে ডাকে না—কিন্তু ওদেরও ভগবান আছেন কি না, কে জানে! হয়তো আছে। পশুরাও মানুষের মতই ধর্ম্মাচারী আছে! খারাপ কিসে?

পার্কে এসে পড়লো উৎপলা। ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। বাবুরা

বেড়াচ্ছে—বন্ধুরা বসে গল্প করছে, তরুণরা তরুণীদের গায়ের গন্ধের আশায় ঘুরছে এবং ভিখারীরা ভিক্ষার আশায় ফিরছে। এর মধ্যে ফেরীওয়ালারা বেশ ব্যবসাও করে নিচ্ছে। বেশ জায়গা, যেন ঈশ্বরের মানব-শিল্প-প্রতিভার একটি ছোট্ট মডেল! বিশ্বের বিরাট নক্ষত্রলোকের কোথাও যদি বড় রকম একটা এক্‌জিবিশন হয় তাহলে এই পার্কটিকে সেখানে পৃথিবীর মানুষের মডেলরূপে পাঠালে ঠিক মানিয়ে যাবে!

উৎপলা নিজের চিন্তায় নিজেই হেসে উঠলো! সেও তো সেই মডেলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তাহলে? হ্যাঁ, যাবে। পৃথিবীর মনুষদের মধ্যে সেও তো একজন! সেখানের কোন দেবতা বা দানব যদি তাকে কিনে নিয়ে যায়,—যেমন উৎপলা কংগ্রেস একজিবিশন থেকে একটা তীরন্দাজ মূর্ত্তি কিনে এনেছিল—তাহলে উৎপলা সেখানে গিয়ে কি করবে? কি আর করবে! তীরন্দাজ পুতুলটা যেমন আলমারীতে আছে, তেমনি থেকে যাবে উৎপলা! কিন্তু উৎপলা তো পুতুল নয়! তার খিদে আছে, তৃষ্ণা আছে—অসুখ আছে, আনন্দ আছে, অবসাদও আছে;—উৎপলা তো চুপ করে থাকতে পারবে না। ক্রেতাকে সে বলতে বাধ্য হবে—আমায় খেতে দাও—শুতে দাও।

উৎপলা কিসব বাজে বাজে ভাবছে! অকারণ এই আজগুবী চিন্তায় লাভ কি ওর! কিন্তু মানুষ আজগুবী চিন্তাও করে। খুব বেশীই করে। যে-কোন মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে—তার চিন্তার অর্দ্ধেক সময়ই এক রকম বাজে চিন্তায় ব্যর্থ হয়ে যায়। ঠিক ব্যর্থ নয়, এরও হয়তো স্বার্থকতা আছে। এইরকম বাজে চিন্তা করতে করতে মানুষ হয়তো সত্য চিন্তায় অভ্যস্ত হয়—সত্যকে আশ্রয় করে, তখন সে সত্যকে লাভও করতে পারে! সত্য—অর্থাৎ যা অপরিবর্ত্তনীয়—যা কল্যাণকর, —যা অগ্রগতির পথে পাথেয়। জীবন-দর্শন সত্যের ভিত্তিতেই তাই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু পূর্ণ সত্য তো কারো

চোখে প্রায় পড়েই না। সবাই দেখে আংশিক সত্য। অংশও সত্য হতে পারে, কিন্তু পূর্ণ সত্য নয়। হাতী দেখতে গিয়ে শুধু তার কাণটা দেখে এসে যদি বলা যায় যে হাতী কুলোর মত, তাহলে—কুলোর মত কাণ হাতীর একটা অংশ হিসাবে সত্য নিশ্চয়ই—কিন্তু আংশিক সত্য! পূর্ণ সত্য যে দেখবে, সে গোটা হাতীটাই দেখবে। উৎপলার বর্ত্তমান দেহ-মনকে যে দেখবে, সে আংশিক সত্যই দেখবে! আগে যারা উৎপলাকে দেখেছে, তারাও আংশিকভাবেই দেখেছে—উৎপলা নিজেও নিজেকে মাত্র আংশিকভাবে দেখছে। পূর্ণ উৎপলা এখনো অপ্রকাশ—কে জানে, কবে প্রকাশ হবে!

—দুটি পয়সা দাও মা—ছেলেকে দুধ কিনে খাওয়াব।

উৎপলার দার্শনিক চিন্তা মুহূর্ত্তে ছুটে গেল! চেয়ে দেখলো একটা ভিখারিণী, কোলে কচি একটি শিশু—হাত পেতে মেয়েটি ভিক্ষা চাইছে। কিন্তু উৎপলা যে তার ভ্যানিটি ব্যাগটা আনেনি। পয়সা তো নেই তার কাছে। দাতব্য উৎপলা কদাচিৎ করেছে জীবনে। কখনো কেউ ভিক্ষা চাইলে মুখ ফিরিয়েই চলে গেছে, কিন্তু আজ যেন…

—দাও মা, ছেলেটা সারাদিন কিছু খায় নি।

—আহারে !!!—উৎপলার আর বেড়ান হোল না; উঠলো!

মেয়েটিকে বললো—এসো আমার সঙ্গে!—পার্ক পার হয়ে ফুটপাতে নামলো উৎপলা। বিশেষ কিছু পাবার প্রত্যাশায় ভিখারিণী সানন্দে ওর পেছনে হাঁটছে। উৎপলা একবার ফিরে তাকিয়ে দেখে নিল,—কোলের ছেলেটা বেশ ফরসা! ব্যাটা ছেলে বোধ হয়—প্রশ্ন করলো:
—মেয়ে, না ছেলে তোমার?

—ছেলে!—একমাসও এখনো হয়নি মা—বড্ড কচি!

উৎপলা আর কিছু শুধুলো না, নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলো। কিন্তু ভাবছে, পথের ভিখারিণী, সেও তার ছেলেকে মানুষ করবে; বনের বাঘ,

সেও ছেলেকে আহার যোগায়—আর মানুষ,—সভ্য, শিক্ষিত, সমাজগত মানুষ অনায়াসে তার ছেলেকে ডাষ্টবীনে ফেলে দিয়ে আসে!—মানুষ নাকি সুসভ্য! কিন্তু সবাই তো আর ফেলে দেয় না—জীবনে যাদের বিড়ম্বনা জেগেছে, সেই হতভাগীরাই ফেলে দেয়; নইলে সন্তান যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ! শরীরের অভ্যন্তরের কোমলতম শয্যায় তাকে ধারণ করা হয়, পোষণ করা হয় শরীরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওজঃধাতু দিয়ে,—অসহ্য দুঃখের মধ্যে তাকে আনা হয় পৃথিবীর আলোকে, বুকের রক্তে তাকে বড়ো করে তোলা হয়—সে কি ফেলবার জিনিষ! সন্তান আনন্দের সৃষ্টি, যেমন এই বিরাট বিশ্ব ঈশ্বরের আনন্দের সৃষ্টি! অসহ্য ব্যথার আনন্দের মধ্যে সে আসে—এসে ধন্য করে জননী-জীবন। নারী তাই নিজ জীবনকে মাতৃত্বে অলঙ্কৃত করবার জন্য ধীরে ধীরে কেমন বিকশিত হয়ে ওঠে নিতম্বের নিবিড়তায়,—বক্ষের প্রাণপদ্মে, ধারণকুণ্ডের শোণিতস্রাবে। বিশ্বজননীই যেন প্রতি নারীর মধ্যে সৃষ্টিশক্তিকে আবর্ত্তিত করছেন। নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাই সন্তান-সৃষ্টি। এর বড়ো সৃষ্টি তার নাই—তার দ্বারা করা সম্ভব নয়—এবং চেষ্টা করাও উচিৎ নয়!

কিন্তু আধুনিক সভ্যতা এ সত্য অগ্রাহ্য করছে! নারীকে পুরুষের মত পাঠ দিয়ে, পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়ে বর্ত্তমানের মানুষ সৃষ্টিশক্তির শ্রেষ্ঠতম যন্ত্রটিকে বিকল, বিকৃত করে দিচ্ছে—উৎপলাকেও দিয়েছে! হ্যাঁ, দিয়েছে! উৎপলা আজ মাতৃত্বের বিকৃত রূপ—বিশ্বমাতার অবমাননাকারিণী অ-মাতা! চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসছে উৎপলার!

বাড়ীর দরজায় এসে গেল উৎপলা। সিঁড়ি ভেঙে আবার নেমে ভিখারিণীকে পয়সা দিতে আসতে ওর খুবই কষ্ট হবে, তাই তাকেও সে উপরে আসতে বললো! নিজের ঘরে আসতেই ওর মা দেখলো ভিখারিণীকে।

—এই—কে তুই ! কি চাস ?—মা'র কণ্ঠস্বরটা অত্যন্ত উগ্র। কিন্তু উৎপলা বললো,

—অমি ডেকে এনেছি ; কিছু পয়সা দেব। আর আমার রাত্রির খাবার দুধ থেকে ওকে কিছু দাও—ছেলেটাকে খাওয়াক !—বলে উৎপলা পয়সার সন্ধান করছে। ওর মা আতঙ্কিত হয়ে উঠলো উৎপলার কাণ্ড দেখে। এমনি করে উৎপলা যত রাস্তার ভিখিরীকে ঘরে এনে দানছত্র খুলবে নাকি ? তাহলে তো ভীষণ মুস্কিল হবে! একটু রুক্ষ স্বরেই বললো উৎপলাকে,

—রাজ্যি শুদ্ধ ভিখারী-মেয়ে বসে থাকে ছেলে নিয়ে—কটাকে তুই দুধ দিতে পারিস্ উৎপলা ! দে—দুটো পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দে ! এই—যা !

মা নিজেই দুটো পয়সা দিতে যাচ্ছিল—তাড়াতাড়ি ওকে তাড়াবার জন্য চিন্তিত হয়ে উঠেছিল মা—কিন্তু উৎপলা নিঃশব্দে একটা টাকা আর একখানা ভাল তোয়ালে দিল ওকে,—বললো,—বসো, দুধ আনি !

নিজেই খানিকটা দুধ এনে দিল ! বললো—খাওয়াও এইখানে ! অতখানা দুধ অবশ্য খেতে পারলো না ছেলেটা—অবশিষ্টটুকু ভিখারিণীই খেয়ে নিল—তারপর আস্তে উঠে চলে গেল—'রাণীমা জয় হোক' বলতে বলতে ! মা এতক্ষণ চুপ করেই ছিল, কিছুটা ভয়ে, কিছুটা বা মেয়ের বর্ত্তমান শরীর মনের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে। এতক্ষণে বললো,

—এরকম তো তুই ছিলি নে পলা ! ওরা চোর-ডাকাত বজ্জাত মেয়ে—ওদের দিয়ে লাভ কি ?

—আছে লাভ ! উৎপলা দৃঢ়কণ্ঠে বললো,—ও হাজার লোকের কাছে ভিক্ষা চাইবে, দেবে হয়তো বিশ জন। তাতেই ওর চলে যায় মা, বাকি ন'শো আশি জন না দিলেও ওর কিছু এসে যায় না। কিন্তু যে দেবে—তার মানসিক একটা সদ্‌বৃত্তির—দয়া বৃত্তিটার অনুশীলন হবে। না দিলে

মানুষের সে বৃত্তিটা ভোঁতা হয়ে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়—মানুষ অমানুষ হয়! কাজেই দান করায় লাভ দাতারই বেশি! না দিলে ওর ক্ষতি হবে সামান্য—আমার ক্ষতি হবে ভয়ঙ্কর।

—কিন্তু ওরা বজ্জাত মেয়ে। ওদের দিলে কুঁড়েমীর প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

—থাক মা! তর্ক করে লাভ নেই। পৃথিবীতে ওরাই শুধু বজ্জাত আর কুঁড়ে নয়, আমরাও অনেক বেশি বজ্জাত আর কুঁড়ে। গভীর রাত্রে একা ঘরে নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখো—ওর থেকে তুমি-আমি অনেক বেশী বজ্জাৎ। কিন্তু যাক্—আমি ঠিক করেছি—এইসব সর্ব্বহারা সন্তানদের জন্য—এই সব বজ্জাৎ মেয়েদের পুত্রকন্যার জন্য একটা আশ্রম করবো—যেখানে আন-ওয়াণ্টেড্ এবং ইল্‌লেজিটিমেট চাইল্ড্ আশ্রয় পাবে; মানুষ হয়ে উঠবে!

—কী সব বাজে বক্‌ছিস উৎপলা! বিয়ে করতে হবে—সংসার করতে হবে তোকে!

—বিয়ে? সে হয়ে গেছে। আর সংসার তো তাদের নিয়েই করবো। তোমরা বাধা দিতে পারবে না; অনর্থক চেষ্টা কোরো না। আমি তোমাদের সঞ্চিত অর্থ কিছুই নেব না—টাকা আমি যোগাড় করে নেব অন্যভাবে।

—চাঁদা তুলে?

—হ্যাঁ—দরকার হয় চাঁদা তুলবো; চ্যারিটি শো করবো, চুরিও করতে পারি।

—চুরি!

—হ্যাঁ—চমকে উঠছো কেন? আমরা প্রত্যেকে এক একটি বড় রকমের চোর—ধরা পড়ি না, এই যা! আইনকে ফাঁকি দেবার কৌশল আমরা জানি; মানুষকেও ফাঁকি দিতে আমরা বিলক্ষণ পটু। নিজের

মনের গভীর অভ্যন্তরে খুঁজে দেখ—তুমি কতখানি চোর আর বজ্জাৎ তা টের পাবে। আইনকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করতে পারলে সেটা জাগতিক বিজ্ঞানে চুরি বলে গণ্য হয় না, হয় বুদ্ধি নামে প্রশংসিত! আমার চুরি হবে সেই বুদ্ধিবলের চুরি। ধরা পড়বো না, ভাবছো কেন?

মা চিন্তিত মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু উৎপলা আর কথা না বলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল! এবার রেডিওটা খুলে একটু গান শুনবে; কিন্তু মনে হোল, গান শুনবার বিলাসিতায় সে নিজেকে আর নামাবে না। মনকে সে এবার থেকে উর্দ্ধমুখিন্ করে রাখবে কখন সত্যের সূর্য্যালোক এসে পড়বে তার প্রাণপদ্মে—বিকশিত হয়ে যাবে শতদলে। উৎপলা ভাবলো—পদ্ম—বিকশিত হয়, তারপর আসে মধুকর, দিয়ে যায় পরাগরেণু—তারপর হয় পদ্মবীজ, তার থেকে আবার পদ্মলতা! এইই সৃষ্টির নিয়ম,—উৎপলা এই নিয়মসূত্রের কোন্‌খানটায় আছে? নেই! উৎপলা যেন খসে পড়েছে ঐ সৃষ্টি-সূত্র থেকে। ও মালায় উৎপলার ঠাঁই নেই! সৃষ্টির শক্তিকে সে বিকৃত করেছে, ধ্বংস করেছে নিজে হাতে। কিম্বা, কে জানে,—ধ্বংস কখনো হয় না সৃষ্টির বীজ। ধ্বংসটা আংশিক সত্য, পূর্ণ সত্য নয়! উৎপলা যাকে ধ্বংস করেছে বলে ভাবছে,—কে জানে সে এখনো সৃষ্টির বিচিত্র পথে পা বাড়িয়ে চলেছে কি না! এমন কি, ঐ ভিখারিণীর কোলের ছেলেটাই হয়তো সেই! —চমকে উঠলো উৎপলা! না—সে নয়! উৎপলা তাকে নিশ্চয়ই ধ্বংস করেছে নিজের হাতে। সে আর নেই। কিন্তু যদি থাকে—যদি ঐই সে হয়—তাহলে, তাহলে এবার সে তার জন্মদাত্রীর হাতের দেওয়া দুধ খেয়ে গেল—দেখে গেল জননীকে। ও নিশ্চয়ই সে, নইলে এত ভিখিরী আছে, কাউকে তো উৎপলা কখনো বাড়ীতে ডাকে নি! অস্থির হয়ে উৎপলা জানালায় দাঁড়ালো গিয়ে। কোথায় সে ভিখারিণী! কোন্ দিকে গেছে কে জানে! তাকে আর এই বিশ্বের জনসমুদ্রে খুঁজে মিলবে না।

কিন্তু কেন উৎপলা ভাল করে দেখলো না! কেন গলার সেই দাগটার সন্ধান নিল না!—উৎপলা অস্থির হয়ে উঠলো!

পিছনে পিছনে গোয়েন্দাগিরি করে আলোক সেদিন অপর্ণাকে ছেলে কোলে ঢুকতে দেখেছিল একটা চমৎকার জায়গায়। ভারতের সর্ব্ব-জাতির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকাণ্ড একখানা বাড়ী তৈরী হবার কথা—দেশের লোকের দান এবং দেশবাসীর সহানুভূতিতেই সে-বাড়ী তৈরী হবে, কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশে অত সহজে অত বিরাট কাজ হওয়া সম্ভব নয়—তাই বাড়ীখানা এক তালা পর্য্যন্তও উঠলো না। কিন্তু ভিত্তির তলায় বেশ একটু জায়গা আছে—ঠিক একটি ছোট কুঠরীর মত; অপর্ণা ঐ ঠাঁইটুকু খুঁজে বের করেছে। তার ছেঁড়া কাঁথাটাও পেতেছে। কোত্থেকে কয়েকটা টিনের কৌটো কুড়িয়ে এনে রেখেছে সেখানে। বেশ ঘরকন্না পাতিয়ে ফেলেছে সে ওখানে।

কিন্তু বড্ড অন্ধকার! আলোক দেখেছিল, অপর্ণা ছেলে কোলে আস্তে ঢুকলো,—তারপর অন্ধকারে আর তাকে দেখা গেল না। সে তক্ষুনি কাছের দোকান থেকে একটা ছোট মোমবাতি কিনে এনে জ্বেলে ঢুকলো ঘরে। অপর্ণা তখনো কিন্তু আলোককে চেনে নি। বিস্ময়ের সঙ্গে ভয় মিশিয়ে বলেছিল—কে বাবা?—কি চাইছো?

—চিনতে পারছো না! এই ভোরেই যে আমি তোমার ছেলেকে দুধ এনে দিলাম!

—ও! বাবু!—অপর্ণা উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল—বসো বাবু! ই-মা। আমি চোখখাগী চিনন্‌তে নারছিলাম গো—বসো—বসো!

আলোক না বসেই তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ, পরে শুধুলো,—এ জায়গাটা কি করে বের কোরলে!

—আমি না বাবু, ঐ যে কিশোর ছোঁড়া—ঐ আমাকে এইখানে রেখে দিয়ে গেল। সকালের দিকে যা বিষ্টি, ভিজে যেতুম না হলে!

ও! তাহলে কিশোরের বুদ্ধিতেই অপর্ণা এমন ভাল জায়গাটা পেয়েছে। কিশোরের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল আলোকের। অপর্ণা এর মধ্যে ছেলেকে শুইয়ে ঢাকা দিয়ে বলল—দু-ভাঁড় চা আনি—বসো! —কতগুলি পয়সা ভিক্ষে পেয়েছো?—আলোক চায়ের কথা শুনে শুধুলো! —সওয়া পাঁচ আনা—বলে অপর্ণা দেখালো—একটা এক আনি—বত্রিশটা ডবল পয়সা আর একটা তামার এক পয়সা! আলোক বললো, —চা আমি খাব না, তুমি যাহোক খাও—আর খাবারও কিছু খাও! আমি এখন চললাম। কাল পরশু এসে আবার তোমায় দেখে যাব!

আলোক মোমবাতিটা ওকে দিয়ে চলে আসবে, কিন্তু অপর্ণা পরিষ্কার ভাষায় বললো—যাবে কিসের লেগে বাবু—তোমারও তো ঘর-বাড়ী নাই, মেয়েছেলেও নাই। আমি এইখানে বিছানা করে দিচ্ছি—খাও-দাও ঘুমোও!—হাসছে মেয়েটা কদর্য্য ইঙ্গিতের হাসি। ওর মাতৃত্ব নির্লজ্জ নারীত্বের কামনাময় কলুষতায় চঞ্চল হয়ে উঠছে! আলোকের রাগ হয়ে গেল অকস্মাৎ। বললো—ছেলে কোলে নিয়ে সারাদিনটা মা সেজে ভিক্ষে করলে—এখন আবার বাজারের বাইজীর ভণ্ডামী করতে লজ্জা করে না। তুমি না বলেছিলে ভদ্রলোকের মেয়ে, গৃহস্থের বৌ।

মাথা নামিয়ে তিরস্কার সইল অপর্ণা নিঃশব্দে। সত্যই ও গৃহস্থের বৌ ছিল একদিন—তাই আলোকের কথার উত্তর দিতে ওর বহুক্ষণ সময় লাগলো, কিন্তু উত্তর দেবার জন্য যখন মুখ তুললো অপর্ণা, তখন আলোক চলে গেছে; মোমবাতিটা মাটিতে পড়েও জ্বলছে এবং বাইরে আবার বৃষ্টি সুরু হয়েছে।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

অপর্ণা অসহায়! আলোকের তিরস্কারটা ওকে আর একবার মনে করিয়ে দিল, সত্যি ও বাংলার কন্যা—বধূ, গৃহস্থের বাড়ীর সকাল-সন্ধ্যার মঙ্গলদীপ—স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সন্তানের জননী! কিন্তু ওসব অতীতের কথা! রুদ্র বর্ত্তমানে ওকে সর্ব্বহারার বিড়ম্বনায় বিচ্ছিন্ন করেছে সেই স্বর্গাসন থেকে। এখন এই-ই ওর পথ—পিচ্ছিল, কর্দ্দমাক্ত, কলঙ্কিত পথ।

মোমবাতিটি সযত্নে তুলে অপর্ণা বিছানার একপাশে রাখলো। ছেলেটাকে অন্ধকারে একা রেখে চা আর খাবার আনতে যেতে সত্যি ওর ইচ্ছে ছিল না। আলোক মোমবাতিটা দিয়ে ভালই করে গেছে। অপর্ণা ধীরে বুকের নিশ্বাসটা চেপে বাইরে এলো বৃষ্টির মধ্যেই। কাছের একটা কলে হাতমুখ ধুলো—তারপর একটা দোকানে গিয়ে দু' আনার মুড়কী আর এক আনার চা কিনে ফিরে এলো। মোমবাতিটা অর্দ্ধেক শেষ হয়ে গেছে এর মধ্যে। ওটাকে নিবিয়ে রাখলো পরদিনের জন্য। বাইরের গ্যাসের আলো যতটুকু পাওয়া যাচ্ছিল, তাতেই মুড়কী আর চা খেয়ে সে এসে ক্লান্ত শরীর বিছিয়ে দিল ছেলেটার পাশে।

ছেলে নিয়ে ঘুম পাড়ানো ওর কাছে নূতন নয়। ওর নিজের ছেলে হয়েছিল—তাকে মানুষও করেছিল অপর্ণা। আজ কোথায় গেল সে ছেলে, সেই স্বামী, সেই সংসার! নিজের জীবনটুকু রক্ষার জন্যই অপর্ণা আজ সহরের এই আবর্জ্জনাময় কুণ্ডে পালিয়ে এসেছে। মানুষ নিজের প্রতি এতই মমতাপরায়ণ যে সংসারের সব কিছু গেলেও নিজকে বাঁচাবার প্রবৃত্তি তার কোনো সময়েই নষ্ট হয় না; সে প্রবৃত্তি যেমন স্বতঃস্ফূর্ত্ত তেমনি মরণহীন। যেমন ব্যক্তিতে, তেমনি সমাজে—মানুষ সর্ব্বত্র নিজেকে বাঁচাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে রয়েছে। অপর্ণাও এ পর্য্যন্ত কোনো রকমে নিজকে বাঁচিয়ে এসেছে—হয়তো আরও কিছুদিন পারবে বাঁচাতে। হয়তো ওর মাতৃত্বশক্তির আওতায় রেখে এই অনাথ শিশুটিকে লালন করানোই

বিশ্ব-জননীর ইচ্ছা! কিন্তু কে এই অনাথ শিশু, কোত্থেকে এলো এবং কেনইবা অপর্ণাকে তার পালনের জন্য কোন্ এক সুদূর পল্লী থেকে এখানে এনে ফেলা হোল—অপর্ণা সে রহস্যের কিছুই কিনারা করতে পারে না। আলোকের কথাটা ভাবতে গিয়ে তার মনে হোল, ঐ বাবুটি বয়সে নিতান্ত তরুণ হলেও মানসিক দৃঢ়তায় অনেক বৃদ্ধ সাধু ব্যক্তিকেও ছাড়িয়ে যায়। অপর্ণার আবেদন সে অস্বীকার করাতে নারীচরিত্রের বিশেষত্ব ক্রোধ জাগা স্বাভাবিক, কিন্তু তার অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তার কাছে যে কোন নারীর মাথা আপনিই নুয়ে পড়বে। অপর্ণা ঠিক করলো—ঐ বাবু যদি আবার কোনোদিন আসে অপর্ণাকে দেখতে তো অপর্ণা তাকে আর কোনোরকম আবেদন জানাবে না। নিতান্ত সহজভাবে মা-বোনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্নেহেই তাকে গ্রহণ করবে। কিন্তু ঐ বাবু কি আসবে আর? অপর্ণাকে সে অতি কদর্য্য চরিত্রের এক পতিতা নারী ভেবেই আজ তিরস্কার করে গেল! অথচ অপর্ণা সত্যি পতিতা নয়—না, সত্যি নয় সে পতিতা ;—সে সত্যিই গৃহস্থের কন্যা—গৃহস্থের কুলবধূ! আজ অবস্থার বিপাকে তাকে যে ইঙ্গিত করতে হয়েছে, সেটা সত্যি তার সত্যরূপ নয়। কিন্তু কে সাক্ষি দেবে! ঐ মহান্ উদারহৃদয় ছেলেটি জেনে গেল—অপর্ণা কুৎসিৎ, কদর্য্য—অপর্ণা দেহবিলাসিনী বারনারী!

অপর্ণার সব গেছে। ঘরবাড়ী, স্বামীপুত্র—সোনার সংসার, সবই গেছে অপর্ণার—ফিরে আসবার কোনো আশাই আর নাই—তথাপি অপর্ণা সয়েছিল সেই বিরাট দুঃখ, কিন্তু আজ একজন মহান-উদার যুবকের চোখে নিজকে এতখানি হীন প্রমাণিত করার জন্য অপর্ণার অন্তরাত্মা অসহ্য বেদনায় আর্ত্তনাদ করে উঠছে!—মনে হচ্ছে, অপর্ণা আজই সত্যি সত্যি নিঃসম্বল হয়ে গেল!

আলোক রাগ দেখিয়ে ফিরে আসবার পথে ভাবতে লাগলো—ঐ মেয়েটারই শুধু দোষ নয়—দোষ এই দেশের, এই সমাজের এবং রাষ্ট্রেরও কিছু কম নেই। ওর অধঃপতন থেকে ওকে বাঁচাবার তো কেউ নেই-ই, ওকে আরো গভীর পঙ্ককুণ্ডে ঠেলে ফেলে দেবার জন্য সহস্র হস্ত উদ্যত হয়ে রয়েছে। ওকে ধমক দিলেই সব হোল না—বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে এই দেশের মানুষগুলোকে। কিন্তু কেইবা শুনছে! বুদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতির প্রত্যেকে ভাবে, সেই সব থেকে বেশী বুদ্ধিমান। প্রত্যেকে তারা অপরের বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যেতে চায়;—এই হামবড়ামীর ঔদ্ধত্য আজ বাঙ্গালীকে সত্যিই নিজ বাসভূমে পরবাসী করেছে। একদিন যে বাঙ্গালীর প্রতিভাবলে সারা ভারতবর্ষ চালিত হোত, আজ সেই বাঙালী কোথায়? কত নীচে? আপন মা-বোনের সম্মানটুকু রক্ষা করবার মত ক্ষমতাও তার নেই আজ! এমনকি, যে স্বাধীনতাস্পৃহা, যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বাঙ্গালী শিরার শোণিত ব্যয় করে গঠন এবং পোষণ করে এসেছে, লক্ষ জীবন বলি দিয়ে যাকে রক্ষা করেছে, আজ সেই সব বিশ্ববিদিত প্রতিষ্ঠান থেকে বাঙালীকে হেঁঠমাথায় হঠে আসতে হচ্ছে! প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত যে বাঙ্গালীর নেই—সেই বাঙ্গালী বিশ্বমৈত্রীর ধুয়া তুলে অহঙ্কারে ফেটে পড়তে চায়। কিন্তু কে শোনে তার কথা আজ! বাংলাকে বলি দেবার চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাঙালী স্বয়ংই সর্ব্বাগ্রে যাচ্ছে এগিয়ে। স্বল্প-সময়ের জন্য লভ্য ক্ষমতা, নাম, যশ লাভ করবার জন্য আজ কত দেশদ্রোহী যে এই দেশে কত ছদ্মবেশে রয়েছে, তার হিসাব রাখা যায় না—অথচ তারাই আছে পুরোভাগে। তাদের উচ্চতম কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে সত্যচারীর ক্ষীণকণ্ঠ কারো কানে পৌছাবার আশা করা বিড়ম্বনামাত্র! নিজের দেশকে, নিজের সমাজকে, নিজের ধর্ম্মকে, নিজের আত্মীয়-স্বজনকে এমন করে ভুলে থাকার মতন মোহ গ্রস্থতা আর কোনো জাতের পক্ষে সম্ভব নয়। —এরা উচ্ছ্বাসেই ফুলে ওঠে, উচ্ছ্বসিত হয়ে

লেখে কবিতা, গায় জয় গান—কিন্তু ভেবে দেখবার চেষ্টাও করে না যে উচ্ছ্বাসের সত্যি কারণ ঘটেছে কি না। তলিয়ে সবকিছু বুঝে দেখবার মতন বুদ্ধি, বিশ্লেষণ-শক্তি বাঙালী হারিয়েছে—এক কথায়, বাঙালীর নিজস্ব চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু উপায় নাই—অনর্থক ওসব ভেবে সময় নষ্ট না করে আলোক বৃষ্টির মধ্যেই গতরাত্রের ডেরায় এসে দেখলো,—সে আস্তানাটা আজ ভাঙা হয়ে গেছে! বৃষ্টির মধ্যেই তাকে অন্য স্থানের অনুসন্ধানে যেতে হোল। কোথায় যাবে? এদিক-সেদিক খানিকটা ঘুরতে ঘুরতে ওর কাপড়জামা সম্পূর্ণ ভিজে গেল—শীত বোধ করছে ও!

শীতে কাঁপছে আলোক—আশ্রয় একটা চাই-ই এবং অবিলম্বে—কিন্তু কত শত, কত সহস্র নিরাশ্রয় এই বিরাট দেশে এমনি অসহায়ভাবে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরছে আজ! উঃ! একদিন এইদেশে একটি শিশুর অকাল মৃত্যু হওয়ার জন্য সম্রাট শ্রীরামচন্দ্রকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল প্রজাদের কাছে—একবার অজন্মা হওয়ার সম্ভাবনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতৃপুরুষকে ছুটতে হয়েছিল স্বর্গে—একটি ভিক্ষুকের অনশন মৃত্যুর জন্য নিজেকে নির্ব্বাসিত করতে হয়েছিল এই দেশেরই একজন রাজাকে। সেই অতীত গৌরবের যুগেই ছিল সত্যকার প্রজাতন্ত্র, সত্যপূর্ণ গণতন্ত্র। মনে পড়ে গেল বৌদ্ধযুগের কথা—ভগবান সিদ্ধার্থ জন্মেছিলেন কপিলাবস্তুতে—সেদেশ ছিল গণতন্ত্রবাদী! সেই সুপ্রাচীন যুগেও ভারতে চোদ্দটি গণতন্ত্রী রাজ্যের ইতিহাস পাওয়া যায়—তাদের সব ছিল, প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী, এমনকি ভোটদান এবং গ্রহণ পর্য্যন্ত! বর্ত্তমান যুগ যাকে গণতন্ত্র বলে চীৎকার করছে, ভারতের যুগযুগান্তের কষ্টিপাথরে তার স্বরূপ বহুদিন পূর্ব্বেই যাচাই করে দেখা হয়েছে; আজকার এই গণতন্ত্রবাদ সেদিনকার গণতন্ত্রবাদের ছায়া মাত্র—তথাপি আজকার মানুষরা নূতন একটা কিছু করেছে ভেবে অহঙ্কারে ফুলে যাচ্ছে। 'হিস্ট্রি রিপিট্স্ ইট্‌সেল্ফ্'—

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিই যথানিয়মে ঘটছে! কিন্তু আজকার এই গণতন্ত্রের যুগে কোথায় সেই গণমন—যে-মন অকালমৃত্যু নিবারণ করবে, অজন্মা প্রতিরোধ করবে, অত্যাচার দমন করবে—আশ্রিতকে রক্ষা করবে! বর্ত্তমান পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মানুষ শুধুই 'থিওরী' রচনা করে; বাস্তবক্ষেত্রে সেই থিওরীর জটিলতা কোথায় কার্য্যকরী এবং কোথায় ব্যর্থ হচ্ছে; তা কয়জন থিওরী-নবিশ ভেবে দেখছে আজ!

—কোন্ হ্যায়? বাবুজি! আরে! এৎনা ভিঁজ গিয়া! আইয়ে, আইয়ে!

আলোকের চিন্তাসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সম্মুখে চেয়ে দেখলো, গলির মোড়ে গ্যাসপোষ্টের কাছে মাথায় একটা পাটের খালি বস্তা চড়িয়ে নওলকিশোর।

—কিশোর! এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে?

—ঝুমনিকো বহুৎ জোর বুখার বাবুজি! ম্যায় ডাঙ্গদার বোলানে গিয়া—তো উন্ লোক বলতে হেঁ—দো-রুপিয়া ভিজিট দেনা পড়ে গা! একঠো মেরা পাশ হ্যায়—আউর একঠো···

—আমি দিচ্ছি—আলোক মুহূর্ত্ত দেরী না করে তার আঠারো আনা থেকে টাকাটা বের করে নওলকিশোরের হাতে দিল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললো,

—ওষুধ কিনবার জন্য কিন্তু আর কিছু নাই আমার কাছে! শুধু ডাক্তার দেখালেই তো হবে না কিশোর! ওষুধও চাই!

—হুঁ! উ তো জরুর চাই! আপ্ ইঁহা জেরা খাড়া হো যাইয়ে, হাম উসকো বোলাকে ল্যায়েঙ্গে!

কিশোর মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়ে গেল গলির মধ্যে! পাঁচ মিনিট, সাত মিনিট করে প্রায় পনর মিনিট কেটে গেল, কিশোর ফিরছে না। শীতের কষ্টটা অসহ্য হয়ে উঠছে আলোকের। কিন্তু চিন্তাটাও সেই সঙ্গে উগ্র

হয়ে উঠছে মাথার ভেতর—এই দেশে একদিন কত আশ্রয়স্থান ছিল, কত আরোগ্যশালা ছিল—ভিষকগণ রোগীর চিকিৎসা করে নিজকেই কৃতার্থ মনে করতেন। তাঁরা পয়সা না পেলে রোগী দেখবেন না—একথা ভাবতেও ভয় পেতেন। বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে দেখা যায়—চিকিৎসকরা নিজেরাই অনুসন্ধান করতেন কোথায় কোন্ রোগী অচিকিৎসায় পড়ে আছে। অচিকিৎসায় কারো মৃত্যু হলে সেই জনপদের সমস্ত চিকিৎসকদের কৈফিয়ৎ দাবী করা হোত রাজার প্রতিনিধির তরফ থেকে! —কোথায় গেল সেই গণসভ্যতা, সেই হৃদয়ানুভূতি, সেই মমত্ববোধ। শুধু বিশ্বমৈত্রীর বুলি আওড়ালেই কি মোক্ষলাভ হবে? হায়রে আমার দুর্ভাগা দেশবাসী—বিদেশের চিন্তাশীল কয়েকজন ব্যক্তির বড় বড় থিওরী পড়ে তোমার দেশে তুমি ইজ্‌মের চীৎকার করে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে লজ্জা বোধ কর না! তোমার যা ছিল, তাকে নতুন ঢংএ সাজাবার কোনো চেষ্টাই তোমার নেই—অথচ বৈদেশিক চিন্তাকে স্বদেশে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার অধিকার এবং যোগ্যতাও তোমার নাই। তবু তুমি বিদেশের বুলি কপচাও কেন!

নওলকিশোর এসে পড়ল, সঙ্গে একজন বৃদ্ধ। দেখেই বোঝা যায়; ডাক্তার।

—আইয়ে বাবুজি—বলে কিশোরই এগিয়ে যেতে লাগলো। মাঝে ডাক্তার, পেছনে আলোক! হঠাৎ কিশোর ফিরে তার বস্তাটা আলোকের মাথায় তুলে দিতে দিতে বললো—আপ্ বহুৎ ভিঁজ গিয়া বাবুজি!

—তা হোক, কাপড় ছেড়ে ফেলবো—তুমি ওটা নিজেই নাও! আমার তো যতটুকু ভিজবার ভিজেছে! তুমি আর অনর্থক ভেজ কেন!

কিশোর কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করে বস্তাটা আবার নিজের মাথায় নিয়ে হাঁটতে লাগলো। ডাক্তারের হাতে ছাতি—তিনি তারই একটু কিনারা আলোককে দিলেন।

যুদ্ধের আমলে একরকম আশ্রয়-কুটির তৈরী হয়েছিল ইঁটের গাঁথুনি করে গোল লম্বা এক ধরণের ঘর। সেগুলো ভেঙে ইট বের করে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সবগুলোই এখনো ভাঙা হয়ে উঠেনি। একটা মাঠের মধ্যে ঐ রকম দুটো ঘর—আলোক দেখেছিল, ঘরগুলোকে বড্ড নোংরা করে দিয়েছিল রাস্তার অধিবাসীরা। সেদিন সে ভেবেছিল—আশ্রয়স্থলকে এতখানি কদর্য্য করে তুলবার মত নৈতিক অধঃপতন আর কোনো দেশে হয় না;—কিন্তু আজ ঐ গোলাকার ঘরের একটায় সে নওলকিশোরের দলকে থাকতে দেখে ভাবলো—রাস্তার অধিবাসীরা নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এই অবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিল, নইলে শুচিতা-পবিত্রতার জ্ঞান তাদেরও আছে। সমাজ যে দেশে রাস্তার অধিবাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধিতেই সাহায্য করে, সেখানে এ ছাড়া আর গত্যন্তর কি? তা ছাড়া ওদের নৈতিক জ্ঞান দিয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করবার চেষ্টাই বা কোথায়?

ঘরখানা ধুয়ে পরিষ্কার করেছে কিশোরের দল। শুকনো ছেঁড়া বিছানায় ঝুমনি শুয়ে রয়েছে; একটা মোমবাতি জ্বলছে। কিন্তু ডাক্তার বাবু ঐ ঘরে ঢুকবার পূর্ব্বে বলে উঠলেন—ইস্। এসব যায়গায় বড্ড নোংরা থাকে। নাকে রুমাল দিলেন তিনি। আলোকের মনটা একেই উত্তপ্ত ছিল, তারপর এতখানি এসে ডাক্তারবাবুর থেমে যাওয়া দেখে প্রায় ধমকের সুরে বলল,—এই নোংরাতেও মানুষকে থাকতে হয়। আর তারা আপনারই দেশের মানুষ। চলুন—ঢুকুন ভেতরে।

ডাক্তার ওর মুখপানে চাইলেন; কিন্তু তাঁর ঢুকবার লক্ষণ দেখা যায় না।

—আপনি মাগনা আসছেন না স্যার। টাকা দেওয়া হবে আপনাকে; আসুন।

বলে আলোকই আগে ঢুকে পড়লো। কী ভেবে ডাক্তার আর কিছু না বলে ঢুকলেন ; ঝুমনিকে পরীক্ষা করলেন যন্ত্র দিয়ে। তারপর বললেন.

—বেশ সুবিধা লাগছে না। নিউমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে।

আলোক একটু বিচলিত হোল অতবড় রোগটার নাম শুনে, কিন্তু কিশোর অচঞ্চল কণ্ঠে বলল –হোবে তো কি হোবে—ভগবানজি মালিক। আপ দাওয়াই তো লিখ দিজিয়ে।

আলোক পকেট থেকে কাগজ পেনসিল বের করে দিল। ডাক্তার প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখছে, কিশোর বললো - হাম্‌লোক গরীব আদমি, জেরা আচ্ছা দাওয়াই দিজিয়ে—আউর সস্তাভি হোনা চাই।

আলোক হেসে ফেললো কথাটা শুনে। ডাক্তার ওর মুখের পানে একবার চেয়ে ওষুধ লিখে দিল এবং ব্যবহার করবার বিষয় আলোককে বুঝিয়ে দিল ; শেষে বলল কাল সন্ধ্যায় একবার খবর দেবেন।

ডাক্তার যাচ্ছে, কিশোর ডাক্তারকে পৌঁছাতে যাবে এবং ওষুধগুলোও নিয়ে আসবে ; আলোক শুধুলো—টাকার কি করবে কিশোর !

—ওহি দেনে ওয়ালা !—বলে কিশোর উর্দ্ধদিকে আঙ্গুল বাড়ালো।

আশ্চর্য্য এই দেশের মানুষ। অশিক্ষিত এক ভিখারী বালক, জীবনে যে গৃহসুখ কখনো জানে না—পথে পথে যাযাবর-বৃত্তিতেই যার দিন এবং রাত্রি কাটে, তারও অন্তরে সেই সুমহান আত্মসমর্পণের অনুভাব। আশ্চর্য্য এই ঈশ্বর-প্রেমিক দেশ! এ দেশের জল-মাটি-হাওয়াতেও ঈশ্বর-প্রেম,—কিন্তু কোথায় সেই ঈশ্বর, যিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হবেন বলে বারম্বার শঙ্খধ্বনি করেছিলেন ? কোথায় তিনি, যিনি ধর্ম্মের গ্লানি সইতে পারবেন না, নিশ্চয়ই আসবেন, বলে অহঙ্কার করেছিলেন ?—কৈ তিনি। বর্ত্তমানের বিজ্ঞান তাঁকে আমল দেয় না, ভবিষ্যতের বিজ্ঞান তাঁকে নস্যাৎ করে ছাড়বে।

কিশোর এবং ডাক্তার চলে যাওয়ার পর রামধনিয়া উঠে একখণ্ড ছেঁড়া কাপড় দিল আলোককে! বললো—ছেড়ে ফেলো বাবুজি! নইলে তোমারও অসুখ হবে!—হুঁ—বলে আলোক নিজের কাপড় জামা ছেড়ে দিল! রামধনিয়া উঠে সেগুলো ঐ ঘরেরই একপাশে মেলে দিল শুকুবার জন্য! আলোক ভাবছে—তিনি নেই! একি সত্য? না—তিনি আছেন; প্রতি মানবের অন্তরেই তিনি আছেন; তেমনি জাগ্রত হয়েই আছেন! মানুষ যেমন বিশেষভাবে কান পেতে না শুনলে নিজের শরীরের রক্তচলাচল টের পায় না, তেমনি বিশেষ ভাবে শুনিনা বলেই মনে হয়, তিনি নেই। তিনি না থাকলে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিরাট পৃথিবীও থাকতো না—থাকতো না আলোক, থাকতো না রামধনিয়া, থাকতো না নওলকিশোর এবং থাকতো না ঐ কঠিন রোগশয্যাশায়িনী ঝুমনি! তিনি আছেন মানবের অন্তরে; তিনি—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়া রূপেন সংস্থিতা' যা দেবী তুষ্টি রূপেন সংস্থিতা,—পুষ্টি রূপেন সংস্থিতা—শান্তি রূপেন সংস্থিতা,—ক্ষান্তি রূপেন সংস্থিতা—মাতৃরূপেন সংস্থিতা,—তিনি না থাকলে এই তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষান্তি-শান্তি, দয়া মায়ার সেবাবৃত্তি কিরূপে থাকা সম্ভব হোত! তাঁকে নাই বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা আত্মবঞ্চনা। আপনার অন্তর খুঁজলেই শিরার শোণিতের মত তাঁকে অনুভব করা যায়। বুকের স্পন্দনের মত তাঁকে বুঝতে পারা যায়। মানুষের অন্তরের এই যে দয়া, মায়া, স্নেহ বৃত্তি, এই যে আশ্রিতকে রক্ষা করবার প্রবৃত্তি, আত্মত্যাগের মানসিক ঔদার্য্য—এ সকল তাঁরই বিভূতি,—এই যে শোকের ম্রিয়মানতা, আনন্দের দ্যোতনা, আশার আশ্বাস, এর মধ্যে তাঁরই অস্তিত্ব সুপ্রকাশ! তাই ঋষি বলেছেন, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম!'

কিন্তু এ যুগ যন্ত্রের যুগ; যান্ত্রিক সভ্যতার দানবীয় চীৎকারকে ছাপিয়ে মানব-ধমনীর শোণিত-স্পন্দের সূক্ষ্ম সঙ্গীত কর্ণগোচর হওয়া অসম্ভব প্রায়—বিরাট বিশ্বের সমস্ত কোলাহলকে অতিক্রম করে শব্দব্রহ্মরূপ

ওঙ্কারধ্বনি আজ কানে প্রবেশ করা অসম্ভাব্য, কিন্তু এখনো মানুষ করলেই তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে! কারও কি হয় না সে ইচ্ছা? প্রতি মানুষের অন্তরে যে দেবতার অধিষ্ঠান, দেশ, জাতি, এবং ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ যে মানব-অন্তর চিরন্তন মনুষ্যত্বরূপ দেবভূমিতে অধিষ্ঠিত, সেইটাই যে সর্ব্বমানবের ঐক্যভূমি, এ সত্য কি কেউ অনুভব করে না এই যন্ত্র-যুগে! দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে এই যে হানাহানি ঈর্ষা, অসূয়া এবং আত্মবঞ্চনা, এই সমস্তের সমূল ধ্বংস হয়ে যায়, যদি মানুষ সত্যি তার মনুষ্যত্বরূপ দেবভূমিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু কে তাদের নিয়ে যাবে? কোথায় সেই দেবতা-পুত্র মহামানব, যিনি সমস্ত মানব-লোককে জাতি-ধর্ম্ম-দেশকাল-নিরপেক্ষ ভাবে একই দেবভূমির আশ্রয়ে চালিত করে নিতে পারবেন! বুদ্ধ, খৃষ্ট, কবির, নানক কি আর আসবেন না এই দ্বেষ হিংসার অবসান ঘটাতে? সর্ব্বমানবের মিলনের রাখি বাঁধতে শ্রীচৈতন্য কি আর আবির্ভূত হবেন না? সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের পবিত্র সাধন-ভূমিতে কি শ্রীরামকৃষ্ণ আর একবার শঙ্খধ্বনি করবেন না? বড় দরকার আজ এই আত্মকলহ এবং আত্মবিরোধের বধ্যভূমিতে মানুষের গুরুরূপে একজন বিরাট মহামানুষের; একজন ঈশ্বরপ্রেরিত প্রফেটের বড়ই দরকার, যিনি সমস্ত মানবচেতনাকে সেই মহাচৈতন্যের শান্তি-ভূমিতে মহদাশ্রয় দান করবেন—পরিপ্লাবিত করে দেবেন মানুষের অন্তরলোক এক অপার্থিব আলোকের জ্যোতির্লেখায়—যাঁর চরণাশ্রয়ে এক হয়ে যাবে বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্ম!—এ কাজ এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, মেসিনগানের নয়। এট্যাম বোম ছেড়ে পৃথিবী ধ্বংস করা যেতে পারে, মানবের মৈত্রিবন্ধনের কাজে সে একান্ত অক্ষম। মানুষের অন্তরে অন্তরে যোগস্থাপন করতে সক্ষম একমাত্র মানবধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম স্নেহ-প্রীতিতে উজ্জ্বল, ত্যাগে-তপস্যায় বিবেকী, ক্ষমার ঔদার্য্যে আত্মসমাহিত এবং সেবার গৌরবে ধন্য। কোথায় সেই ধর্ম্মগুরু? কবে তিনি আসবেন? মনে

পড়লো, একজন এসেছেন, যিনি মহামানব, অহিংসাবাণীর উদ্গাতা, আত্মপ্রত্যয়ের মূর্ত্ত-রূপ এবং আশার অবিনশ্বর ইঙ্গিত! দেশ, কাল এবং জাতীয় জীবনে তাঁর অমোঘ বাণী আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এনেছে এবং আনছে। আলোক তাঁর উদ্দেশে নমস্কার করে বললো করযোড়ে,—তুমিই যদি তিনি হও, তা হলে হে মানুষের মধ্যে সত্যতম মানুষ, তোমায় আমি নমস্কার করি—আবার নমস্কার! 'পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে!'

আজ সাত দিন সিদ্ধেশ্বর এক আশ্চর্য্য প্রব্রজ্যায় যাত্রা করেছে! ওর মনে হয়, ও যেন সন্ন্যাস নিয়েছে, গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করতে করতে তীর্থ পরিভ্রমণ করছে গুরু-ভাইদের সঙ্গে। সে তীর্থ ভারতের বড় বড় সহর, এবং দেশোদ্ধার-রূপ মহাধর্ম্মের সাধনক্ষেত্র। সেই মহাসাধনায় কবে ওরা সিদ্ধিলাভ করবে, তা কেউ-ই জানে না, কোনো জবাবই কারো কাছ থেকে প্যায় না সিদ্ধেশ্বর; তবু ওর মনে আশা জাগে,—একদিন সিদ্ধিলাভ হবেই এবং সেইদিন অবন্তীর মুখ থেকে পাওয়া তার গুরু মন্ত্রও সিদ্ধ-মন্ত্র হয়ে যাবে তারপর। বিজয়-গর্ব্বে সিধু যাবে অবন্তীর সমুখে—; বলবে তাদের যাত্রা-পথের ইতিহাস, অক্লান্ত সংগ্রামের মধ্যে অমিতবীর্য্যে এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস—ভয় ভীতি তুচ্ছ করে, মৃত্যুকে লঙ্ঘন করে অ-মৃত যাত্রার অমর ইতিহাস!

কিন্তু সিধু এমন করে ভাবতে পারে না;—ওর চিন্তাগুলো ভাষায় ঝঙ্কৃত হতে পারে না, শুধু মানস-লোকে বুদবুদ তোলে মাত্র। কিন্তু জীবনকে সে আরো গভীরভাবে দেখতে শিখছে! ওকে শিখিয়ে দিচ্ছেন ওরই এক গুরুভাই—কর্ণ-বিজয়! অপূর্ব্ব, অদ্ভুত, এক স্বরাট-যোগী, এই বিরাট যজ্ঞের বিশিষ্ট ঋত্বিক তিনি; উদার, মহান এবং আত্মচেতনায়

অধিষ্ঠিত সৌরতেজঃ সম্পন্ন পুরুষ, ; জীবনে তিনি নিজেকে শুধু সূর্য্যের মতই ক্ষয় করে আলোক দান করে এসেছেন—কর্ণের মতই নিঃশেষে নিজেকে দান করে এসেছেন ; কিন্তু তিনি বিজয়ীও ; তাঁকে জয় করবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকেও প্রতারক সাজতে হয়, বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকেও যুদ্ধ-বিরত বীরের হত্যাকারী হতে হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও সহায়ক হতে হয় সেই মানবত্ববিরোধী, বীর-ধর্ম্মবিরোধী নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে—এই কর্ণবিজয়ও সেই কর্ণ, বীর কর্ণ, দাতাকর্ণ, দেবতা কর্ণ—যিনি সগর্ব্বে ঘোষণা করেন, —'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্'

কিন্তু সিধু তাঁকে ঠিক মত বুঝতে পারে না ! কারণ সিধুর বিদ্যার নিতান্ত অভাব,—তা' ছাড়া, সিধু এই দেশোদ্ধার মহাধর্ম্মে খুব অল্পদিন দীক্ষা নিয়েছে, তারও চেয়ে বড়ো কারণ, সিধু নিজকে অত্যন্ত দীন, অসহায় মনে করে ! কিন্তু নিজেকে অসহায় মনে করা বীর-ধর্ম্ম নয়,—সেই কথাটাই সেদিন কর্ণ-বিজয় ওকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন—সৈনিক—এই বিশ্ব-ধ্বংসী শৌর্য্যশক্তির তুমিও একটি বিন্দু, একটি অমোঘ তীর, একটি মৃত্যুবাণ। তুমি দুর্ব্বল হলে এই অজেয় শক্তিও দুর্ব্বল হয়ে যাবে। সাবধান। তুমি শুধু একটি সৈনিক নও, তুমি সৈন্য-জীবনের অচ্ছেদ্য প্রবাহ !

—আমার মনে হয়, আমার মতন মুখ্যু মানুষ কি কাজে লাগতে পারে ?

—মরণের কাজে। জীবনকে যারা পরিপূর্ণভাবে পেতে চায়, তারা সর্ব্বাগ্রে যাবে মরণের রক্ত-রাঙা পথে। মৃত্যুকে জয় না করলে জীবনকে পাওয়া অসম্ভব ! সে জীবন তোমার একার জীবন নয়, তোমার দেশের জীবন, তোমার জাতির জীবন, তোমার প্রবহমান মানব-ধর্ম্মের জাবন। সিদ্ধেশ্বর, তোমার শালগ্রাম নুড়ির কাছ থেকে কি তুমি শুনতে পাও না— কত সাধনার পথে পথে গড়িয়ে গড়িয়ে ঐ নুড়িটা গোলাকার হয়েছে,

লক্ষণ-যুক্ত হয়েছে, তারপর সে পূজা পাচ্ছে তোমার কাছে! সাধনার পথে গড়াতে গড়াতে ঐ পাথরটা যদি ভাঙবার ভয়ে থেমে যেতো, তাহলে কি আজ সে পূজার স্বর্ণাসনে বসতে পারতো? তোমার অন্তর-পাথরকে ওমনি করে এগিয়ে নিয়ে চলো—পূজকের সংখ্যা অসংখ্য হয়ে উঠবে। তুচ্ছ একটা পাথর যদি নিজকে গোলাকার করে পূজা পেতে পারে, তো তুমি মানুষ, তুমিই বা কেন পারবে না! তোমার মূর্খত্ব জীবনের আলোকে জাগ্রত হোক—স্বাধীনতার আলোকে প্রস্ফুটিত হোক, দেখবে, বর্ণ-জ্ঞান-হীনতাই মূর্খত্ব নয়। অন্তরের ঐশ্বর্য্যই পাণ্ডিত্য! এই দুর্ভাগা দেশে বিদেশী-দত্ত বর্ণ-জ্ঞান শুধু দাসত্বের নিগড় দৃঢ় করবার জন্য; তুমি সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত আছ! সিধু, আমি সত্যি বলছি, তুমি আমাদের অনেকের থেকে ভাগ্যবান। তোমার অন্তর-শুচিতা বৈদেশিক সভ্যতার আঘাতে ভেঙে যায় নি। তোমার সাংস্কৃতিক চেতনা আবিল হয়ে ওঠেনি বলেই জন্মভূমির সবছেড়ে আসবার সময়ও তুমি ঐ তুচ্ছ পাথরের নুড়িটা ফেলে আসতে পারোনি; তুমি বর্ত্তমান শিক্ষার অপরিপূর্ণতায় আবিল নও বলেই তুমিই ভারতমাতার অপরিম্লান সন্তান। তুমি শুচি, শুভ্র, পবিত্র ভারতীয়!

সিধুর আনন্দ হচ্ছে। তার মত ভয়ঙ্কর খারাপ লোককে এই এত বড় জননেতা কি সব বলছেন? ঠিক বুঝতে না পারলেও উনি খুব ভাল কথা বলছেন সিধুকে, সেটা সিধু বুঝতে পারছে। কিন্তু সত্যি কি সিধু অত উঁচু লোক? কিন্তু কর্ণদাদা তো মিথ্যা বলেন না! সত্য এবং বীর্য্য রক্ষাই ওঁর জীবনের নীতি! কর্ণদাদা আবার বললেন,—এই দেশে শক হুন, তাতার এসেছে, জলদস্যু-স্থলদস্যু এসেছে, লুণ্ঠনকারী দিগ্বিজয়ী এসেছে, মোগল-পাঠান রাজত্ব করেছে, কিন্তু কেউ-ই এই দেশের শিক্ষা সংস্কৃতিকে, এই দেশের প্রবহমান জীবনধারাকে ভাঙতে পারে নি—তারাই বরং এই বিরাট দেশের সর্ব্বগ্রাসী সভ্যতার আওতায় পড়ে, প্রভাবিত

হয়ে এই দেশেই মিশে গেছে—কেও একত্রিত হয়েছে, কেউবা আশ্রিত হয়েছে, কেউ কেউ আপন অস্তিত্ব কোনোরূপে বজায় রেখে এই সভ্যতার উপর শ্রদ্ধাবান হয়ে পড়েছে—কিন্তু ইংরাজ বণিক প্রথম থেকে ঘা দিয়েছে এর শেকড়ে—সংস্কৃতিতে, শিক্ষায়, স্বভাবে। নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সে অভাব সৃষ্টি করেছে, এই সর্ব্ব-রত্ন-সমন্বিত মহাভূমিতে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য শিক্ষাকে করেছে বিকৃত শুধু নয় বিপরীতগামী ; ব্রহ্মচর্য্যের ত্যাগ-তপস্বীর শিক্ষাকে করেছে ভোগ-বিলাসী জুতোজামা-পরা বাবুচর্য্যা, আর সাংস্কৃতিক সমস্ত গৌরবের সমাধি দিয়েছে সে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক সাহিত্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করে। একথা শুধু আমার কথা নয়, ওদেরই দেশের মহা মহা মনিষী মহামানবদের কথা—এডামস্ স্মিথ্ তাঁর ওয়েল্থ্ অব নেশন—গ্রন্থে বলেছেন, 'নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজ সাম্রাজ্যের প্রজাকে এমন করে শোষণ করে ক্ষয়িষ্ণু করা, শাসনের সুনাম বা দুর্নামের প্রতি এমন চরম ঔদাসিন্য পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত কেউ দেখাতে পারে নি! ওদেশ যদি ভূমিকম্পেও উচ্ছন্ন হয়ে যায়, তথাপি কোম্পানীর কিছু এসে যায় না'—এই কোম্পানীই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং এরাই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতকে করেছে সংস্কৃতিতে অবিশ্বাসী, শিক্ষায় বিদেশী আর স্বভাবে বিকৃত ; এ শিক্ষা না পাওয়ার জন্য তুমি দুঃখ করো না সিধু, তোমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হোক দেশমাতার বন্ধনমোচনের ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা!

কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানলেও কর্ণদাদার এই কথাগুলো সিধু ভালভাবেই বুঝতে পারতো, কিন্তু না বুঝলেও তার মনের গভীর প্রদেশে একটা সুর-তরঙ্গ খেলা করতে লাগলো যেন—যেন মনে হোল, সিধু আর্য্য-ভারতের বিশুদ্ধ এক বংশধর। ইতিহাস সিধুর পড়া না থাকায় সে চিন্তাই করলো না যে বর্ত্তমান ভারতবাসী হিন্দুর অধিকাংশই বর্ণ-সাঙ্কর্য্যে উৎপন্ন। সিধু বললো,—এই দেশটা তো আমাদেরই ছিল কর্ণদাদা! এটা আমাদের

হাতছাড়া হয়েছে—সেজন্য এর ভালমন্দের সমস্ত চিন্তা তো আমাদেরই করা উচিৎ সকলের আগে!

—খুবই সত্যি কথা, সিধু! ভারত হিন্দুর দেশ; হিন্দুরা সেদেশে যুগযুগান্তর বাস করে আসছে। তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বভাব সমস্তই এই দেশের জল-মাটির উপযুক্ত করে তারা তৈরী করেছিল। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোথাও হিন্দুর সংখ্যা সামান্যই। ভারতের অকল্যাণ হলে, হিন্দুজাতিই লুপ্ত হয়ে যাবে; কিন্তু বিদেশী শাসক সে চিন্তা করেন না। হিন্দু লুপ্ত হলে তাঁদের কিছুই এসে যায় না—তাই ভেদ-বিভেদ-বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বেলে তাঁরা শাসনকার্য্য কায়েম রাখতে চান। কিন্তু যখন ভাবি, এই হতভাগা দেশের হিন্দুরাই সাহায্য করছে সেই ভয়ানক দেশদ্রোহকর কাজে, তখন আশ্চর্য্য না হয়ে পারি না। কেউ ভুলের জন্য করছে, কেউ-বা স্ব-ইচ্ছায় করছে, কেউ স্বার্থসিদ্ধির জন্য করছে!

—এর কি উপায় কর্ণদাদা?

—উপায় স্ব-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আবার শক্তিপূজার ব্যবস্থা করা—; আমরা এতকাল ধরে যে শক্তিপূজা করে এসেছি, তা নিরর্থক হয়েছে। নিরর্থক হয়েছে আমাদেরই ভণ্ডামীর জন্য! আমাদের হাজার বছরের কথা মনে করলে দেখতে পাই, অসহায় মানুষের উপর অত্যাচারীর শাণিত খড়্গ ক্রমাগত আঘাত করেছে, পীড়নে লাঞ্ছনায় চূর্ণ করেছে নিরীহ ভারতবাসীকে আর ভারতবাসী আর্ত্তনাদ করে শুধু ঈশ্বরকেই ডেকেছে—প্রতিকারের কোনো চেষ্টা করে নি! ঈশ্বরদত্ত আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তির সে অবমাননা করেছে। ক্ষতি সয়ে সয়ে, উৎপীড়ন সহ্য করে করে, অধিকার হারিয়ে হারিয়ে সে এখন এমনই অবস্থায় এসেছে যেখানে তার স্বাধীনতা দূরের কথা, স্বদেশ বলতেও কিছু নাই! স্বদেশে সে পরদেশী! তবু আজো এরা ভীরু কাপুরুষের মত শুধু তোষণ-নীতি নিয়েই বন্ধুত্বের মরীচিকার পিছনে ছুটছে—এখনো বুঝলো না যে অধিকার লাভ করে

করে, অত্যাচার করে করে অপরপক্ষরা আর এদের বন্ধুত্বের ভূমিতে নাই, অনেক উচ্চ ভূমিতে উঠে গেছে! তারা এই ভীরু কাপুরুষ ভারতবাসীকে তাদের দাস মনে করে আজ!

কিন্তু সিদ্ধেশ্বর বুঝতে পারছিল না কথাগুলো; কর্ণদাদাও আর বেশি বললেন না—শুধু বললেন,—তোমার সৎসাহসের আর উচ্চমনোবৃত্তির জন্য আমরা খুবই খুসী হয়েছি সিদ্ধেশ্বর। তুমি লেখাপড়া জানো না বলে দুঃখ করো না! যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের কাজ শুধু আদেশ পালন—আদেশ দেবার অধিকার সেনাপতির, ধারভাবে আদেশ পালন করে চলো; একদিন তোমার মুক্ত কৃপাণের ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ সৈনিক জয়যাত্রা করবে! তুমি সৈনিক, তুমি বীর!

কর্ণদাদা কার্য্যান্তরে চলে যাওয়ার পর সিধু একা বসে ভাবতে লাগলো, সেদিন গভীর রাত্রে কর্ণদাদার আদেশে যে ভয়ঙ্কর কাজটা করবার জন্য সিধুকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সিধু নির্ভয়ে সে কাজে এগিয়ে গিয়েছিল বলেই কর্ণদাদা তার প্রশংসা করলেন, কিন্তু সে কাজ সিদ্ধ হয় নি! জীবনে এই দুটো কাজে সিধু ব্যর্থ হোল, একটা অবন্তীকে অপহরণ করা, অন্যটা কর্ণদাদার আদেশ পালন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে-কাজে বিফল হওয়া! কিন্তু বিফল হলেই বিচলিত হবার লোক কর্ণদাদা নন। তিনি সস্নেহে সিধুর পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন—বাঃ! বেশ সাহসী তো তুমি! তারপর সিধুকে তিনি নিজের দলেই রেখে দিলেন। সিধু এঁদের সঙ্গে এখানে সেখানেই ঘুরছিল। হঠাৎ টাকার টান ধরায় কর্ণদাদা চিন্তিত হয়ে পড়ায় গত কাল সিধু বললো,—আমার হাজার পাঁচ টাকা আছে। কর্ণদাদা আশ্চর্য্য হয়ে শুধুলেন—তোমার টাকা আছে? কোথায় পেলে?

—ব্রহ্মোত্তর জমি আর বাস্তু-বাড়ী বিক্রীর দরুণ টাকাটা পেয়েছিলাম।

সব শুনে কর্ণদাদার চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠেছিল,

বলেছিলেন,—এমনি করেই মানুষকে গৃহহারা, সর্ব্বহারা হয়ে যেতে হচ্ছে—উঃ!

সিধুর টাকা উনি নিলেন না, বলেছেন, দরকার যদি খুব বেশি হয় তো কিছু নেবেন; এখনকার মত কিছু দিন চলে যাবে। কোথায় কিছু টাকা পেয়েছেন! সিধুর দুঃখ হয়ে ছিল, কর্ণদাদা টাকাটা না নেওয়ার জন্য কিন্তু উনি তো বলেছেন, দরকার হলে নেবেন!

টাকা আর নিজের কাছে রাখতে চায় না সিধু। ওর মনের মধ্যে বিলাসের আর কোন আকাঙ্ক্ষাই বেঁচে নাই। ও এখন শুধু ভাবে, জীবনটা একটা বৃহত্তম মহত্তম কাজে ব্যয় করবার ক্ষেত্র সে ভাগ্যবলে পেয়ে গেছে! এই ক্ষেত্র থেকে সে আর বিচ্যুত হবে না। সন্ন্যাস নিয়ে গিরিগুহায় ধ্যান-ধারণা করে ঈশ্বরলাভের স্বার্থপর তপস্যায় মন ওর বিমুখ হয়ে উঠেছে। ও এখন চায়, সকল মানুষকে নিয়ে বিরাট এক মহামানব-গোষ্ঠি গড়ে তুলতে, বিশাল এক মহাসমাজ-রাষ্ট্র গড়তে, একটা স্বরাট্ রাষ্ট্র গড়তে!

কিন্তু এসব কথা কর্ণদাদার মুখে শুনেই সিধু যতদূর সম্ভব বুঝবার চেষ্টা করে। ওর উপলব্ধিতে এদের ঠাঁই নাই, অনুভবে শুধু আভাস জাগে মাত্র! এই অত্যাশ্চর্য্য অনুভবটা এসেছে কর্ণদাদার সাহচর্য্যে। জীবনে কোনোদিন স্বদেশ বা স্বাধীনতার কথা সিধু ভাবে নি। নেশা আর নারী ছাড়া কিছুই ভাবে নি সে। এবং ঐ দুটি বস্তুর জন্য সিধু না করতে পারতো এমন কাজ নেই; ওর সর্ব্বনাশ করলো ঐ শালগ্রামের নুড়িটাই। ওইটাই দুর্ব্বল করে দিল ওর মন—হতভাগা পাথর!—সিধু চম্‌কে উঠলো, পকেটে হাত দিয়ে দেখলো, কাগজ জড়ানো লাড্ডুর মতন পাথরটা রয়েছে তখনো। বের করলো!

কী সুন্দর! কালো উজ্জ্বল রঙ ঝকমক করছে! আর কত সব চিহ্ন রয়েছে ওর গায়ে আবার! চক্র—হ্যাঁ, এই চক্রেই নাকি দৈত্য দলন

হয়েছে, ধর্ম্ম সংস্থাপন হয়েছে, রাষ্ট্র পালন হয়েছে! এই চক্র তো তুচ্ছ করবার বস্তু নয়! এই তো শক্তি,—কর্ণদাদা যা বলছিলেন!

সিধু উঠে গিয়ে নদীতে স্নান করলো, তারপর দুচারটা বুনো ফুল তুলে পূজা করতে বসলো সেই নদীর কূলে এক গাছতলায়! মন্ত্র সিধুর জানা, দিনকয়েক পুরোহিতের কাজ করা ছিল ওর;—পূজা করতে করতে সিধু তন্ময় হয়ে গেছে। এক গুরুভাই এসে ঠাট্টা করে বললো—পাথরের নুড়ির পূজা করে কি হয় সিধু? ওর কি প্রাণ আছে?

—নিশ্চয় আছে—সিধু দৃঢ়স্বরে বললো—দেশমাতাও মাটি আর পাথর দিয়ে গড়া—আমার এই নুড়ি সেই পাথরেই তৈরী; তাই শাস্তরে লেখা আছে, এই নুড়িতে যে কোন দেবদেবীর পূজা হতে পারে। মাটিই দেবতা!

গুরুভাই চুপ হয়ে গেল একেবারে।

নিজেকে নিঃসহায়ভাবে ঈশ্বরের পাদপদ্মে অর্পণ করেই মা অবন্তীকে নিয়ে কাশীতে পৌঁছেছেন। অবন্তীর সময় এখনো পূর্ণ হয়নি, তাই তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে মাস তিন। এই সময়টা তিনি যথাসাধ্য পুণ্য সঞ্চয় করবার বাসনায় পূজা-আরতি-মন্দির দেখে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু অবন্তীর ওসব বালাই নেই; সে নিশ্চিন্ত মনে গল্প করে, আড্ডা দেয়, বই পড়ে, ঘুমায়। শচীনবাবুর বড় বাড়ীতে ওরা উপরের দুটো কামরা নিয়ে আছে। একটা ঝি এবং একটি বাচ্চা ঠাকুরও আছে রান্নার জন্য। অসুবিধার কোনই কারণ নেই; শচীনবাবুর পরিবারবর্গ এদের মা-মেয়ের প্রত্যেকটি সুবিধার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন; অবশ্য অবন্তী সম্বন্ধে সব কথা একমাত্র শচীন বাবু ছাড়া বাইরের আর কেউ জানেন না। অন্য সকলে জানেন, অবন্তী বিবাহিতা, এবং শারীরিক সুস্থতা লাভের জন্যই পশ্চিমে এসেছে;

কিন্তু তার মা'র পুণ্য লাভের পিপাসা অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য কাশীতে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। ইতিমধ্যে যদি সন্তান-সম্ভাবনা নিকট হয়ে আসে তাহলে শচীনবাবুর মত মহান পিতৃবন্ধুর আশ্রয় ছেড়ে অন্যত্র না যাওয়াই ভাল! কল্‌কাতায় এখন নানা রকম অসুবিধা আছে অতএব সেখানে তাঁরা যেতে চাইছেন না। ব্যাপারটা কঠোর সত্য; কলকাতায় বর্ত্তমানে পত্নী কন্যা নিয়ে বাস করা সত্যিই বিপজ্জনক মনে করে সকলেই সে কথা বিশ্বাস করলেন। অবন্তীর মা নিশ্চিন্ত হয়েছেন!

সীমন্তের সিঁদুর অবন্তী দেয় না, জনৈকা সখী প্রশ্ন করায় অবন্তী জবাব দিয়েছে—সীমন্তোন্নয়নের পর নাকী সিন্দুর পরতে নাই। নিরীহ সখীটি এক বিদুষী মেয়েকে আর বেশী ঘাঁটাতে সাহস করেনি। অবন্তীর আদর-যত্ন ওঁরা বাড়িয়ে দিয়েছেন; এ অবস্থায় যা-যা প্রয়োজন, সবই ওঁরা করছেন। অবন্তী হেসে খেলে বেশ আছে! কিন্তু মা—অভাগী জননী গভীর রাত্রে ভাবেন, আর ভাবেন, দিন নিকট হয়ে আসছে; সেই ভয়ঙ্কর দিনে কী তিনি করবেন! আবার ভাবেন—ছেলেটাকে গোপনে কোনো আতুরশালায় পাঠিয়ে দেবেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, শচীনবাবুর পরিবারবর্গকে কি কৈফিয়ৎ দেবেন তিনি তখন! কত দুঃশ্চিন্তাই যে হয় মার···অবন্তী তখন নিঃসাড়ে ঘুমায়; মা হয়তো একবার গিয়ে দেখে আসেন কেমন সে রয়েছে। মৃদু আলোতে অবন্তীর সুন্দর মুখখানা আরো সুন্দর দেখায়। মা দেখেন আর ভাবেন, যে শুভ দিনের আগমনকে শরীর-মনের সকল আনন্দ দিয়ে বরণ করবার কথা, সেই দিনটির নিকটবর্ত্তিতা তাঁর অন্তরকে আকুল করে তুলছে আশঙ্কায়; আর্ত্তনাদ করছে হৃদয়। এই অবন্তীকে কি আবার সেই পূর্ব্বের অবন্তী করে তোলা যাবে! আবার কি তাকে বিবাহিত বধূজীবনের পবিত্রতম গৃহাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন তাঁরা! মা—মার অন্তর বিদীর্ণ করে কান্নার সুর জেগে ওঠে—না!

তবু চেষ্টা করতে হবে, যদি, যদি কোনো উপায়ে অবন্তীর বর্ত্তমানকে একান্তভাবে প্রচ্ছন্ন করতে পারা যায়, তাহলে, হয়তো টাকার জোরে ভাল ঘর-বর দেখে তাকে পাত্রস্থা করে দেবেন তিনি। কিন্তু প্রচ্ছন্ন করা প্রায় অসম্ভব। যে নবাগত আসছে, সে তার বিজয় দুন্দুভি বাজিয়ে আসবে ; সে চলে গেলেও তার সুগভীর পদচিহ্ন রেখে যাবে অবন্তীর সারা শরীরে ;—সে-সত্য প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে উঠবে যে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির চোখে! নিরাশায় মায়ের সারাদিনের সঞ্চিত পুণ্য ক্রন্দনে ঝরে পড়ে মাটিতে ; সন্তানস্নেহাতুরা জননী বারম্বার বলেন—রক্ষা করো বিশ্বেশ্বর!

কিন্তু বিশ্বেশ্বরের দল আজকাল বধির হয়ে গেছেন ; ঢাকঢোল, শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে আমরাই তাদের কাণ ভোঁতা করে দিয়েছি। আমরাই পূজার সার্ব্বজনীন মন্দিরে ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র-অন্তজ্যের অচলায়তন রচনা করে ভক্তের গভীর আহ্বানকে রুদ্ধ করেছি ; ছুৎমার্গের কদর্য্যতায় অপবিত্র করেছি পবিত্রতম দেবতার পানভোজনালয় ; দুই হাতের সমস্ত শক্তির শাণিত খড়্গে আমরা শুধু নিরীহ ছাগবলি দিয়েই স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটনের ব্যর্থ চেষ্টা করেছি, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সে কৃপাণ একবারও উত্থিত হয়নি। শক্তিপূজার ভণ্ডামী করে আমরা সুরাপানের অসুস্থতায় শক্তির শ্রেষ্ঠতম মাতৃরূপকে অবমাননা করেছি, লাঞ্ছিতা করেছি মাতৃজাতিকে ; পাষণ্ডস্পর্শে অপবিত্র বোধ করেছি নারীর হিরন্ময়ী মূর্ত্তি! একবারও ভেবে দেখিনি,—নারীই জাতীয় জীবনে জননীরূপিনী ঈশ্বরী! তাঁর হিরণ্ময় দেহ-বিগ্রহ কোনো সময়েই অপবিত্র হয় না, কোনো কারণেই অশুচি হয় না! পরপুরুষস্পর্শের গ্লানি থেকে তাকে মুক্ত করে আবার পূজার বেদিতে ফিরিয়ে আনবার কোন প্রয়াস কি করেছি আমরা? তাদের আর্ত্ত অসহায় চীৎকারে বিশ্বেশ্বর বধির না হয়ে আর কতক্ষণ পারবেন? স্বাধিকারকে সঙ্কুচিত করতে করতে যে নির্ব্বোধ জাতি

অভিমানের অহঙ্কারে টিঁকি আর ভাতের হাঁড়ীতেই নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ করে ফেললো, আপনার নির্য্যাতীতা কন্যাবধূকে আপদ-বালাই ভেবে অসহায় রেখে পালিয়ে গেল, সেই ভীরু কাপুরুষদের আবার ভগবান কোথায়? তাদের দুহাতের ক্ষীণতম শক্তিতে শুধু ঢাকঢোলই বাজে, বিশাল মানব-লোকের বিরাটায়ত দেবতার একটি পদঙ্গুলিও সে বাদ্যে চঞ্চল হয় না। ছুঁৎমার্গে ক্লেদাকীর্ণ, কাপুরুষতায় কলঙ্কিত, সমাজদেহরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে স্বেচ্ছায় ছেদন করার মত নির্ব্বোধ, আর নিজেকে নির্ল্লজ্জভাবে গণ্ডীবদ্ধ করার মত স্বার্থান্ধ ধর্ম্মে ভগবান নেই,—তিনি থাকতে পারেন না। যে ভগবানের পদপ্রান্তে অনন্ত মানবস্রোত প্রণত হয়ে প্রবহমান হচ্ছে, যে ভগবানের পুণ্যময় পীঠস্থানে মানুষ ব্যতীত আর কোনো জাতি নাই, যেখানে পৌরুষমহিমা প্রজ্বলিত হোমশিক্ষা বিস্তার করে নারীর সতীত্ব, আর্ত্ত-অসহায়ের নিরাপত্তা, আশ্রয়প্রার্থীকে রক্ষা করতে সমর্থ, তিনি সেখানেই প্রস্থান করেছেন।

কিন্তু ভাবলে কি হবে! অবন্তীকে আবার সেই পূর্ব্বাশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে অসংখ্য অনন্ত বাধা। এই হতভাগা দেশে এমন কোন লোকই নাই যে অবন্তীর সব জেনেও তাকে সতী, বধূ, গৃহিনী এবং সহধর্ম্মিণীরূপে শ্রদ্ধা করতে পারে! কেন নাই? পৃথিবীর সব দেশে যা আছে, এই হতভাগ্য দেশে তা নেই কেন? শাস্ত্র?—না, শাস্ত্রের অনুশাসন যুগেযুগে পরিবর্ত্তনশীল,—তাছাড়া, উদার শাস্ত্রকার কোথাও বলেন নি যে আপনার অর্দ্ধঅঙ্গ ছেদন করে তোমাকে ক্ষয়গ্রস্থ হতে হবে। শুধু দেশাচার গণ্ডীবদ্ধতার নির্লজ্জ স্বার্থপরতা আর সুলভ নারীজীবনের উপর নির্ম্মম উদাসিতা! এর কি প্রতিকার নেই? কোনো পরশুরাম কি রুদ্র কুঠার হাতে এদের অহঙ্কার চূর্ণ করতে পারেন না আর একবার! কোনো বোধিসত্ত্ব, কোনো কৃষ্ণ-চৈতন্য কি আর একবার এসে এদের চৈতন্য দান করে জাতিত্বের গণ্ডীটা ভেঙে দিয়ে

যেতে পারেন না—কোন কল্কি কি অগ্নিময় কষা হাতে এসে জাতটাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন না,—ওরে রাজযক্ষ্মাগ্রস্থ মৃত্যুপথযাত্রী,—বাঁচবার উপায় কর!

চিন্তার সমুদ্র চঞ্চল হয়ে উঠছে মন্থন-তরঙ্গের ঘনায়মানতায়, এই চঞ্চল সমুদ্র মন্থনে প্রথম ওঠে হলাহল, তারপর ওঠে অমৃত, তখন হয় দেবাসুরে সংগ্রাম; সে সংগ্রামে সুকৌশলে অমৃত পান করে দেবতারা অমর হয়ে তবে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। পৃথিবীরও প্রত্যেকটি স্বর্গরাজ্য, স্বরাটরাজ্য প্রতিষ্ঠার এই-ই ইতিহাস। সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হয়েছে—গরল উঠেছে,—বিভেদ, বিদ্বেষ, বিষ, দলগত অবিবেচনার স্বার্থবুদ্ধি, তোষণ পোষণ নীতির পঙ্কিলতা দেখা দিয়েছে রাষ্ট্রে, সমাজে ব্যক্তিতে। এই মহাসমুদ্র মন্থন আর কতদিন চলবে কে জানে! অমৃত কবে উঠবে, কারো জানা নেই—তবু নেতৃত্বের মন্দার-পর্ব্বত ঘূর্ণিত হোক, গণমনের বাসুকীনাগ বিষ বর্ষণ করুক, আর সেই বিষ পান করুন আসমুদ্র হিমাচলের মানবদেবতারূপী নীলকণ্ঠ!

কিন্তু বিষপানের যোগ্যতা যে এই হতভাগ্য মানবদেবতা আজ হারিয়েছে! আজ কি আর আছে সে নীলকণ্ঠ! আজও কি সে শ্মশানে শিব রূপে অবস্থান করে, সকল মানুষের একত্বের আশ্রয় দান করে, সকলকেই এক মানবধর্ম্মে, জীবনধর্ম্মে এবং মৃত্যুধর্ম্মে দীক্ষিত করে! সকলকেই সমান অংশে বণ্টন করে দিতে পারে অমৃতভাণ্ড! না—তা যদি পারতো, তাহলে এই দুর্ভাগা দেশের এতখানি দুর্ভাগ্য হোত না। নীলকণ্ঠ নাই, বৃথাই উচ্ছ্বাসের চীৎকার! কিন্তু তাঁকে আনতে হবে; ঐ ব্যর্থ চীৎকার স্বার্থকতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এক শুভ প্রভাতের অরুণালোকে! সেদিনের দেরী আছে, কিন্তু আসবেই সে দিন! ঘুমন্ত অবন্তীর মাতৃত্ব-ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত মুখের পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে মা তাকিয়ে দেখেন আর ভাবেন এই সব কত কি!

আজ শচীনবাবু তাঁকে ডেকে গোপনে বললেন—আর মাস দুয়েকের মধ্যেই এসে যাবে। ছেলেটাকে মেরে ফেলাই কি ঠিক করেছেন! সকলকে মরা ছেলে হয়েছে, বললেই ল্যাঠা চুকে যায়।

চমকে উঠলেন সন্তানবতী জননী। মেরে ফ্যালা কি কথা! উঃ! মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো তাঁর প্রায় একমিনিট; সামলে বললেন,

—না—অতটা প্পাপ আমি করতে পারবো না! তাকে কোথাও রেখে দেবার ব্যবস্থা করুন। দোহাই আপনার মেরে ফেলবার কথা বলবেন না।

—কিন্তু ও ছেলে তো আপনাদের কেউ নয়! ওর উপর মমতা…

—ছেলে সব সময়ই ছেলে! সন্তান সব সময়ই স্নেহভাজন। আমাদের ব্যাধিগ্রস্থ বিধানের জন্য তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিতে হবে, এতো বড় পাপ আমার সহ্য হবে না। আপনি তাকে কোথাও সরিয়ে দিন!

—ভারী মুস্কিলের কথা! আচ্ছা, আমি দেখি আরেকটু চেষ্টা করে!

শচীনবাবু চলে গেলেন। মুখখানা অপ্রসন্ন! মা বুঝলেন, এই ব্যবস্থা করতে শচীনবাবুকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। বন্ধুত্বের মর্য্যাদা শুধু নয়, প্রচুর অর্থের পুরস্কারও লাভ হবে ভেবে শচীনবাবু একাজে হাত দিয়েছেন। কিন্তু হত্যার পথে মা তাঁকে কিছুতেই যেতে দেবেন না! মা জানেন, এ বিষয়ে অবন্তীর কোনো ইচ্ছা বা অনিচ্ছা নাই, থাকলেও সেটা সে প্রকাশ করে না। কিন্তু মা নিজে যখন সঙ্গে রয়েছেন, তখন অবন্তীর সন্তানকে তিনি বাঁচাবেনই! একদিন হয়তো সেই সন্তান এই দুর্ভাগা দেশে রুদ্ররূপ পরিগ্রহ করবে। হয়ত তার পাশুপতাস্ত্রে পৃথিবীর পরিণতি হবে অন্যরকম। জীবন—যে জীবন অত দুঃখের মধ্যেও আসছে দেহবন্দী হয়ে, তাকে মুক্তির মোহানায় নিয়ে যাবার অমন কদর্য্য কার্য্যের অধিকার তাদের কারোরই নেই। যে আসছে, তার আসার সার্থকতা তিনিই জানেন, যিনি তাকে পাঠিয়েছেন! তিনিই দেখবেন তাকে। মা পুনর্ব্বার বধির বিশ্বেশ্বরের চরণ স্মরণ করলেন!

অবন্তী অকস্মাৎ এসে করুণকণ্ঠে বললো,—ভারী মুস্কিল হোল মা ওরা সব শুধুচ্ছে, তোমার বর একবার দেখতে আসছে না কেন? চিঠিপত্র দেয় না কেন? বরের নাম কি? থাকে কোথায়?

—হুঁ, তাতো বলবেই বাছা! তুই কি বললি?

—বরের নাম তো বলতে নাই; তাই বললাম না। আর বললাম, থাকে কলকাতায়। বাবা প্রতিদিন চিঠি লিখছেন, তাই সে আর লেখে না! কিন্তু সবাই কেমন সন্দেহ করছে যেন। কেউ বিশ্বাস করে না কথা আমার।

—যা বলেছিস তাই বলবি সবাইকে। এক রকমই বলিস যেন!

বলে মা নিশ্বাস ছেড়ে মন্দির দর্শনে বেরুলেন। মিথ্যার অগাধ সমুদ্রে শয্যা রচনা করেছেন তিনি, মন্দির দর্শনের পুণ্য কি সেখানে পৌঁছুবে? তবু উনি অভ্যাসবশতঃ চলতে লাগলেন। প্রতিদিনের মত স্নান পূজা শেষ করে বেরিয়ে আসছেন, অকস্মাৎ সিদ্ধেশ্বর!

—সিধু না? —মা বিস্ময়ের সঙ্গে শুধুলেন!

—হ্যাঁ কাকীমা, আমি! আপনি এখানে কোথায়!

—বিশ্বেশ্বর দর্শনে এসেছি বাবা! তুমি কোথায় রয়েছ?

কোথায় রয়েছে, সিধু জানাবে না। বলা নিষেধ আছে। অথচ মিথ্যা কথাও বলে না সে আজকাল। তাই দুইদিক বজায় রেখে বলল,—আমি তো ঘুরে ঘুরেই বেড়াই! কাকাবাবু, অবন্তী এরা ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ! অবন্তী এখানেই আছে। এসো একবার আজ বিকালে! ঠিকানা রাখ!

ঠিকানা মা দিলেন ওকে। সিধু বললো—আজ আর যাওয়া হয়ে উঠবে না। কাল পরশু যাব একদিন।

মা বাড়ী ফিরে অবন্তীকে সিধুর কথা বলতেই বুদ্ধিমতী অবন্তী মুহূর্তে এক মতলব খাড়া করে নিল মাথার মধ্যে। বলল,—আমার বরের নাম

যদি ওরা শুধোয় মা, তো বলো—সিদ্ধেশ্বর। আর সিধুদা যেদিন সেদিন ওকেই আমার বর এসেছে বলে চালিয়ে নিও! আমি সিধুদা আপত্তি করবে না।

মা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন অবন্তীর কথা শুনে। বললেন,—কিন্তু সিধু যদি স্বীকার না করে?

—ও করবে স্বীকার। আমি জানি! দৃঢ়স্বরে বললো অবন্তী। তার নারী-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে সিধুর বিদায়কালের মূর্ত্তিটা হয়তো আঁকা ছিল! সিধু তাকে চায়, এ খবর অবন্তীর ভালই জানা—কিন্তু অবন্তী এখনো ছেলেমানুষ, রূপগর্ব্বিতা, ধনবতী তরুণী, সে জানে না যে সিধু যে-অবন্তীকে চেয়েছিল, এ অবন্তী সে-অবন্তী নয়। তবু মা কিছুই প্রতিবাদ করলেন না আর। অবন্তী যদি সিধুকে তার বর সাজতে রাজি করতে পারে তো মন্দের ভাল।

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে পৌঁছাল নবকিশোর! বৃষ্টিটা জোর নেমেছে; আলোক প্রথমটা ভেবেছিল, বৃষ্টির জন্যই কিশোরকে ছুটতে হয়েছে, কিন্তু যে-কোনো সামান্য কারণ, অর্থাৎ বৃষ্টি, বজ্রাঘাত বা মৃত্যু-মহামারীর ভয়ে ছুটে আসবার ছেলে নয় কিশোর। মৃত্যুকে ওরা উপহাস করে সকল সময়। ওরা জীবনের রুদ্র রূপ।

আলোক কিছু প্রশ্ন করবার পূর্ব্বেই কিশোর ছেঁড়া কাপড়ের তলা থেকে বের করলো দুটো শিশি ওষুদে ভর্ত্তি, ছ'টা ইন্‌জেক্‌শন এম্পূলওয়ালা একটা কাগজের বাক্স আর একবোতল হরলিকস্! আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই পঁচিশ ত্রিশ টাকার ওষুদ কিশোর কিনলো কি করে! আলোক বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, কিশোর নিজেই বললো—উ শালালোগ বহুৎ

বহুৎ রূপেয়া কামায়া বাবুসাব্—'ঘিলিক মারকিট্' কিয়া পাঁচ বরষ উসি ওয়াস্তে কুচ ভাগা লিয়া হাম্।

—চুরি করলে কিশোর?

—আরে! চুরি কাহে বোলতা বাবুজি! ইস্ হরলিকস্‌কো দো-আড়াই রূপেয়া দাম থা আভি পাঁচ রূপেয়া লেতা হ্যায়। চুরি হাম কিয়া; না' উন্ লোক কিয়া? আউর দেখিয়ে, ঝুমনিকো ওয়াস্তে দাওয়াই মেরা দরকার! আপ কিয়া কহতে হ্যাঁয়—উ'লোক সব জিতা রহেগা আউর হামলোক মর যায়েগা?

খুবই সত্যিকথা—ওরা বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে বিপুল অর্থের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নিয়ে; আর এরা, এই হতভাগ্য পথচারীর দল মরে যাবে? কেন? কোন্ অপরাধে? এই অসাম্যের, এই অত্যাচারের প্রতিকার করাকে এরা চুরি বলে না—বলে ন্যায্য অধিকার! কিন্তু আলোকের মনটা তবু খচ্ খচ্ করছে! শিশির ওষুদ ঢেলে সে ঝুমনীকে খাওয়ালো—কিশোর বলে চলেছে:

—রাতমে দাওয়াই দেনেকোবাস্তে জানলা একঠো থাকে না বাবুজি! উস্ জানলা দিয়ে দাওয়াই চাইলাম হামি,পিস্‌কিপ্‌স্‌সন ভি দিলাম—উ কম্পাণ্ডারসাব্ দাওয়াই দিতে আসলো, তেঁইশ রূপেয়া মাংগলো! হামি বললাম,—দাওয়াই সব ঠিক ঠিক দিয়েছেন তো! উ বললো—হ্যাঁ! আর মেরা পাশ একঠো আজাদহিন্দ ওয়ালা নোট থা—ওহি দে কর তুরন্ত দাওয়াই সব হাত বাড়ায়ে লে কর ভাগলাম—এক লম্বা ছুট,—ব্যস্!

—নোটখানা দেখে সে চিনতে পারলো না?

—উ বাবু দারু পিয়া রহা; ভাবলে কি, হামি একশো রূপেয়াকা নোট্ দিয়েছি। খুচরা ভাঙানি আনতে গিয়ে বাত্তিমে দেখবে—ইস্ বখৎ হাম ছুট লাগায়া।

অতি কদর্য্য চুরি—আলোক অস্বস্তি বোধ করছে। ওর মুখ পানে তাকিয়ে কিশোর কি যেন বুঝে বললো—হাম বহুৎ খারাপ কাজ কিয়া বাবুজি! বহুৎ খারাপ কাজ! লেকিন, দাওয়াই না মিলবে তো ঝুমনি মরে যাবে! উসকো মরণকো লিয়ে কোন্ দায়ী হ্যায়? কোন্ বিচার করতা হ্যায়?

আলোকের অন্তর আলোড়িত হয়ে উঠলো কথাটা শুনে! এই নিরাশ্রয় নিঃসম্বল মানুষগুলোর মৃত্যুর জন্য সত্যি কে দায়ী? কে বিচার করে এদের অপমৃত্যুর? অনশন মৃত্যুর? কেউ নেই; তাই এরা আপনাকে বাঁচাবার তাগিদে শ্মশানচারী রুদ্র দেবতার আশ্রয়ে এসেছে, যেখানে, বিষ এবং অমৃত, ভাল এবং মন্দ, চন্দন এবং ভস্ম, পাপ এবং পুণ্য, জীবন এবং মৃত্যু, অভিশাপ এবং আশীর্ব্বাদ, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি সব একাকার—সব একমূল্যে ক্রীত এবং বিক্রীত হয়—অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের কোন প্রশ্নই জাগে না কারো মনে। ওর চিন্তিত মুখের পানে চেয়ে কিশোর আবার বললো—আউর দেখিয়ে বাবুজী, হামি উসকো নোট তো দিয়া—আউর নেতাজী সুভাষ চন্দর যব আ-যায়েগা তব্ উস্‌কো ভাঙনি রূপেয়াভি মিল যায়গা! বহুৎ জাস্তি রূপেয়া মিল যায়েগা! উস রোজ্ হামভি নেতাজীকো কহেঙ্গে, মেই বড়া দুঃখমে আপকো নোট দিয়া রহা।

আলোক যেন চমকে উঠলো! এ চিন্তা কিশোরও করে তাহলে? কোন্ এক শুভ প্রভাতে ভারতের গৌরবসূর্য্য জাতীয়-জীবনের পূর্ব্বাকাশে উদিত হয়ে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছেন তাঁর পুনর্দর্শনের আকাঙ্খায় এই পথচারী সর্ব্বহারা কিশোর বালকও অর্ঘ্যপাত্র হাতে দণ্ডায়মান! সে সরলমনে বিশ্বাস করে, নেতাজী আসবেন, তাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে—রাস্তায় কুড়িয়ে-পাওয়া কাগজের নোট আবার সোনার টাকায় রূপান্তরিত হবে!—কিন্তু সেদিন কি সত্যি আসবে?

—তিনি কি সত্যি আসবেন কিশোর ?

—হ্যাঁ; উ তো জরুর আ-যায়েঙ্গা ! আপ্ দেখ লিজিয়ে……

কিন্তু ঝড়ের বেগে এসে পড়ল কল্যাণী ! এদের দলের একটা মেয়ে ! আলোক তাকে আগে দেখেনি ; বাঙালীর মেয়ে বয়স বছর বারো ! গায়ের ছেঁড়া ফ্রক, তার নীচে পাতার ঠোঙায় ভর্ত্তি খাবার।

—ক্যা ল্যায়া কল্যাণ ?—কিশোর শুধুলো।

—অনেক খাবার ! বিয়ে ছিল এক বাড়ীতে নেবুতলায় ! নে, খা সব !

আলোক বসে দেখতে লাগলো। কুড়িয়ে-পাওয়া খাবার খেয়ে উদর পূর্ণ করবার পশ্বাচার- সাধনায় সে এখনো দীক্ষিত হয়নি—সিদ্ধি তো বহু দূরে ! কিন্তু এরা, বাকি ছেলেমেয়েগুলো আনন্দের আবেশে খেতে আরম্ভ করলো ! কল্যাণী অত্যন্ত ক্লান্ত, বলল,—সারা বিকাল থেকে জলে ভিজে দাঁড়িয়ে ছিলাম—আমি খেয়েছি ! তোরা সব খা, আমি

আলোকের কাছেই এক পাশে শুয়ে পড়লো সে ! কিন্তু তার ফ্রকটা ভিজে ! কিশোর উঠে ফ্রক্ খুলে নিল, একটা শতছিন্ন মলিন কাঁথা, হয়তো শ্মশানের থেকেই কুড়িয়ে পাওয়া—গায়ে দিল কল্যাণীর। কল্যাণী এত বেশী ক্লান্ত ছিল যে দুমিনিটেই ঘুমিয়ে গেল। আলোক ওর পাশে বসে বসে দেখতে লাগলো শ্যামবর্ণ মেয়েটি ! বাঙালী মেয়ের শান্ত শ্রী তার মুখে ! ভাল করে পরিষ্কার করে বার করলে ও যে-কোনো ভদ্র পরিবারের কন্যা বলে পরিগণিত হতে পারে ! ওর শ্রী এবং সৌন্দর্য্য ক্ষয় হয়ে গেছে পথে পথে ঘুরে—তবু ওকে দেখলেই বোঝা যায়, —ওর জীবনকণায় আভিজাত্যের ছাপ আছে—সংস্কৃতির দীপ্তি আছে।

—একে কোথায় পেয়েছো কিশোর ?—আলোক শুধুলো।

ওর এই অহেতুকে কৌতুহলের কোনই অর্থ হয় না, সে জানে; তবু প্রশ্নটা করে ফেললো। কিশোর ডালমাখা লুচিটা খেতে খেতে বললো।

—উ বহুৎ ভালা ঘরকা লেড়কী আছে বাবুজী—হুম! উস্‌কো মাইকো গুণ্ডালোক ছিনাকে লেকর ভাগা রহা। দশবিশ রোজ বাদ উস্‌কো মাই যব্ ঘুমকে ঘরমে গিয়া তব্ উসকো-সামনেকো দরয়াজা বন্ধ হো গিয়া; ব্যাস্! মাইজী আউর কিয়া করে……চলা আয়া রাস্তামে। লেকিন্ ইস্ লেড়কীকোবাস্তে বহুৎ রোতা রহা! আউর দুচার রোজ বাদ বাদ যাতাভি রহা আপনা ঘরকা নগিজ! একরোজ ইস্ লেড়কী আপনা মাইকো দেখ কর ছুট চলা আয়া, মাইভি উসকো লেকর হিঁয়া ভাগা! ব্যস! থোড়া রোজ বাদ ফিন গুণ্ডালোক ঐ জরুকো লেকে ভাগা… ই লেড়কী বহুৎ রোতা রহা! হামি লোক কিয়া করে, উসকো লে আয়া হাম্‌লোককো পাশ…তিন বরয হো গিয়া!

—ওর বাপের বাড়ী তোমরা চেন না?

—নাহি। উ ভি ঠিক ঠিক কহনে সেক্‌তা নেহি! হামি লোক বহুৎ খুঁজিয়াছে। মিলা নেহি।

হায়রে দুর্ভাগা মেয়ে! আলোক মেয়েটির মুখপানে চেয়েই রয়েছে। বড্ড মমতা জাগছে ওর অন্তরে। অবন্তীর সঙ্গে মুখখানার হয়তো কোথাও মিল আছে। কিম্বা আলোকের মন কল্পনা করছে অবন্তীর সঙ্গে এঁর সাদৃশ্য! কিন্তু কোথায় সেই হতভাগী মা! কেন তাকে ঘরে নেয়নি তার স্বামী-শশুর-শাশুড়ি?—ভাবতে গিয়েই আলোকের অন্তর জ্বালা করে উঠলো। যে কাপুরুষের দল গুণ্ডার হাত থেকে নিজের পত্নীকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়নি, তারাই আবার ধর্ম্মের নাম নিয়ে, জাতিতত্ত্বের অহঙ্কারে সেই অসহায়া মা'র গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে! এই জাতিত্ব, এই ধর্ম্ম উচ্ছন্ন যাবে না তো যাবে কে? যাক্—নতুন ভাবে গড়ে উঠুক

আবার নব ধর্ম্ম, নব জাতিত্ব, নূতন সমাজ! এতে যদি হিন্দু ধর্ম্ম লোপ পেয়ে যায়, তাও ভাল,—মানবধর্ম্ম বেঁচে থাকবে! কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের কিছু মাত্র দোষ নেই—সে ধর্ম্ম বারম্বার বলপূর্ব্বক অপহরণ, ধর্ম্মান্তরিত করণ, বলপূর্ব্বক বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারের পরও নারীকে সমাজে নিষ্কলঙ্করূপে ফিরে আসবার ব্যবস্থা দিয়েছেন! সেই ব্যবস্থার কথা রুদ্রস্বরে ঘোষণা করে গেলেন দেবমানব কত কত মহাত্মা, অথচ কাজে তার কতটুকু হচ্ছে! হিন্দু সমাজ কত সহজে নিজের ব্যূহ থেকে অর্দ্ধাংশ শক্তিকে বের করে দিতে পারে! কিন্তু তাকে ফিরিয়ে স্ব-শক্তি বৃদ্ধির উপায় জানা থাকা সত্বেও তার প্রয়োগ ক্ষমতা নেই! আশ্চর্য্য এই জাতির ধর্ম্মানুশাসনের ভ্রান্তবুদ্ধি! এমনি করে নিজেকে ক্ষয় করতে করতে সে আজ সংখ্যালঘুত্বের ক্ষীণতম বিন্দুতে পরিণত হোল,—এদিকে ঋজু, তীক্ষ্ণ শলাকার মত বেড়ে যাচ্ছে অন্যান্য সম্প্রদায়। পরিচয়ে, প্রচারে, আপনাপন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচণ্ড প্রয়াস প্রত্যেক ধর্ম্মেই আছে, নাই শুধু হিন্দুর! সে-চেষ্টা করলেও নাকি দূষনীয় হবে,—আশ্চর্য্য যুক্তি!

এই যে কল্যাণীর মা,—সে এখন কোথায়, কোন ধর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে? এমন শত শত কল্যাণীর মা করছে—হিন্দু কি আজো তা ভেবে দেখবে না! আরো কতকাল সে মৃত শবদেহের নির্ব্বিকারত্ব রক্ষা করবে?

আলোকের চিন্তাটায় আঘাত করে কিশোর বললো,—শো যাইয়ে বাবুজি! বাত্তি তো খতম্ হো-গিয়া!

আলোক দেখলো—মোমবাতিটা শেষ জ্বলা জ্বলে নিবে গেল! অন্ধকার!—আলোক কল্যাণীর কাছেই শুয়ে পড়লো। কিশোরের দল কে কোথায় শুয়েছে এর মধ্যে, অন্ধকারে আলোক কিছুমাত্র জানতে পারলো না! বাইরে বিরামহীন বৃষ্টি, আর ভিতরে ঝুমনীর রোগ-যাতনামাখা করুণ কণ্ঠস্বর! আলোকের ঘুম আসা প্রায় অসম্ভব!—

চিন্তার সমুদ্রে-ডোবা আলোকের কাণে ঝুমনীর আর্ত্তস্বর বারম্বার আঘাত করছে! ঝুমনীকে একবার দেখা উচিৎ! ওষুধও দিতে হবে, কিন্তু এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে ঝুমনীর বিছানা পর্য্যন্ত যাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিশোর কোথায় শুয়েছে জানা নেই আলোকের! সে ডাক দিল, —কিশোর—কিশোর!

—হ্যাঁ, বাবুজী!—বলে তৎক্ষণাৎ কিশোর উঠে পড়লো—ক্যা হায়?

—ওষুধ খাওয়াতে হবে; আলোটা জ্বালো একবার!

কিশোর মুহূর্ত্ত মধ্যে উঠে দেশালাই জ্বেলে বিড়ি ধরালো, আধপোড়া বিড়িটা কাণেই গোঁজা ছিল ওর। সেই দেশলাইয়ের শিখাতেই আর একজনের কাঁথার এক টুকরো ন্যাকড়া ছিঁড়ে নিয়ে জ্বালিয়ে বললো, —আইয়ে বাবুজি; দিজিয়ে দাওয়াই!

আলোক উঠে গিয়ে দেখলো ঝুমনীকে। কিশোর ইতিমধ্যে আরো কয়েকফালি ন্যাকড়া জুড়ে দিয়ে ধুনি জ্বেলেছে এই সাধন-ক্ষেত্রে। সত্যিই আলোকের মনে হোল—এই মহা শ্মশানে মহাযোগী মানব-মহারুদ্র যেন সাধনায় নিরত;—বিকারহীন, বীতরাগ-দ্বেষভয়! উর্দ্ধরেতা! ঝুমনীকে ওষুধ খাওয়াতে খাওয়াতে সে ভাবলো—একে বলে জীবন-সাধনা, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে জানা—মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে জানা! আলোকও এই সাধনায় নামবে। প্রায় নেমে এসেছে; দু'আনা এখনো আছে পকেটে; সেটা সকালেই খরচ করে দিয়ে আলোক নিশ্চিন্ত হয়ে জীবনের রুদ্ররূপের আরাধনা করবে।

বৃষ্টিটা জোরে এল। কিন্তু রুদ্রের রূপ দর্শন অত সহজসাধ্য নয়, কঠিন কঠোর এ সাধনা, বন্ধুর এ পথ, ভয়ঙ্কর এ পথের বিভীষিকা!

আলোক সকালে ঝুমনীকে ওষুধ খাইয়ে তার ট্যাঁকের দু-আনায় মুড়ি আনিয়ে সাতজনে ভাগ করে খেল—এক মুঠি ভর্ত্তি করেও সবাই পেল না। তারপর আলোক বেরুলো পথে।

সারাদিন পথে পথেই; কিন্তু সন্ধ্যায় উদর-অগ্নি যখন অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করলো তখন রুদ্রের সাধনা করা তার আর হয়ে উঠলো না। জীবনকে যারা সমাজ-সংসারে বন্ধ দেখেছে, মনকে যারা ভালোমন্দ এবং শুচি অশুচির বিচারাধীন করে গড়েছে, বুদ্ধিকে যারা সৎ এবং অসৎ বুদ্ধিতে ভাগ করতে শিখেছে, রুদ্রের সাধনা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে কেমন করে? রুদ্রের দেখা পেতে হলে বিষ এবং অমৃত, চিনি এবং চিতাভস্ম, খাদ্য এবং অখাদ্য, বিষ্ঠা এবং চন্দন ভেদ রাখলে চলবে না। মনকে সম্পূর্ণরূপে ঘৃণাহীন, বুদ্ধিকে পরিপূর্ণভাবে সদসৎ-বিবেচনাহীন এবং অহঙ্কারকে একান্তভাবে আয়ত্তিভূত না করতে পারলে রুদ্রের সাধনা করা সম্ভব নয়।

আলোক একটা ডাষ্টবীনের ভেতর পড়ে থাকা পাকা পেঁপের অংশটি কিছুতেই খেতে পারলো না—এমন কি, পথচারীর দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত হয়ে সেটুকু তুলে নিতে পর্য্যন্ত পারলো না;—অফিসের একজন কেরাণী খাবার কিনে খেতে খেতে দেড়খানা লুচি সমেত ঠোঙাটা ফেলে দিলেন ফুটপাতের নীচে, আলোকের কাছ থেকে এক হাত তফাতে; আলোক কুড়ুতে পারলো না—ওদিককার ফুটপাত থেকে বাচ্চা একটা ভিখিরী ছেলে এসে সেটা নিয়ে খেয়ে ফেললো!

ওরাই জীবনরুদ্রের শব-সাধক!

আলোক ভাবতে ভাবতে ফিরে এলো ঝুমনীর রোগশয্যাপার্শ্বে। আধখানা লেবু, দুটো পেয়ারা আর গোটাকয়েক আঙুর রয়েছে; রামধনিয়া হাওয়া করছে ঝুমনীর মাথায়। আর কেউ তখনো ফেরেনি! আলোক রামধনিয়াকে সরিয়ে ঝুমনীর সেবার ভার নিল।

কিশোরের দল ফিরলো রাত নটার পর—কিশোর ফিরলো প্রায় এগারটায়। এসেই বললো—দিনভর কুছ খায়া নেহি বাবুজি ?

—না।

—ও আচ্ছা, খা জাইয়ে!—কিশোর কতকগুলো খাবার বের করলো ময়লা কাপড়ের পুঁটলী খুলে—লুচি, শিঙ্গাড়া, রসগোল্লা, সন্দেশ—কিন্তু তার অনেকগুলি অর্দ্ধভুক্ত; অবশ্য গোটাও আছে, কিন্তু বেশ বোঝা যায়, কোনো ধনীগৃহের উৎসব-ভোজের উচ্ছিষ্ট ওগুলি। আলোক তার মনকে হাজার বুঝিয়েও ওর এক কণাও স্পর্শ করতে পারলো না; অথচ সে বারম্বার নিজেকে বলতে লাগলো—'এরা খাচ্ছে ঐ খাবার! এরাও মানুষ, এরাও তার দেশবাসী ভাই, এরাও জন্মভূমিমাতার সন্তান! আলোক কেন খেতে পারবে না! সভার মাঝে বক্তৃতা দিতে উঠে যে নেতা-আলোক সিংহগর্জ্জনে ঘোষণা করেছে 'দেশের প্রত্যেকটি মানুষ তার ভাইবোন' সে-আলোক এই জীবন-দেবতার রুদ্ররূপ দেখেনি···। হয়তো কোনো নেতাই দেখেননি; তাই তাঁদের নেতৃত্ব এদের কাছে ব্যর্থ হয় বারম্বার। এই জীবন-দেবতার সাধনভূমি থেকে যেদিন নেতা-রুদ্রের আবির্ভাব হবে সেই দিন দেশমাতৃকা সত্যিকার নেতা লাভ করবেন। উচ্চ রাজনীতির উড়োজাহাজে আকাশ ভ্রমণের আনন্দের সঙ্গে সৌখীন রাজনীতি চর্চ্চায় জীবনদেবতার পূজা দেওয়া যায় না—জীবন-দেবতার পূজা দিতে হলে জীবনকে সর্ব্বাগ্রে চিনতে হয়, তাকে লাভ করতে হয়! আলোক কিন্তু তা পেরে উঠছে না; নিরুপায় হয়ে সে ঝুমনীর জন্য বহু কষ্টে আহরণ বা অপহরণ করা দু'একটা ফল খেয়েই কাটায়। সারাদিন বসে ঝুমনীর সেবা করা এবং আড্ডা পাহারা দেওয়া ছাড়া কিশোর ওকে দিয়ে আর কোনো কাজ করানোর যোগ্যতা খুঁজে পায় না ওর মধ্যে। বলে,—আপ লিখা পড়া জানা আদমি, নেই শেকেঁগা।

অলোক নিরুপায় হয়ে ঝুমনীর খাদ্যে ভাগ বসাতে বসাতে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলো এই জীবনের শয়নে এবং পরিধানে, কিন্তু খাদ্যে এখনো সে সিদ্ধিলাভ করতে পারে নাই!

নতুন একটা কাজের প্রেরণায় উৎপলা অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ওর মা-বাবার সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করেও সে তার উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য দৃঢ় পদে এগিয়ে যেতে লাগলো—এবং বিশ্বমাতাও তার এই মাতৃমঙ্গলকার্য্যে সাহায্য করতে লাগলেন। এই বৈচিত্রময়ী পৃথিবীতে মানুষ কতখানি নীচে নেমে গিয়েও আবার কিরকম উগ্র গতিতে উপর দিকে উঠতে পারে, উৎপলা তার জ্বলন্ত উদাহরণরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তুলবে নিজেকে। সে ভাবে—পাঁকে তার জন্ম, অন্ধকার জল-তল ভেদ করে তাকে উঠতে হচ্ছে হাজার শৈবালের বাধাবিঘ্ন ঠেলে, কিন্তু তার গতি উর্দ্ধদিকে; সূর্য্যের জীবন-রশ্মি লাভের আশায় সে আপন অন্তরের রক্তশতদল বিকশিত করে দেবে—তার গন্ধ এবং মধু ছড়িয়ে দেবে সে সারা বিশ্বে।

উৎপলা সে-রাত্রি অনেক চিন্তা করে তার বিশেষ পরিচত কয়েকজন ধনকুবের বন্ধুর নামের তালিকা প্রস্তুত করলো। সকালে উঠেই তাদের একজনকে ফোন করলো। তিনি উৎসাহ দিলেন উৎপলাকে এবং সাহায্যও করবেন, বললেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি কিন্তু উৎপলাকে নিরুৎসাহ করে দিলেন; বললেন যে এদেশে ওরকম কাজ করা এখন অসম্ভব, বাধা বিস্তর এবং বিপদও অনন্ত। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি উৎপলাকে এত বেশী উৎসাহ দিলেন যে উৎপলার সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়ে গেল। ইনি বিশেষ ধনী এবং বর্ত্তমানে আরও অনেক ধন অর্জ্জন করেছেন; সে-ধনের পরিমাণ

এত বেশী যে টাকাকে ইনি আজকাল খোলামকুচির মত দেখতে পারেন। ইনি বললেন, এই পরম মঙ্গলকর কার্য্যের জন্য তিনি একখানা ভাল বাড়ী দেবেন, নগদও মোটা অঙ্কের টাকা দেবেন এবং আরও যে-কিছু সাহায্য দরকার, সবই করতে প্রস্তুত থাকবেন।

উৎপলা অপর বন্ধুদের তখন আর ফোন না করে এই ব্যক্তিকেই বৈকালে তার সঙ্গে দেখা করতে বললো। ইনি আসবেন বললেন, এবং যথা সময় এলেনও। খবর পেয়ে উৎপলা বাইরের ঘরে তাঁকে বসতে বলে প্রসাধনে লিপ্ত হোল; অসুখের পর আজই প্রথম; কিন্তু প্রয়োজন—তার কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রসাধনের প্রয়োজন আছে। ঐ ভদ্রলোকটিকে উৎপলা ভালই চেনে; এমন কি, যে বাড়ীখানি উনি দেবেন বলেছেন, কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত সেই বাড়ীতেও অনেকবার উৎপলা গিয়েছে। সে বাড়ীটা সহরের জল-আলো-যান-বাহন ইত্যাদির আবেষ্টনেই পড়ে অথচ সহর থেকে একটু দূরে—উৎপলার কাযের সম্পূর্ণ উপযুক্ত; তাই উৎপলা এ সুযোগ হারাতে চায় না।

সজ্জা শেষ করে উৎপলা এসে নমস্কার করলো। প্রতিনমস্কার করে উনি বললেন—উঃ! এতো রোগা হয়ে গেছ!

—হুঁ—উৎপলা কথাটা অগ্রাহ্য করবার জন্যই বললো হেসে, —বড্ড ভুগলাম এই অসুখটায়। তবে দুদিনেই সেরে যাব······যা খাচ্ছি আজকাল! আপনি কেমন আছেন?

—ভালই; আমি তো মোটা হচ্ছি দিন দিন।······উনিও হাসলেন।

অতঃপর উৎপলার কাজের প্লান সম্বন্ধে কথা হোল। উৎপলা তাঁর নিকট-সান্নিধ্যে ঘনিয়ে এসে বললো তার কাজের পরিকল্পনা। ভদ্রলোক অত্যন্ত খুসী হয়ে বললেন,—হ্যাঁ, এ একটা কাজের মত কাজ! ও বাড়াটা আমার আর কোনো কাজে লাগছে না! বিক্রী করলে লাখ

থানেক টাকা হোতে পারে কিন্তু টাকার এমন কিছু দরকার এখন নাই আমার; তোমার কাজেই বাড়ীটা লাগুক!

—পরে আবার কেড়ে নেবেন নাকি?—উৎপলা হেসে উঠলো!

—আরে ছিঃ! কি যে বলো! তবে হ্যাঁ, আমার একটি সর্ত্ত আছে! তোমার আশ্রমের নাম হবে আমার মা'র নামে। মা'র স্মৃতির উদ্দেশেই ওটা দিচ্ছি আমি।

উৎপলা প্রায় পুরো দু' সেকেণ্ড চেয়ে রইল ওঁর মুখের পানে। মা'র স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যেই তাহলে ইনি বাড়ীখানা দিচ্ছেন! আশ্চর্য্য! এঁর মধ্যেও মাতৃস্মৃতিরক্ষার জন্য তাগিদ আছে নাকি? আছে! আপন জননীকে সম্মান করে না, শ্রদ্ধা করে না, পূজা করে না অন্তরের নিভৃততম মন্দিরে, এমন শয়তান তাহলে নেই দেখছি ভগবানের রাজ্য! ভগবান কি সেরকম জীব সৃষ্টি করতে অক্ষম নাকি!—কিন্তু উৎপলা সে সব কথা গোপন করে শুধুলো,

—বেশ, তাই হবে! বাড়ীটা চিরদিনের জন্য দান করুন। আপনার মা'র নামটি কি?

—বিশ্বেশ্বরী! এই হতভাগাকে সাত বছরের রেখেই তিনি স্বর্গে গেছেন। গভীর রাত্রে তাঁর ছবিখানি দেখি আর মনে হয়,—বাবার কাছে কঠোর নির্য্যাতন ভোগ করতে করতে তিনি কি ভাবে জীর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন—তখনো আমাকে বুকে চেপে বলতেন······তোর বাবা রাক্ষস, তুই যেন মানুষ হোস!

—মা'র কথাটা রেখেছেন আপনি নিশ্চয়ই!······উৎপলা কি ব্যঙ্গ করলো? কিন্তু উৎপলা কথাটা বলেই তাঁর মুখের পানে চেয়ে দেখলো, ঐ পরম পাষণ্ড লোকটার দুটি চোখই ছল ছল করছে, করুণ কোমল হয়ে এসেছে তাঁর ঠোঁটের হাসি!

—না পলা, মা'র কথা আমি রাখতে পারি নি! মানুষ আমি হইনি। হয় তো এ জীবনে হতে পারবো না। কিন্তু তুমি যাদের মানুষ করবে, তাদের মধ্যে কেউ যদি সত্যি মানুষ হয়, আমার মা তৃপ্ত হবেন।

উৎপলা ওঁর উচ্ছ্বাসে আর কোনোরকম আবিলতা ছড়ালো না। সে বেশ বুঝলো, এই অতি পাষণ্ড মানুষগুলোর জীবনেও এক আধটা দুর্ব্বল স্থান এমনি থেকে যায়, যেখান দিয়ে ভাঙ্গন ধরে তাদের হিমাচলের মতন অহংকারের পাহাড়ে। সে একটু থেমে বলল—'বিশ্বেশ্বরী নিকেতন'—নাম দিলে কেমন হয়?

—চমৎকার!—ঐ নামই রাখ। প্রাথমিক খরচপত্র চালাবার জন্য আমি কিছু নগদ টাকাও দিচ্ছি, আর আমার একটি আত্মীয়ার ছেলেকেও আমি দেব তোমার নিকেতনে। তুমি কি এরমধ্যে দু' একটা ছেলে মেয়ে পেয়েছ?

—না—আপনার সেই আত্মীয়ার ছেলেটিই প্রথম আশ্রিত হবে।

—সে এখনো পৃথিবীর আলোকে আসে নি ········বলে হাসলেন ভদ্রলোক।

উৎপলা ইঙ্গিতটা বুঝেও বুঝলো না, মাথা নামিয়ে বললো,

—বেশ! এর মধ্যে আমি দু'একটা ছেলে মেয়ে যোগাড় করে এই সপ্তাহেই কাজ আরম্ভ করে দেব! চলুন, আপনার বাড়ীর কন্‌ডিসান একবার দেখে আসি।

দুজনে মোটরে উঠে গেল ওরা সহরের উপকণ্ঠের সেই বাগানবাড়ীতে। এখন আর এ যায়গা বিশেষ নির্জ্জন নেই। চারদিকেই নতুন বস্তি হয়েছে; নতুন বাড়ী উঠছে; কাজেই এটাও এখন সহরের মধ্যেই পড়ে গেল। বেশ বড় দোতালা বাড়ী। বাগান এবং ছোট একটি পুকুরও

আছে এখানে। উৎপলা বাড়ীটায় ঢুকে ঘুরে ঘুরে সব কামরাগুলো দেখলো! এই বাড়ীতে পূর্ব্বে সে যখন এসেছে, বিলাসিনী বেশেই এসেছে—বাড়ী ঘোরার নোংরামী সেদিন তার কাছে কল্পনারও অতীত ছিল। উৎপলার মনে পড়লো, এই গৃহের কত উৎসব, নৃত্যগীত এবং আনুষঙ্গিক কতকিছুর কথা—সেই অভিশপ্ত গৃহে আজ জগতের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান, মাতৃমঙ্গল অনুষ্ঠিত হবে। এই পুণ্যকাজ এতখানি পাপে-ভরা ঘরে ঠিকমত সফল হবে কি? কে জানে। কিন্তু উৎপলা এতবড় সুযোগ হারাতে চায় না। সমস্ত দেখেশুনে সে আগামী কাল থেকেই কাজ আরম্ভ করে দেবার কথা বললো ওঁকে। উনিও সম্মতি দিলেন এবং নাম-রেজেষ্টারী থেকে আর আর যা কিছু করবার দরকার সমস্তই করিয়ে দেব—বললেন। উৎপলা মহোৎসাহে বাড়ী ফিরে এলো ওঁরই মোটরে। বাড়ী এসে শয্যায় শুয়ে ভাবতে লাগলো—উৎপলা ওঁকে শিকার ধরেছে, নাকি সাহায্য করছে ওর জননীর স্মৃতি-রক্ষার কজে! কিন্তু উৎপলা ভাবলো, উপায় যাই হোক, কাজের উদ্দেশ্য মহৎ—অতএব সে এগিয়ে যাবে।

মহা উৎসাহে চলতে লাগলো 'বিশ্বেশ্বরী নিকেতনের' কাজ। নাম জারী থেকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, প্রচার-কার্য্য, লিফ্‌লেট বিলি এবং খাতাপত্র তৈরী হয়ে গেল চার-পাঁচ দিনের মধ্যে। ছোট ছোট খাট্‌ বিছানা, মশারী এবং দোলানা-খেলনাও এসে গেল। উৎপলা ঐ বাড়ীরই দোতালায় একটি ছোটমত ঘর বেছে নিয়ে নিজের অফিস করলো—নীচে তলায় সাধারণ অফিসঘর হোল। দরকার হলে উৎপলা যাতে রাত্রেও এখানে থাকতে পারে, তারও বন্দোবস্ত করা হোল। উৎপলা উচ্চশিক্ষিতা

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে প্রতিষ্ঠান চালাবার মত সমস্ত শক্তিই তার আছে, কাজেই বন্দোবস্তও ত্রুটিহীন হয়ে উঠতে লাগলো! কিন্তু দরকার টাকার—প্রচুর টাকা দরকার এরকম একটা প্রতিষ্ঠান চালাবার জন্য এবং দরকার প্রপাগেণ্ডার। উৎপলা একা সামলে উঠতে পারবে না, ভেবে কয়েকজন ত্যাগী এবং শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলাকর্ম্মীর আবশ্যকতা সে অনুভব করছে। একজন ধাত্রীও রাখা হয়েছে মাইনে দিয়ে!

তাছাড়া সব থেকে বেশি দরকার ছেলেমেয়ের, যাদের জন্য এই নিকেতন খোলা হোল; অথচ এই সাতদিনে একজনও আসে নি। উৎপলা জানে, এই হতভাগ্য দেশে বহু নারীই বিপন্না হয়, কিন্তু নিরাপদ. আশ্রয়ে আপন সন্তানকে রক্ষা করবার মত মনোবৃত্তি এখনো তাদের জাগে নি…… লাজভয়, কুলভয়, সমাজভয় তো আছেই, সকলের উপর ভয় তাদের সেই অনাকাঙ্খিত সন্তানকেই। কে জানে, সেই সন্তান কবে তার কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করবে, কবে জাবালা পুত্র সত্যকামের মত আপন পিতৃপরিচয় জানতে চাইবে—কবে সে আপন সমাজ সংসারে প্রবেশের দাবী জানিয়ে নালিশ করবে তার জন্মদাত্রীর উপর?

কোনো নারীই এ পর্য্যন্ত উৎপলার আশ্রমে সন্তান দান করে গেল না। অথচ কত সন্তান রাস্তায় রাস্তায় পড়ে থাকে না খেয়ে মরে; নামগোত্রহীন হয়ে যদিবা সে বাঁচে তো চোর-ডাকাত-গুণ্ডা হয়ে ওঠে। এইতো সহজ সত্য!

যে আত্মীয়ার ছেলেকে উৎপলার সাহায্যকারী এখানে দেবেন বলেছেন, এখনো নাকি সে পৃথিবীর আলোকে আসে নি। ছেলেটি যে ঐ ভদ্রলোকেরই বিশেষ কেউ, এ বিষয়ে উৎপলার সন্দেহমাত্র নেই। মাতৃস্মৃতি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভদ্রলোকের অপর একটি উদ্দেশ্যও রয়েছে! তা থাক। তবু উনি প্রথমেই উৎপলাকে এভাবে সাহায্য না করলে উৎপলা এগুতেই পারতো না।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই উৎপলা এই সব কথা ভাবছিল, অকস্মাৎ নীচে থেকে খবর এলো, তার সাহায্যকারী ভদ্রলোক এসেছেন। উৎপলা ত্বরিতে যথাসাধ্য সাজপোষাক করে মুখখানা একবার আয়নায় দেখে নীচে নামলো। গিয়ে দেখলো, ভদ্রলোক দরজায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু তার মোটরে একটি মেয়ে······তরুণী। যন্ত্রণায় মুখখানা বিকৃত দেখাচ্ছে, তথাপি বোঝা যায়, মেয়েটি পরমাসুন্দরী। উৎপলা নিমেষে বুঝলো ব্যাপারটা, কথা না বলেই ধীরে এসে মোটরে উঠে বসলো মেয়েটির পাশে; বললো—ভয় কি? এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে!

. ভদ্রলোক কোন কথা না বলে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন। গাড়ী চললো নিকেতনের দিকে। ফুল স্পিড্···তবু যেন পথ ফুরোয় না; মেয়েটি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে। উৎপলা তা'কে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিচ্ছে। কোনোরকমে এসে পৌছালো ওরা বিশ্বেশ্বরী নিকেতনে এবং তার কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরেই মেয়েটি প্রসব করলো একটি মেয়ে···সুন্দর ফুটফুটে পদ্মকুঁড়ির মত মেয়েটি···যেন জীবনের আনন্দ-সঙ্গীত!

এই নিকেতনের প্রথম প্রাণ-পঙ্কজ ও, প্রথম জীবনাঙ্কুর! উৎপলা শঙ্খধ্বনি করে ওর অভ্যর্থনা জানালো—বললো,—তোমার জন্ম যে পঙ্কেই হোক, তুমি স্বয়ং পঙ্কজ!

ভদ্রলোক মেয়েটিকে নামিয়ে দিয়েই চলে গেছেন, উৎপলার বাড়ীতে তিনি খবর দিয়ে যাবেন যে উৎপলা আজ রাত্রে ফিরবে না! কিন্তু উৎপলা ভাবছে, উনি অত তাড়াতাড়ি না গেলেও পারতেন! অমন করে ছুটে পালিয়ে যাবার কি অত আবশ্যক ছিল! হয়তো ছিল ওঁর আবশ্যক! উৎপলা আর বেশি কিছু না ভেবে নবজাত শিশুটির যত্নে মনোনিবেশ করলো; কিন্তু তার বিশ্লেষাত্মক মনশ্চেতনা নিবিড় হয়ে উঠতে লাগলো বারম্বার শুধু একটা চিন্তাকে কেন্দ্র করে···ঐ ভদ্রলোক পালিয়ে গেলেন; হয়তো আত্মরক্ষা করলেন—কিন্তু এই

সন্তানের সত্যকার জনক কে, তা এই পৃথিবীর একটিমাত্র জীবিত প্রাণীই সঠিকভাবে অবগত আছে; সে এই সন্তানের জননী! আর যিনি অবগত আছেন তিনি জীবনের রুদ্ররূপী মহাকাল, ধ্বংসের প্রলয় শূল হাতে নিয়ে যিনি অবিশ্রান্ত সতর্ক প্রহরায় তৃতীয় নয়নের অগ্নি জ্বেলে বসে থাকেন; সৃজন, পালন এবং লয়ে যাঁর সমান ঔদাসিন্য, অথচ সৃজন, পালন এবং লয়ের যিনি এক এবং অদ্বিতীয় কর্ত্তা! তাঁর জ্বলন্ত চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঐ ভদ্রলোক কোথাও পালাতে পারবেন না, কোথাও নিষ্কৃতি পাবেন না। সে বিচারালয়ে ব্ল্যাক্-মার্কেট অচল, ঘুষ অকেজো, মিথ্যা অস্তিত্বহীন।

উৎপলার নিজের কথা মনে হোল; একদিন সেই মহাবিচারশালায় তারও ডাক পড়বে! তাকেও প্রশ্ন করা হবে, কে সেই সন্তানের পিতা উৎপলা যার গলা টিপে ···! উৎপলা কচি মেয়েটার গা মুছতে মুছতে তার গলায় হাত দিয়ে আঁৎকে উঠলো যেন! না-না, এ তার কেউ নয়, কিন্তু সে,—সেই গলায় নীল দাগওয়ালা ছেলেটা যদি এখনো বেঁচে থাকে কোনো রকমে এবং কোনো রকমে যদি উৎপলার এই 'নিকেতনে' এসে উপস্থিত হয় কোনো দিন···উৎপলা কি তাকে চিনতে পারবে না? গলার সে দাগটা কি মিলিয়ে যাবে? কে জানে, উৎপলা ঠিক জানে না, ওরকম অবস্থার দাগ কতদিন স্থায়ী হয়! তবু উৎপলা আশা করতে পারে, সে একদিন আসবে! কিন্তু তার আসবার কোনোই সম্ভাবনা নেই;—উৎপলার বেশ মনে আছে, বর্ষারাত্রির দুর্য্যোগের মধ্যে নিজের হাতে উৎপলা সেই শিশুকে ডাষ্টবীনে ফেলে দিয়ে এসেছে—মৃত!

মৃত! না, জীবন অমৃতময়—আত্মা অবিনশ্বর। এক দেহ থেকে সে মুক্ত হোতে পারে, কিন্তু অপর দেহে সে আবার বন্দীত্ব গ্রহণ করবে। জীবনের এই বন্ধন শাশ্বত। জীবন কখনও মরে না—সে অমর। কিন্তু তাতে উৎপলার কি? ঐ দেহটা মাত্র উৎপলা তাকে দান করেছিল, সে

অনন্ত জীবনস্রোত অবলম্বন করেই উৎপলার দেহে এসে বন্দীত্বের বন্ধনে দেহাশ্রিত হয়েছিল, তার সেই দেহের লয়ের সঙ্গেই উৎপলার সঙ্গেও সব সম্পর্ক তার চুকেছে। তার কথা ভেবে আর লাভ কিছু নেই; কিন্তু তার অসংখ্য দেহধারণের একটা দেহ সে উৎপলার কাছ থেকেই পেয়েছিল, একথা তো সে তার স্মৃতিতে গেঁথে রেখে দিতে পারে! তাহলে তার স্মৃতির মালায় উৎপলাও থেকে যাবে—থেকে যাবে উৎপলার ভ্রূণহত্যার দানবীয় পাপ—মহাবিচারক তাকে ক্ষমা করবেন না সেদিন।

কিন্তু উৎপলা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে; অসংখ্য শিশুকে সে বাঁচাবে। অসংখ্য মাতাকে সে এই মহাপাপ থেকে রক্ষা করবে। মহাকাল কি তার জন্য কোনো পুরস্কারই দেবেন না উৎপলাকে?

লজ্জায় হেঁটমাথা করেই এ কয়দিন কাটাচ্ছে আলোকনাথ। সমস্তক্ষণ ঝুননীর রোগশয্যা-পাশে বসে থাকা, তাকে ওষুধ খাওয়ানো এবং তার জন্য অতিকষ্টে সংগৃহীত সামান্য ফলমূলের সিংহভাব গ্রহণ করে সবল সুস্থ জীবনকে রক্ষা করা নিশ্চয়ই লজ্জার বিষয়। ঝুমনীর খাদ্যে ভাগ বসাতে ওর কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই, কিন্তু এদের আনীত অন্য কোন খাদ্যই সে গ্রহণ করতে পারে না। জীবন-রুদ্রের এই মহাসাধনায় আলোক বুভুক্ষা-সিদ্ধ হতে তো পারলোই না, গলিত-গন্ধযুক্ত বা উচ্ছিষ্ট খাওয়াতেও সিদ্ধ হোল না। নওলকিশোরের দল ওকে কৃপার চক্ষে দেখে, আর বলে—ভদ্দর আদমী, আপ্ কভি ইয়ে চিজ্ খানে নাহি সেকেগা। ওহি-ফল-উল থোড়া খা জাইয়ে।

লজ্জায় মাথাটা আরো নুয়ে পড়ে আলোকের। নিজের পরিধেয় বস্ত্রের মালিন্য চোখে পড়ে; জীর্ণতা ওকে জানিয়ে দেয়, রাস্তার ভিক্ষুকের

পর্য্যায়ে সে নেমে গেছে; ওদের ছিন্নকন্থার আবরণে আর দুর্গন্ধময় আবেষ্টনে আলোক বারবার অনুভব করে, রুদ্রের সাধনায় সে ব্রতী হয়েছে। কিন্তু কবে সিদ্ধিলাভ হবে তার? সেদিন জোর করে এক টুকরো লুচি খেয়েই সে বমি করে ফেললো, পেটে যন্ত্রণা হতে লাগল তার। অতি কষ্টে সামলে সে কিশোরকে বললো,

—আজ তো ঝুমনী কিছু ভাল আছে, আমি একটু বাইরে গিয়ে দেখি, যদি কিছু হয়।

কিশোরের দল আবাহন বা বিসর্জ্জনের কোনো মন্ত্রই জানে না। ওরা শুধু বলল—বহুৎ আচ্ছা!

আলোক বেরিয়ে পড়লো, হাতে ছেঁড়া গামছায় বাঁধা তিনখানা বই নিয়ে। এই বই ক'খানিই তার পরম সম্পদ। এদের সে একদণ্ডের জন্যও ছাড়ে না! ঝুমনীর শয্যা-শিয়রে এরা ওর মনের খোরাক যুগিয়েছে, এবং রাত্রে উপাধানের কাজ করেছে। আলোক বেরিয়েই কিন্তু বুঝলো, পথচারীরা ওকে ভিখারীরও অধম মনে করছে, এড়িয়ে চল্‌ছে, যেন অস্পৃশ্য, অশুচী, কুৎসিৎ রোগগ্রস্থ মানুষ ও!

একটা কলের জলে হাতমুখ ধুলো, মাথার চুলগুলো জল দিয়ে একটু বসিয়ে নিল, তারপর আবার চললো। কিন্তু কোথায় যাবে? পথের খাবার কুড়িয়ে সে এখন খেতে পারে, কারণ এখন আর সে ভদ্র নেই, লজ্জার বালাই নেই আর, কিন্তু রুচি যে হচ্ছে না! মুখের কাছে ধরলেই মনে পড়ে যায় হাজার রোগের বীজাণুর কথা,—হাজার রকম কদর্য্যতার কথা। অথচ খিদেতে আলোকের নাড়ীগুলো পর্য্যন্ত জ্বলছে। মহা-বুভুক্ষার এই তো অনলশিখা,—এই তো রুদ্রের হোমানল! যে-কোন দ্রব্য এতে আহুতি দেওয়া যেতে পারে—বিষ্ঠা পর্য্যন্ত! কিন্তু আলোকের মন সাধনার ততখানি উচ্চস্তরে কেন উঠছে না! উঠছে না কেন?

রাগ হয়ে গেল আলোকের নিজের উপর। সে ঐ আগুনকে আরো জ্বলতে দেবে, আরো প্রবল করে দেবে, তার পর যা-কিছু হাতের কাছে পাবে, তাই দেবে ওতে আহুতি। আলোক হন্‌হন্‌ করে চলতে লাগল। মিশন রো—ডালহাউসী স্কোয়ার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট্‌, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড্‌—ক্রমাগত ঘুরছে আলোক—ঘুরছে; খাবারের গন্ধ নাকে লাগে, যেন অমৃতের আস্বাদ মনে হয়—চোখে দেখলে মনে হয়, সে স্বর্গের পথে চলতে চলতে উর্ব্বশী-মেনকাকে দেখছে! ওঃ! খাবারের মধ্যে এতো রূপ আর এতো রস আছে, কে জানতো! কিন্তু ওসব দেবভোগ্য বস্তু, আলোকের পুণ্যফলে শুধু দর্শনটুকুই দান করছে, আর ঘ্রাণ। ভোগের অধিকার নেই আলোকের। ঐ দুর্ব্বার ভোগস্পৃহাকে জয় করে আলোক রুদ্রের সাধনা করবে—ডাষ্টবীনের খাবার কুড়িয়ে খাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ডাষ্টবীনগুলো শূন্য না হলেও খড়কুটো আর ভাঙ্গা কাচের টুকরোতে ভর্ত্তি! খাদ্যকণাও নেই; কুড়ি পাঁচশটা ডাষ্টবীন খুঁজেও আলোক কিছুই পেল না। ডাষ্টবীনের উপরে চৌকোনা ফ্রেমের গায়ে সুন্দর সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে সে সুন্দরী সিনেমা তারকার সুন্দর মুখের ছবিতে থুতু ফেলতে গেল……গলা শুকিয়ে গেছে; লালারস বেরুলো না।

আবার হাঁটছে আলোক, ভাবছে, কেন সে থুতু ফেলতে গিয়েছিল ঐ ছবিটাতে এখুনি? এ কোন্‌ ধরণের মনোবৃত্তি? তার সাধনার অনুকূল না প্রতিকূল এই প্রয়াস? ঐ সিনেমা তারকার উপর তার রাগ না বিরাগের চিহ্ন ওটা? ঐ তারকাটি মানুষকে অভিনয়-রস পরিবেশন করে, বেশ আছে; খায়, শোয়, ঘুমোয় আপন সুকোমল শয্যাতলে। জীবনকে ওরা রুদ্রের প্রলয়ালোকে দেখতে পায়নি; ওরা জীবন-দেবতার নিষ্করুণ ভ্রূকুটির অগ্নিময় পথ চেনে না—ওরা আনন্দের পথে, আরামের পথে যাত্রা করেছে কোন্‌ দেবতার সাধনার জন্য, কে বলতে পারে! কিম্বা ওদের পথও এমন কঠিন, বন্ধুর, ভ্রূকুটি কুটিল, অগ্নিক্ষরা পথ? ওদের উপর

ঈর্ষা পোষণ করবার কোনো কারণই আলোকের নাই।—হয়তো ওরা আলোকের থেকেও ভয়ঙ্কর পথের যাত্রী···রুদ্রের পথের পথিক!—আলোক ফিরে গিয়ে সেই ডাষ্টবীনটার কাছে আবার দাঁড়ালো। ছেঁড়া গামছার কোণা দিয়ে মুছে দিল ছবির ধূলোগুলো। বেশ সুন্দর মুখ মেয়েটির, অবন্তীর মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে যেন। আলোক একটা চুমা দিতে গেল ছবির মুখে,—তৎক্ষণাৎ হেসে উঠলো আপনার মনে। তার অন্তরের এই চুম্বন-স্পৃহার দেবতা কে? কে এই আকাঙ্ক্ষার প্রেরয়িতা! তিনিও কি রুদ্র? আশ্চর্য্য! প্রায় তিনদিন উপবাসী, অনিদ্রায় অবসন্ন একজন পথের ভিক্ষুকের প্রাণেও সুন্দর মুখে চুম্বন-পিপাসা উদগ্র হয়? এর থেকে বেশি আশ্চর্য্য কী আছে আর? এ কোন্ দেবতার লীলা?—মনে পড়ে গেল,—

'পঞ্চশরে দগ্ধ করে
করেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছে তারে ছড়ায়ে—।'

ইনি রুদ্র নন—রুদ্রকোপানলে ভস্মীভূত পঞ্চশর। আলোকের উপাস্য দেবতা রুদ্র—পঞ্চশরের সান্নিধ্যে এসে আলোক তার উপাস্যের অবমাননা করবে না। আলোক আবার ত্বরিতপদে হাঁটতে লাগলো! ইডেনগার্ডেন সংলগ্ন বড়লোকদের একটা ক্লাব—আলোক দেখতে পেল, একঝুড়ি আবর্জনা ফেলে দিয়ে গেল কাছের ডাষ্টবীনটায়। সে গিয়ে হাঁটকাতে লাগলো। একটা জ্যামের ভাঙা টিন। ওর ভিতর কিঞ্চিৎ জ্যাম আছে নিশ্চয়—সাগ্রহে কুড়িয়ে নিয়ে আলোক গঙ্গার ধারে এলো। একটা কাঠি কুড়িয়ে টিনের ভেতর থেকে বের করলো এক ড্যালা জ্যাম; কালো বিশ্রী,—নির্ব্বিচারে সেটুকু মুখে পুরে দিল আলোক, রুদ্র-দেবতার ক্ষুধানলে পরমাহুতি। কিন্তু হায়রে, অনভ্যস্ত দেবতা গ্রহণ করলেন না সেই হবি। দুর্গন্ধে নাড়ী পর্য্যন্ত মোচড় দিয়ে উঠলো আলোকের—পেট

কিছু নাই বলে বমি তার হোল না, কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণায় আলোক বসে পড়লো জলের ধারে। প্রায় পনর মিনিট লাগলো তার সামলাতে!

এই সাধনায় সে সিদ্ধিলাভ করবে? অসম্ভব! নিজের উপর নিদারুণ ঘৃণায় আর ক্রোধে অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠলো ওর! নাঃ, এ সাধনা সে ত্যাগ করবে—এখুনি! দেখতে পেল, অল্প দূরে বাঁধানো ঘাটে একজন লোক শ্রাদ্ধ করছে; মন্ত্র পড়াচ্ছে পুরোহিত! আলোক আস্তে হেঁটে এসে দাঁড়ালো ওখানে। শুনতে লাগল মন্ত্র :—

'ওঁ নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া—'

আমাদের শ্রাদ্ধে তাহলে নিরাহার, পাপী, ধার্ম্মিক সকলের জন্যই ব্যবস্থা ছিল—বাঃ! আবার শুনতে লাগলো :—

'ওঁ যে বান্ধবা বান্ধবাঃ বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥
অতীত কুলকোটিনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥'

এতো এতো সুন্দর ব্যবস্থা ছিল ভারতের ঋষিযুগে! আজো তার ভগ্নাবশেষ এই সব মন্ত্রে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—অতীতের কোটিকুল, সপ্তদ্বীপের অধিবাসী, পাপী, ধার্ম্মিক সকলের খাদ্যের জন্যই চিন্তা করতো যে ভারত-সন্তান, তারা আজ নিজের উদর পূরণের ব্যবস্থা করতে একান্ত অক্ষম। সোনার দেশ শোষিত হতে হতে সীসকে পরিণত হয়েছে। সীসকে নাকি বিষ আছে—সে-বিষ মানুষকে কুষ্ঠগ্রস্থ করে। সেই কুষ্ঠই হয়েছে আজ! সীসার অক্ষর সাজিয়ে সাজিয়ে চলছে আজ মিথ্যার প্রপ্যাগেণ্ডা। সত্যস্বরূপ শব্দব্রহ্ম বন্দী হয়েছেন তেল-কালির কদর্য্য প্রচার পত্রে—তাই 'মাদার ইণ্ডিয়া'র আবির্ভাব ঘটে, জনযুদ্ধের জয়-শঙ্খ বাজে এবং কালোবাজার মানুষের মৃত্যু-পথ আলো করতে পারে। পারে

আরো অনেক কিছুই করতে; এই সীসক বড়ই সাংঘাতিক বস্তু—কিন্তু আলোক ভাববার সময় পেল না—শ্রাদ্ধকারী প্রণাম সেরে উঠে গেলেন। কয়েকটা কাক পরিত্যক্ত পিণ্ডকণার লোভে এসে বসেছিল, আলোকও ছিল সেই আশায়, কিন্তু আশ্চর্য্য, লোকটা সব পিণ্ডগুলো গুটিয়ে গঙ্গার কাদাজলে ফেলে দিলেন। কাকরা তাও খাবে—আলোক যদি কাক হতে পারতো!

কিন্তু কাক, চিল বা শৃগাল হওয়া তো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন নয়? আলোক প্রশ্ন করলো নিজকে ধমক দিয়ে উচ্চৈস্বরে। গঙ্গার হাওয়ায় ওর গলার আওয়াজটা ধ্বনিত হয়ে উঠলো 'ক্যাহুয়া' রবে। দিনে দুপুরে শৃগাল ডাকছে ভেবে পুরোহিত ঠাকুর এদিক-ওদিক চাইছেন নাকি? আলোক হাসলো। গলার আওয়াজটা ওকে শৃগালের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছে, পেটের খিদেটা কেনই বা পারবে না ওকে শৃগালে পরিণত করতে! মানুষ মৃত শবদেহ ভক্ষণ করে, মূত্র-বিষ্ঠাও হয়তো ভক্ষণ করে;—বামাচারী কাপালিক, পশ্বাচারী তান্ত্রিক, পিশাচ-সাধক পৈশাচিক তো এই ভাবেই রুদ্রের সাধনায় রত থাকেন—সাধনায় সিদ্ধিও লাভ করেন তাঁরা—আলোকও করবে!

কাদা থেকে কুড়িয়ে কয়েকটা তণ্ডুলকণা সংগ্রহ করলো সে—ধুলো জলে বেশ করে, তারপর খাবে—এই খাদ্যে তারও অংশ আছে,—'নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ—' যে নিরাহার, তার জন্যও এই খাদ্য নিবেদিত হয়েছে—আলোক চালের দানাগুলি মুখে দিল। চিবুচ্ছে সেই তোলা-খানেক চাল—শ্রাদ্ধকারী ভদ্রলোক ওর কাণ্ড দেখে একটা ডবল পয়সা ছুড়ে দিয়ে চলে গেলেন—বাঃ! আলোক কুড়িয়ে নিল, যেন সিদ্ধিই

লাভ করেছে সে এমনি আগ্রহভরে। মুখের কাদামাখা চালগুলো আঁর রুচি হোল না—থু থু করে ফেলে দিয়ে সে সটান চলে এলো কিছু কিনতে। দুই পয়সায় কি আর কিছু কেনা যায় আজ কাল? চানা ভাজা কিম্বা ছাতু কিম্বা বাদাম ভাজা পাওয়া যেতে পারে; আলোক কোনটা কিনবে?

ভাবতে ভাবতে ডালহাউসীর জেনারেল পোষ্টাফিসের কাছে লালদীঘিতে এসে পড়লো। আনারস কাটতে কাটতে ফিরিওয়ালা তার পাতা-শুদ্ধ মাথাটা দিল ফেলে, আলোক টপ্ করে কুড়িয়ে নিল। বেশ রুচিকর খাদ্য; যতটুকু ছিল তাতে আনারস, আলোক পরমানন্দে তাই খেল একখানা বেঞ্চে বসে বসে! পয়সা দুটো জমাই থেকে গেল এবেলা।—শুয়ে পড়লো বেঞ্চে।

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়—ঘুম ভেঙে উঠে বসলো আলোক! গামছা বাঁধা বই কখান মাথায় দিয়ে শুয়েছিল, সেইটি কোলে নিয়ে বসলো—বেশ লাগছে। একটি বৃদ্ধ আসছে এই দিকে; লম্বা, পিট্‌কে মত, দাঁতগুলো প্রায় পড়ে গেছে, বয়স অন্ততঃ পঞ্চাশ—পরণে বেয়ারার কোট্—বুকে কোম্পানীর নাম লেখা।

—দেশলাই আছে হে?—প্রশ্ন করলো আলোককে!

—না!

—নাঃ—কেন? বিড়ি খাও না?

—না!

—ওঃ! সিগরেট খাও তো? লাটের জামাই—দাও শালাইটা দাও একবার—বলে লোকটা আধপোড়া বিড়ি বার করলো একটা। আলোক অবাক হয়ে বললো আবার—বলছি তো, দেশালাই নাই! পেটে ভাত যোটে না, আবার সিগরেট—হুঁ!

—তাই নাকি! তুমি তো আমার স্বগোত্র দেখছি! কদ্দুর পড়েছো! বি, এ?

আলোক চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। লোকটি আবার শুধুলো
—এম্-এ—?

—হ্যাঁ—কিন্তু পড়া দিয়ে কি হবে? চাকরী আমি খুঁজছি না। আমি দেখতে চাই, এই দেশের মানুষের জীবন ক্ষুধা-রুদ্রের সাধনার পথে কতখানি এগিয়েছে!

—বটে—বটে!—মাথাটা সারাদিনের খাটুনিতে বেশ পরিষ্কার নেই ভায়া—তোমার কথাটা বুঝতে পারতাম যদি একটান ধোঁয়া পেটে পড়তো—চলো না, ঐ দিক পানে দেখি!

আলোকের হাত ধরে সে উঠালো—আলোকও উঠলো। লোকটি আবার বলল,—ক'দিন খাওনি?

—দিন তিনেক হবে।

—মাত্তর? তাহলে এই সবে আরম্ভ! আচ্ছা, এসো!

লোকটি হাঁটতে লাগলো—আলোক চলছে ওর পাশে। একটা বিড়ির দোকানের গায়ে নারকেলের দড়িজ্বলা আগুনে আধপোড়া বিড়ি ধরিয়ে লোকটি বললো—আমি চক্কোর্ত্তি—জাতে ব্রাহ্মণ, বয়সে বড়ো এবং রোজগারে ষোল টাকা সওয়া বারো আনার লোক—তোমাকে 'তুমি' বলে ডাকবার আমার অধিকার আছে—কেমন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!—আলোক সবিনয়ে জানালো হেসেই। নিশ্চয় 'তুমি' বলবেন।

—চোদ্দ সালের জেল, তারপর আবার একুশ সালে, তার পর তৃতীয় দফায় একত্রিশ সালে ঘুরে এলাম—তখন গান্ধীজীর নন্‌কো-আন্দোলন কিঞ্চিৎ থিতিয়ে এসেছে—আর কলকাতা কর্পোরেশনে জেলফেরত লোকদের চাকরী হচ্ছে। শরীরটা প্রায় ভেঙে এসেছিল—দেশসেবার পুরস্কার স্বরূপ ভাল চাকরা একটা পেয়ে যেতে পারি, ভেবে ধরণা দিলাম সেঁখানে। চাকরীটা আমার নিশ্চয়ই হবে—সামান্য বেয়ারাগিরি চাকরী—

কারণ আমার বিছে তখনকার সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত ; কিন্তু হোল না—সে চাকরী হোল সেই ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবুর শালার চাকরের সম্বন্ধীর ছোট ভাইয়ের ; কর্ত্তাদের জয়গান করে বেরিয়ে এলাম। তারপর পূরো সাতটি দিন কলের জল আর কুকুরের খাদ্যের অংশ কেড়ে কেটে গেল। অষ্টম দিনে এক বিলিতি কোম্পানীর অফিসের সামনে বাবুদের জন্য বয়ে নিয়ে যাওয়া টিফিনের মিছিল দেখছি, জিভ্ দিয়ে জল পড়ছিল কি না, মনে নাই—হঠাৎ একজন বেয়ারা—সেখানকার হেড্ জমাদার—সদয় হয়ে বললো—নোকরী মাংতা হ্যায় ?

—হ্যাঁ জি !—বলতেই সে আমাকে বড়বাবুর কাছে নিয়ে গেল। বললাম, লেখাপড়া মাত্র নামসই জানি—জেল ঘোরার কথা বললাম না—দেশসেবার পুরস্কার এদেশে ঘৃণা-লাঞ্ছনা—এই কদিন ঘুরেই সেটা চিনেছিলাম ! চাকরী হোল ; বাবুদের টিফিন বয়ে আনা, চা দেওয়া, তামাক সাজা, আর খোসামুদী করা। মাইনে সাড়ে সাত টাকা। যুদ্ধের বাজারে সেই মাইনে, মাগ্‌গি ভাতা ইদ্যাদিতে ষোল টাকা স' বারো আনায় উঠেছে—প্রায় ষোল বছর হোল !

আলোক অবাক হয়ে শুনছিল ! বহুবাজারের একটা গলিতে পৌঁছালো ওরা ! দোতালা বাড়ীর নীচে মোটর গ্যারেজ। মোটরও আছে, তার পাশেই হাত দুই খালি জায়গায় একখানি চ্যাটাই—, তেলচিটে একটি বালিশ।

—বসো ভাই—বলেই লোকটি বেরিয়ে গেল ! পাঁচ মিনিটের মধ্যে মাটির ভাঁড়ে এক ভাঁড় জল এনে বলল—হাতমুখ ধোও। আমি চা আনি। আমার এখানে সব সাত্ত্বিক বস্তু ভাই ; সব দেশী এবং খাঁটী মাটি মার দান। মাটির গেলাস-বাটি আর গাছের পাতা আমার আসবাব ! সব সাত্ত্বিক !

নিঃশব্দে হেসে আলোক মুখটা ধুলো।—চক্কোর্ত্তি ইতিমধ্যে বাইরে দুখানা

ইট-পাতা উনুনে মাটির একটা মালসা বসিয়ে দিয়েছে—কাঠের কুচোর জ্বাল দিচ্ছে জলে। চা হোল, কাছের দোকান থেকে দু' পয়সার মুড়ি এনে তার অর্দ্ধেক আলোকের হাতের মুঠিতে দিয়ে চক্কোর্ত্তি বললো—পান করো—'সঙ্গে আছে সুধার পাত্র, অল্প কিছু আহার মাত্র—আর একখানি...'

—'ছন্দ মধুর' নয়, রুদ্রছন্দের কাব্য আছে আমার কাছে—আলোক চায়ের খুরিটা হাতে নিতে নিতে বললো—সে কাব্য জীবনের যন্ত্রণায় করুণ নয়, জীবনের সাধনায় কঠোর—তীক্ষ্ণ তরবারির মত! তামাক সাজার বেয়ারা হয়ে আমি বাঁচতে চাইনে চক্কোর্ত্তিদা—আমি বাঁচতে চাই তিক্ততার হলাহল পান করে—নীলকণ্ঠই আমার উপাস্য—বিষ এবং অমৃত যাঁর কাছে সমান।

—কথাগুলো তো তোর খুব বড় বড়!—কিন্তু শোন্—মানুষের জীবন বন্দী। বড্ড বেশী রকম বন্দী মানুষের জীবন—আচারে-বিচারে-ব্যবহারে শুধু নয়—মানুষের জীবনটা বন্দী তার মনুষ্যত্ববোধের কাছেই। এই বোধটাকে যদি ঘুচাতে পারিস, তবেই হবে রুদ্রের সাধনা। কিন্তু জীবন শুধুই ধ্বংসের রুদ্রই নন, তিনি সৃষ্টিরও শিব—তাই মহাশ্মশানের গলিত শব থেকেও শিবা-শকুনের উদর-অনল আহুতি পায়—পালিত হয়। শিব সেই বোধকে অন্তর্মুখীন করে বাহিরে শববৎ সুপ্ত থাকেন! সে সাধনা বড় কঠোর—চক্রবর্ত্তীদার কথায় যেন কোন্ মহাসাধকের সিদ্ধমন্ত্র!

আলোক কোনো কথা বলতে পারলো না। চক্কোর্ত্তিও আর কিছু না বলে চা খেল! তারপর বাইরে চলে গেল। আলোক বসে বসে চক্কোর্ত্তির কথাগুলোই ভাবছে। খিদের কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করেছে চা খেয়ে—চোখ বুজে শুয়ে রইল। কখন ঘুম ধরেছে চোখে। গভীর রাত্রি, চক্কোর্ত্তি ডাক দিয়ে বল্‌ল—ওঠ, খাবি নে?

আলু, কাঁচকলা আর পেঁয়াজ দিয়ে চালে-ডালে খিচুড়ী, লঙ্কার ঝালে আর হলুদ-না-দেওয়া সাদাটে রংএ তার আস্বাদ চমৎকার খুলেছে, যেন অমৃত। আলোক গো-গ্রাসে গিল্‌লো কয়েকবার। চক্কোর্ত্তি ওর পানে চেয়ে বললো—'ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাং'—তিনি সকল প্রাণীতে ক্ষুধা রূপে বিরাজ করছেন। ক্ষুধারূপিণী সেই পরমাদেবী মানুষকে বিশেষ করেছেন চৈনন্যবুদ্ধি দিয়ে—নইলে কুকুর-শেয়াল-কাক-চিল থেকে আমরা তফাৎ কিসে ?

—হুঁ! আজই গঙ্গার ধারে ঐ কথাটা ভেবেছিলাম আমি—আলোক বললো। —কিন্তু আমরা কি সাধনার দ্বারা অর্থাৎ খিদের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে কাক চিলের মত খেতে অভ্যস্ত হতে পারি নে দাদা? আমার মনে হয়, পারি।

—পারি—কিন্তু মনুষ্যত্ববোধকে বিসর্জ্জন দিয়ে তবে পারি। কিন্তু তার তো কিছু প্রয়োজন নেই। বরং তাতে প্রত্যবায় আছে। মানুষের জীবনকে মানুষের মত করেই বাঁচতে হবে—নইলে তুমি শেয়াল না হয়ে মানুষ হলে কেন? মানুষের মত মনুষ্যত্ববোধকে অবিকৃত রেখেই বাঁচাতে হবে নিজকে; চুরি করবে না, মিথ্যার আশ্রয় নেবে না—এগুলো খুবই সাধারণ কথা, কিন্তু এগুলো না পালন করলে তোমার মনুষ্যত্ববোধ ক্ষুণ্ণ হয়। এগুলো ক্ষুণ্ণ না করে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে যদি তুমি মরে যাও, তাহলেও রুদ্রদেবতার বিচারশালায় তুমি বলতে পারবে, 'প্রভু, তোমার দেওয়া মনুষ্যত্ববোধের কোনো বৃত্তিরই আমি অবমাননা করিনি'।

আলোক চুপ করে খেতে লাগলো। এই বয়োবৃদ্ধ এবং দুঃখে অভিজ্ঞ ব্যক্তিটির অহেতুক করুণার জন্য সে আজ সত্যি কৃতজ্ঞ। ষোল টাকা স'বারো আনার বেয়ারার মধ্যে সুমহান মনুষ্যত্বের এমন বিশাল বটবৃক্ষবীজ কিরূপে লুকিয়ে থাকতে পারে, সে ভেবে পাচ্ছে না। চক্কোর্ত্তি ওর পানে চেয়ে আবার বল্‌লো—চাকরী প্রায় চৌদ্দ বছর করছি। এই বাড়ী

আমাদের অফিসের বড় বাবুর। ওঁরা তিন পুরুষ ধরে বড়-বাবুগিরি করছেন ঐ অফিসে—বনেদী বড় বাবুর জাত। ওঁর মা-বুড়ি সেই প্রথম দিনটি থেকেই আমাকে 'চক্কোর্ত্তি' বলে ডাকেন। এই গ্যারেজের আশ্রয়টুকু দিয়েছেন থাকতে, আলু-পটল-কলাও দেন মাঝে মধ্যে। নইলে আমার মাইনেতে বেঁচে থাকা অসম্ভব হোত। বিনিময়ে আমি ওঁদের বাজার-হাট করে দেই দু' একদিন।

—আত্মীয় কি কেউ নেই আপনার?

—আছে! তার জন্যই ভাবনা। বাপ মা প্রায় বালক বয়সেই গেছেন! মানুষ করলেন পিসিমা। দুঃখ-ধান্দা করেও সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়ালেন—তারপর অসহযোগ করে জেলে গেলাম, ফিরে দেখি পিসিমা বেঁচেই আছেন। দ্বিতীয় বার জেল-ফেরৎ দেখি তখনো তিনি বেঁচে—তৃতীয় বার দেখলাম, বেঁচে আছেন, তবে জীবন্মৃত। চোখ দুটি নষ্ট হয়ে গেছে। এখনো তিনি আছেন, কাশীতে রয়েছেন—মাসে দশ টাকা, বারো টাকা পাঠাতে হয়।

—তারপর আপনার থাকে কি চক্কোর্ত্তিদা?—আলোক সবিস্ময়ে শুধুলো।

—থাকি আমি এবং আমার সত্যনিষ্ঠা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, মনুষ্যত্ববোধ। জীবনের রুদ্রসাধনায় এই আমার সহায়-সম্বল। কিন্তু আমি ভাল করে জেনেছি, এর বড়ো সম্বল আর নেই।

কথার রেশ যেন ছোট ঘরটায় গম্‌গম্ করতে লাগলো। নির্ব্বাক আলোক এই দীনতম ব্রাহ্মণের আশ্চর্য্য মানবতার কথা চিন্তা করে স্তব্ধ হয়ে রইল অনেকক্ষণ। চক্কোর্ত্তি—হাত ধোও—বলে ওকে তাড়া দিল। তারপর সেই ছেঁড়া মাদুরে ওকে কোলের কাছে টেনে শুইয়ে নিজের ছেঁড়া কাপড় ঢাকা দিয়ে বলল—ঘুমো, কোনো ভয় নেই।

কয়েকদিন রাত জাগার জন্য ঘুম যেন জমা হয়েছিল আলোকের

চোখে; ঘুমিয়ে গেল। উঠলো ভোরে। চক্কোর্ত্তি তারও আগে উঠে চা তৈরী করেছে। আলোককে হাতমুখ ধুতে বল্ল, তারপর চা এবং মুড়ি খাইয়ে বল্ল—ভাইটি, তিনদিন তুই না খেয়ে ছিলি, কাল তোকে যৎকিঞ্চিৎ খাওয়ালাম, আর আমার সম্বল নেই। এবার পথে নাম্। আবার যদি কখনো একাদিক্রমে তিনদিন উপোস খাস, তাহলে তোর দাদার এই দরজা খোলা রইল—নির্ভয়ে ঢুকে পড়িস্! আমার ভাণ্ডার আজ শূন্য হয়ে গেছে।

উদার এই মানুষটির মুখের পানে চেয়ে আলোকের চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো। আভূমি নত হয়ে ওঁর পদধূলি নিয়ে বল্লো আলোক—মনুষ্যত্বের মহাসাধনায় তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ দাদা। আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার একরাত্রির আতিথ্যের মর্য্যাদা আমি রাখতে পারি!

রাত্রে ভাল করেই খেয়েছিল আলোক—পকেটে দুটো পয়সা জমাও আছে, অতএব খাদ্য-প্রচেষ্টা ত্যাগ করে হাঁটতে হাঁটতে এলো গোলদীঘির ধারে। সামনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট প্রাসাদ—চেয়ে চেয়ে দেখলো কিছুক্ষণ; জনৈক ভদ্রলোক খবরের কাগজ পাঠ করছিলেন; আলোকের ইচ্ছা, মোটা হরপের খবরগুলো অন্ততঃ পড়ে নেবে, কিন্তু ওর নোংরা পরিচ্ছদ আর হয়তো গায়ের দুর্গন্ধ পেয়েই ভদ্রলোক কঠোর দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে উঠে চলে গেলেন। কাগজ পড়ার সখটায় রূঢ় ধাক্কা লাগলো আলোকের। পয়সা দুটো দিয়ে কাগজ একখানা কিনেই ফেলবে নাকি? কিন্তু দু'পয়সায় আজকাল কোনো কাগজই পাওয়া যায় না। বেঞ্চিটায় বসে পড়লো হতাশভাবে।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

পেটের খিদে থেকে মনের খিদে কিছু কম নয়, অবশ্য যার মনের খিদে জেগেছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরতলায় আছে বিরাট গ্রন্থাগার, আলোক একদিন তার ভোজে নিত্য অতিথি হোত—মনের খিদে মিটিয়ে নিত ঐখানে।

সেই সুখের দিনের চিন্তা করতে গিয়ে আলোকের মনে পড়ে গেল মা'র কথা—যে মা অনন্ত দুঃখ-যাতনা সহ্য করেও তাকে ঐ বিরাট বাড়ীটার সর্ব্বোচ্চ কোঠায় তুলেছিলেন! তিনি আজ নেই!—কিন্তু নেই কেন? তাঁর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি চিণ্ময়ী হয়ে অধিষ্ঠিতা আছে আলোকের অন্তরে—আছে এই শ্যামা ধরিত্রীর প্রতি শস্পে, আছে এই জন্মভূমির প্রতি পরমাণুতে। রুদ্রের সাধনপথে আলোক যে দেহ লাভ করেছে সেই দেবীর কাছ থেকে, সেই দেহ এই মৃণ্ময়ী মাতৃভূমির মুক্তিসাধনায় উৎসর্গ করবে—চিণ্ময়ী জন্মভূমির পূজায় আহুতি দেবে!

উচ্ছ্বসিত আলোক উঠে পড়লো—কোথায় যাবে, ঠিক নেই। ওদিকে বেলা মধ্যাহ্ন। বর্ষার শেষ, শরৎ আগতপ্রায়। প্রকাণ্ড দিনটা কাটাতে একটা আস্তানার একান্ত প্রয়োজন মানুষের। কিন্তু আলোক কিশোরের আস্তানায় খালি-হাতে আর যেতে চায় না—পথে পথে ঘুরতে লাগলো—দেখতে লাগলো পথচারীদের। এমনি করে সায়াহ্ন নেমে এলো আকাশের বুকে। বৃষ্টি নামলো সজোরে; আলোক নিজকে সম্বৃত করে দেখলো, চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে সে দাঁড়িয়ে। অপর্ণার আস্তানাটা কাছেই। যাই না একবার, দেখে আসি—ভেবে এগিয়ে এল। দেখলো, অপর্ণা সেই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে ছেলে কোলে বসে আছে; সুন্দর সাদা তোয়ালে ঢাকা খোকা হাসছে।

রুক্ষ চুল, ময়লা কাপড়, দাড়ী গোঁফে ভর্ত্তি মুখ—অপর্ণা প্রথমটা চিনতে পারে নি, কিন্তু চিনলো অল্প পরেই।

—এসো দাদাবাবু-এসো—সাদর আহ্বান জানালো অপর্ণা। বাইরে

বৃষ্টি। আলোক ভিজে গেছে: আস্তে ঢুকলো সে ঘরটার ভিতর। কেরসীনের ডিবে জ্বলছে ঘরের মধ্যে। সেই আলোকে আলোক দেখলো ঘরের শ্রী-শৃঙ্খলা চমৎকার! এরাই গৃহলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী, কল্যাণলক্ষ্মী! কয়েকটি ছোট কাঁথা দড়িতে শুকুচ্ছে। একখানা ছেড়া পরিষ্কার শাড়ীও শুকুচ্ছে অপর্ণার। ভাঙ্গা টিন আর বোতলে কি-সব খাদ্যদ্রব্য। বাঃ! বেশ গৃহস্থালী গুছিয়ে নিয়েছে তো অপর্ণা! আলোক বসতে বসতে প্রশ্ন করলো,—দু'পয়সা আসছে তাহলে—কেমন?

কথাটায় কদর্য্য ইঙ্গিত থাকতে পারে। অর্পণা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে আস্তে বলল,—খোকাকে নিয়ে গেরস্তের বাড়ীতে গেলেই কিছু কিছু পাই দাদাবাবু। ছেলের মা যারা, তারা দেয়। এই দামী তোয়ালেটা সেদিন একটি মেয়ে দিয়েছে—ঐ কাঁথাটা দিল কাল একজন মেয়ে। আজ এই আধবোতল হরলিক্ পেয়েছি একটি মেয়ের কাছে।

—রান্নার কি ব্যবস্থা কর?—আলোক নিজের প্রশ্নটার কদর্য্যতা প্রচ্ছন্ন করবার জন্যই আত্মীয়তায় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো—তোমার শরীর তো খুব ভাল দেখছি না অপু!

—না—শরীর ভালই আছে দাদাবাবু? একবেলা রাঁধি, রাত্তিরে! এখুনি রাঁধবো। হ্যাঁ, কিশোর কেমন আছে দাদাবাবু? পাঁচ-ছ'দিন আসে নাই। ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ—ঝুমনীর জ্বর, তাই আসতে পারে নি। কিশোর তোমাকে রোজ দেখতে আসে?

—হুঁ, রোজ না, একদিন অন্তর আসে! ঐ তো আমাকে ভিক্ষে করার কায়দা শিখিয়ে দিল—এই ডিবেটাও ঐ-ই এনে দিয়েছে। বড্ড ভাল ছেলে কিশোর।

আলোক কথা না বলে চুপ করে রইল!

জীবনের এই অতি নিম্নস্তরে মনুষ্যত্বের যে পরিপূর্ণ বিকাশ সে লক্ষ্য

করছে, ইউনির্ভাসিটির মাষ্টার অব্ আর্টস্ হবার গ্রন্থেও সে তার খবর জানতো না। কিশোর এবং চক্কোর্ত্তিদা—আরো কত আছে—কে জানে! জীবন-সাধনার অতি নিম্ন স্তরে থেকেও মানুষ মানুষই থাকে—আবার অতি উচ্চ স্তরে থেকেও অমানুষ হয়ে যায়। জীবনের রুদ্র কোথাও শিব, কোথাও সাপ—আশ্চর্য্য!

উচ্ছৃঙ্খল জীবনটাকে এই কয়দিনেই শান্ত-সংযত করে এনেছে সিদ্ধেশ্বর। কর্ণবিজয় এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতার প্রভাব ছাড়াও তার শালগ্রাম-নুড়ির কৃতিত্ব এবিষয়ে কম নয়। নিজকে বাসনা-কামনা শূন্য কর্ম্ম-যোগী মনে করে সিদ্ধেশ্বর বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল। শালগ্রাম-পূজায় বসে সে এখন প্রায় এক প্রহর কাল অর্থাৎ পূরো তিনটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। ধ্যান এবং ধারণা সম্বন্ধে ওর গুরুভ্রাতাদের কিছু মাত্র জ্ঞান নেই, পূজার ব্যাপারও তারা কিছুই জানে না—কিন্তু হিন্দুর সহজাত সংস্কারবশে সকলেই ওর পূজাকে শ্রদ্ধা করে এবং ওকেও ভালবাসে। কর্ণবিজয় মাঝে মাঝে বলেন—হিরণ্ময়বপু শঙ্খচক্রধারী শ্রীভগবানের আবির্ভাব যাতে অবিলম্বে হয়, তারই প্রার্থনা করো সিধু। তিনি এসে এই বিরাট দেশটার সমস্ত ভেদ-বিভেদ-বিদ্বেষ দূর করে দিন! আর একবার পাঞ্চজন্য বাজিয়ে বলুন 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় পরোধর্ম্ম ভয়াবহ।'

সিধু উৎসাহ পায়—উদ্দীপিত হয়। সরলপ্রাণে কর্ণবিজয়কে প্রশ্ন করে—স্বধর্ম্মকে এতখানি উঁচুতে কেন ঠাঁই দেওয়া হয়েছে কর্ণদা?

—কারণ, স্বধর্ম্মের আশ্রয়ে যে মৃত্যু, সে মৃত্যু নবজীবনের উন্মেষ আনে। সে মৃত্যুর মধ্যে জীবনের ভ্রূণাঙ্কুর জাগ্রত হয়। আর পরধর্ম্ম আশ্রয়ে যে মৃত্যু তাকে বলে সিদ্ধ অপমৃত্যু।

কথাটা পরিষ্কার করে বোঝবার জন্য কর্ণদা বলে চললেন,—নিজেদেরকে পুরোপুরী ইউরোপীয় করে গড়ে তুলতে পারলে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং আত্মশোধনের শক্তি লোপ পেয়ে যেতো! তাতো আমরা পারলাম না। সে সাধনা করতে গিয়ে আমাদের ঐ অপমৃত্যু ঘটছে!

সিধুর আরো অনেক প্রশ্ন করতে ইচ্ছে যায়, কিন্তু কর্ণদা অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, এবং সিধুর বিদ্যাবুদ্ধি এতই কম যে প্রশ্নটা ঠিকমত না হলে উনি সিধুকে নির্ব্বোধ ঠাওরাবেন, তাই সিধু খুব ভেবেচিন্তেই প্রশ্ন করে। কিন্তু কর্ণদা শুধু যে শালগ্রামের নুড়ির বিষয়েই কথা বলেন, তা নয়, তাঁর চিন্তা সকল সময়েই ভারতের মুক্তিকে লক্ষ্য করে—শালগ্রাম উপলক্ষ্য মাত্র। উপলক্ষ্য নিয়ে কথা বলতে বলতে তিনি ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন—উদ্বেলিত হয়ে পড়েন। বিশাল তাঁর দুই চোখ বজ্রের আগুনে ঝক্‌মক্ করে ওঠে। সিধুরা স্তব্ধ হয়ে বসে শোনে সেই গুরু-গম্ভীর মেঘগর্জনবৎ মহাবাণী। সে বাণী উচ্চারিত হয় লোকালয়ের বাইরে, নিভৃত গিরিগুহায়—নীরন্ধ্র অন্ধকার নিশীথের আশ্রয়ে। দলে দলে মুক্তিকামী মানুষ এসে বসে—নীরবে শুনে যায় কথা—ইঙ্গিতমাত্রেই আদেশ পালন করতে উদ্যত থাকে।

কিন্তু কর্ণবিজয় কিছুদিন যাবৎ মৌনী রয়েছেন। কি একটা গভীর চিন্তা ওঁর মনকে যেন স্তব্ধ করে রেখেছে—যেন ভূমিকম্পে সীমাহীন সাগরবারি উদ্বেলিত হয়ে উঠবার পূর্ব্বাভাস। দলের সকলেই জানে, এ চিন্তা কিসের চিন্তা, কিন্তু কেউ কোন কথা বলে না। দেশে একটা হীন প্রচেষ্টা গোপনে চলছে, তারই সংবাদ এসে পৌঁছেছে কর্ণদার কানে। সে-প্রচেষ্টা ভারতের মুক্তি-সাধনা-যজ্ঞের আহুতি নয়, ভারতের বিভেদ-বিদ্বেষ-বহ্নির ইন্ধন। এর সুদূরপ্রসারী কুফল ভেবেই কর্ণদা

এতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কোনো উপায়ই তিনি দেখতে পাচ্ছেন না তাই নীরবেই রয়েছেন।

—আমাদের উপর কোনো আদেশ তো হচ্ছে না কর্ণদা?—সিধু সেদিন সাহস করে শুধুলো।

—আদেশ যিনি করবেন, তিনি তোমার ঐ নুড়ির মধ্যে অব্যক্ত রয়েছেন সিদ্ধেশ্বর—সমগ্র ভারতের সমবেত গণশক্তি আজো তাঁর ব্যক্তরূপ দেখতে পেল না। তাই ভাবছি, আমাদের শক্তি অতিমাত্রায় দুর্ব্বল হয়ে গেছে; কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গেছে! দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষকে উনি আদেশ দান করেন না—কর্ণদা একটুক্ষণ থামলেন, তারপর আবার বলতে লাগলেন,—যে বহিঃশক্তি এই ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতার সমস্তটুকু আজ আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার বিজ্ঞানের মাইক্রস্কোপিক দৃষ্টিতে ওটা পাথরের নুড়ি-ই, এবং সেই মাইক্রস্কোপের ঠুলিই সে আমাদের সকলের চোখে পরিয়ে রেখেছে, জাতি-নির্ব্বিশেষে, ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে,প্রদেশ-নির্ব্বিশেষে ঐ একই ঠুলি সকলের চোখে—তাই ওটা পাথরের নুড়ি বলে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে,—আমরা নিজেরা করছি, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও করছে। অথচ ধর্ম্মপথ যদি ঈশ্বরলাভের পথ হয়, তাহলে ঐ পাথরের নুড়ি এবং ঐ বিশাল মন্দির, বা ঐ সুরম্য গির্জা, সবগুলোই সেই এক ঈশ্বরের কাছে যাবার রাস্তা। এই সত্য একদিন—খুব বেশি দিন পূর্ব্বে নয়, মাত্র দু' একশ বছর আগেও এদেশের মানুষরা বুঝতো। আজ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের ঠুলি চোখে দিয়া এরা জ্ঞানের সহজ দৃষ্টি হারিয়েছে—স্বভাবকে বিকৃত করে দেখছে—শ্বেত-সুন্দর সূর্য্যালোককে ত্রিকোণ কাচে খণ্ডিত করে দেখছে, —আর বহিঃশক্তি সেই সুযোগে আপনার আসন কায়েমি রাখবার আয়োজন করছে। আদেশ দেবার আজ দিন নয়, আত্মচেতনা লাভের দিন আজ। আজ বিজ্ঞানের ঠুলি খুলে জ্ঞানের সহজ দৃষ্টিতে দেখতে হবে সকল মানুষকে,—জাতি, ধর্ম্ম এবং সম্প্রদায়-সমন্বয়ের উর্দ্ধে যেখানে মানুষ

শুধু মনুষ্যত্ব-ধর্ম্মেই জাগ্রত হয়, সেখানেই আজ পৌছাতে হবে জ্ঞানের পথ দিয়ে, হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে, আত্মার আত্মীয়তা দিয়ে—কিন্তু······

কর্ণদা থেমে গেলেন। ওঁর কথাগুলো বেশ শক্ত খোসায় ঢাকা। খোসা ভেদ করে শাঁসে পৌছাতে সিধুর বিলম্ব হয়, তবু সিধু বুঝতে পারছে। বুঝতে পারে কোথায়, কোনখানে কর্ণদার অন্তর কাঁটার আঘাতে ব্যথাতুর হয়ে উঠছে। কর্ণদা কিছুক্ষণ থেমে বললেন—আদেশ কিছু দেবার নেই; তবে চোখমেলে দেখবার আদেশ দুচার দিনের মধ্যেই দেব তোমাদের; দেখবে, অকারণ আত্মকলহ, আত্মীয়বিরোধ, ভ্রাতৃহত্যা আর ভ্রান্ত নীতিতে দেশটা হয়তো রক্তরাঙা হয়ে যাবে। কিন্তু সেদিনও তোমার ঐ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পাথরের নুড়ি জাগবেন না—উনি সেদিনও আদেশ দেবেন না 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ—!' কেন দেবেন না, জানো। উর্ব্বসীর অভিশাপে ক্লীব অর্জ্জুন আজো অজ্ঞাতবাসে রয়েছে। আদেশ উনি দেবেন কাকে! কে শুনবে সেই পাঞ্চজন্যের গভীর আহ্বান?

কর্ণদার কথাটা যেন তাঁরই বেদনার্ত্ত অন্তরের অভিব্যঞ্জনা; যেন তিনিই অর্জ্জুন, ক্লীবত্বের দুঃসহ দুঃখে বৃহন্নলা হয়ে দিন যাপন করছেন—সম্মুখে প্রসারিত কুরুক্ষেত্র—তিনি নিরুপায়—তিনি বন্দী!

কর্ণদা চুপ করলেন। সিদ্ধেশ্বর এবং আরো সকলে চুপ করেই রইল। কিছুক্ষণ পর সিধু বললো—আমার একটি আত্মীয় কাশীতে এসেছেন। অনুমতি করেন তো আজ বৈকালে তাঁকে একবার দেখে আসি!

—বেশ তো, যাবে। তবে সাবধান, আমরা সন্ন্যাসব্রতধারী সন্তান। গৃহীর সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করো। কারণ, সকল সময় মনে রাখবে, যে কোনো মুহূর্ত্তে তোমাকে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াতে হতে পারে—মৃত্যু বরণও করতে হতে পারে।

—হ্যাঁ, কর্ণদা, সেজন্য আমরা সব সময় প্রস্তুত।

বলে সিধু অবন্তীর মা'র সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। এই দলে মেশার পর থেকে ও কিছু কিছু পড়াশুনাও করছে এবং ওর সাজ পোষাক অত্যন্ত সাধারণ গৈরীকধারী সন্ন্যাসীর মত। এ পোষাক এরাই দিয়েছে, কিন্তু জমি বেচার মোটা টাকাটা পাওয়ার পর সিধু কাশী এসেই কাপ্তেনবাবুর মত এক প্রস্থ পোষাক তৈরী করিয়েছিল—সেগুলো আছে সেই পিতৃবন্ধুর বাড়ীতে। সিধু ভাবলো—সেখানে গিয়ে পোষাক বদল করে তবে যাবে অবন্তীকে দেখতে।

অবন্তী তার মানস-লোকের অধিষ্ঠাত্রী। অবন্তী তার জীবননাট্যের পটপরিবর্ত্তনকারিণী দেবী—অবন্তী তার জীবন-সাধনার রুদ্রাণী! সিধু তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে কোন বেশে, তাই নিয়েই ভাবলো অনেকক্ষণ ধরে। অবন্তী চায়, সিধু ভারতের মুক্তিসাধনা-যজ্ঞের সৈনিক হবে,—সে বেশ সৈনিকের বেশ—গৈরিক বেশ, কিন্তু সিধুর অন্তর অবন্তীর রূপে অবন্তীর মানসিক ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ; তার কাছে সন্ন্যাসীর রিক্ত-সর্ব্বস্ব রূপ নিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছা সিধুর মনঃপূত হচ্ছে না। অথচ সে নিজের কাছে সে-সত্য অস্বীকার করছে। কয়েকদিনের জপপূজার যৎকিঞ্চিৎ মনঃসংযোগ ওকে যে সামান্য শক্তি দিয়েছে, তাতেই সিধু অন্তরের অন্তঃস্থলে অহঙ্কারী হয়ে উঠলো। নিজেকে সে অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর সাধক ভাবতে শিখেছে এই কয় দিনেই। ওর মনশ্চক্ষে এখন মাটির পৃথিবী হিরণ্ময়ী। প্রত্যেক নারী ওর কাছে এখন সাধনপথের শক্তি-সঞ্চারকারিণী মহাশক্তি—এই কথাই ও ভাবছে। ওর অহঙ্কার ওর মনের অজ্ঞাতসারে ওকে কতখানি আচ্ছন্ন করেছে, ও জানে না। পাথরের নুড়ি পূজা করে সিধু ভেবেছে, তার অন্তরটাও পাথর হয়ে গেছে—কামনা, বাসনা সে জয় করেছে, আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চাভিমুখী করেছে, যে-আকাঙ্ক্ষা জীবনের রুদ্ররূপের সাধনাতেই লিপ্ত, সমাধিস্থ। ও জানে না,—হয়তো ওর অহঙ্কারই ওকে জানতে দেয় নি—কত বড় ভুল সে করেছে এবং আজ আবার করতে যাচ্ছে।

সে ভাবলো, সে এখন সকল কামনা-বাসনাশূন্য সন্ন্যাসী। নিজকে পরিপাটিবেশে সাজিয়ে সে তার মানসলোকের শক্তি-সঞ্চারকারিণী অবন্তীর আয়ত চক্ষের প্রচণ্ড প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েও অক্ষত হৃদয় নিয়ে ফিরে আসতে পারবে—নিজকে আজ পরীক্ষা করবে সিধু! পাথরের মূর্তিটা ওর অন্তরের কথা পড়ে হেসেছিল কি না, কে জানে!

পিতৃবন্ধুর বাড়ী এসে সিধু তার সুটকেশ খুলে জরীদার ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী এবং শোয়েড্‌লেদারের জুতা পরে মাথার চুল আঁচড়াবার জন্য আয়নায় মুখ দেখলো, তখন তার নিজেরই মনে হোল,

—বাহা-বাহা সিদ্ধেশ্বর!

সন্ধ্যার সময় গিয়ে উপস্থিত হোল সে অবন্তীদের বাসায়। ওর মা বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখতে বেরুচ্ছিলেন, সিধুকে দেখে থেমে গেলেন। বাড়ীর অন্যান্য সকলেই বেড়াতে বেরিয়েছে, অবন্তীও গেছে তাদের সঙ্গে। এই শুভ সুযোগ মা ত্যাগ করলেন না। সিধুকে সাদরে ডেকে নিভৃতে বসালেন। কিন্তু অবন্তীর কথা বলতে তাঁর মুখ একান্তভাবেই সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে লাগলো। অথচ না বল্‌লেও চলে না। যে সুযোগ আজ উনি পেয়েছেন, সেটা হারালে ওঁকে আরো অনেক বেশী বিপদে পড়তে হতে পারে। শেষকালে উনি মন স্থির করে বললেন—অবন্তী বড্ড বিপদ ঘটিয়েছে বাবা সিধু! তুমি যদি ওকে বাঁচাও তবেই, নইলে মেয়েটাকে নিয়ে কি যে করবো!

—কেন? কি বিপদ হোল তার? সিধু আগ্রহে শুধুলো।

মা আর বলতে পারছেন না—কোনোরকম করে বললেন—

—অতবড় মেয়ে, এখনো বিয়ে হয়নি, এখানে সে পরিচয় না দিয়ে ও সবাইকে বলেছে, যে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। জামাই কলকাতায় কারবার করে। এরা তাই শুনে ওর বরকে দেখতে চায়, বলে, 'বর চিঠি লেখে না কেন,' ইত্যাদি!

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

—তাতে আর কি হয়েছে! আপনি বলে দিন যে বিয়ে হয়নি। সিধু ঘটনাকে অত্যন্ত সহজ ভেবেই গ্রহণ করে বললো—ও ছেলেমানুষ, বলেছে তো কি হয়েছে?

—না বাবা! বিয়ে হয়নি, বলা চলে না আর। তোমাকেই আজ আমি অবন্তীর বর বলে পরিচয় দিতে চাই—তুমি রাজি হও সিধু, লক্ষ্মী ছেলে, আমি বিপন্ন!

সিধু অবাক হয়ে চাইল ওঁর মুখের পানে;. একি স্বপ্নের আগোচর কথা ইনি বলছেন! অবন্তী—যার পায়ের নখে আলতা পরিয়ে দেবার যোগ্যতাও সিধুর নেই, ভাগ্যবশে সে সিধুর পরিণীতা পত্নী বলে পরিচিতা হবে এবং আজ রাত্রেই সিধুর সান্নিধ্যে এসে……সিধু আর ভাবতে পারছে না। মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছে ওর!

চক্রধারীও যেন কূট চক্রান্তজাল বিস্তার করেছেন আজ। ওর মুখ থেকে কোনো উত্তর বেরুবার পূর্ব্বেই অবন্তীর দল কলহাস্য করে বেড়িয়ে ফিরলো। ঘরের মধ্যে মা'র কাছে সিধুকে বসে থাকতে দেখেই শচীনবাবুর ছোট মেয়ে অবন্তীকে শুধুলো—কে রে? কে?

—বর! বলে অবন্তী আধ হাত ঘোমটা টেনে পালিয়ে গেল; ওর মুখের হাসির আভাস আর লজ্জার সুকোমল সৌরভ বাড়ীশুদ্ধ লোককে মুহূর্ত্তে বুঝিয়ে দিল, অবন্তীর বর অবন্তীকে দেখতে এসেছে। মা'র আর কিছু করবার বা বলবার দরকার হোল না। তরুণীর দল—শচীনবাবুর দুই মেয়ে আর দুই বৌ আসরে প্রবেশ করলেন। সিধু জামাই-এর ভূমিকায় প্রথম কিছুক্ষণ মূক অভিনয়ই করলো কিন্তু উপায়হীন হয়ে শেষটায় সে কথাও বললো—'বিশেষ কতকগুলো কাজের চাপে সে অবন্তীকে দেখতে আসতে পারে নি!' আড়াল থেকে মা শুনলেন সিধুর কথা। আশ্বস্ত হলেন তিনি। শচীনবাবুও ঘরে ফিরে অবন্তীর বর আসার সংবাদ পেয়ে নিভৃতে মার সঙ্গে দেখা করলেন এবং সমস্ত শুনে

খুশী হয়ে বললেন,—এ খুব ভাল হোল। ছেলে বা মেয়ে যাই হোক, তাকে নিয়ে আর ব্যস্ত হতে হবে না।

বাঙ্গালী বাড়ীতে বর আসার সমারোহ ব্যাপার ত্রুটিহীন হয়ে উঠলো যথারীতি। অবন্তী বন্ধুকন্যা, ধনীকন্যা—কাজেই শচীনবাবুর বাড়ীশুদ্ধ সকলেই তার বরের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। অবন্তীর জন্য সিধু সামান্য যে ফল-মিষ্টি কিনে এনেছিল, তাই নিয়ে ওরা বিদ্রূপ করে বললো. —এ সব তো কাশীরই জিনিষ, কলকাতা থেকে কি আনলেন? ইলিশ মাছ কৈ—গলদা চিংড়ি?

—কাশী :বাবা বিশ্বেশ্বরের নিত্যধাম। এখানে কি জীবহত্যা করতে আছে?

—হত্যা কি মশাই! আপনি তো মরা জীব আনতেন।

—মরা জীব এখানে এলেই মুক্তি লাভ করে কালভৈরব হয়ে যায়। তখন সে পেটে গুঁতোগুতি লাগিয়ে দেবে যে!

সকলে হাসলো সিধুর কথা শুনে কিন্তু একজন বললো—দ্বারিকের খাবার, ভীম নাগের সন্দেশ, পুঁটিরামের রাজভোগ—এগুলো নিশ্চয় আনতে পারতেন—নাকি ওসব কণ্ট্রোল্ড ওখানে?

'কণ্ট্রোল্ড' কথাটা সিধুর খুব উপকারে লাগলো—বললো,—সব কণ্ট্রোল্ড মায় বার্থ পর্য্যন্ত!

—তাই বুঝি অবন্তীকে এখানে পাঠিয়েছেন!—হা হা করে হেসে উঠলো সবাই।—ভয় নাই! একসঙ্গে পাইকারী হারে দুটো-চারটে তো আর জন্মাবে না! হিঃ হিঃ হিঃ!

'বার্থকনট্রোল' কথাটা সিধুর শোনা আছে, ভাল করে ওর মানে সে জানে না। ওর রসিকতাটা যে এতখানি হাসির খোরাক যোগাতে পারবে, এটা সে বুঝতে পারে নি—এখনো ঠিকমত বুঝতে পারছে না। কিন্তু এঁরা সকলে অত্যন্ত বেশী হাসতে আরম্ভ করেছেন। রসিকতা

করতে বা তরুণীদের সঙ্গে আলাপ করতে সিধু অনভ্যস্ত নয়, কিন্তু সে-আলাপ গ্রাম্য নারীর সঙ্গেই এযাবৎ করেছে; আজ এতগুলি শিক্ষিতা তরুণীর সান্নিধ্যে তার ভয় হচ্ছিল, কি জানি, মান বজায় থাকে কি না। এদের হাসতে দেখে সে অতিশয় খুসি হয়ে বললো—হাসিও কন্ট্রোল্ড ওখানে।

আবার হাসির হররা উঠলো! এরকম অবস্থায় বাঙ্গালী মেয়েরা কারণে-অকারণে হেসে লুটোপুটি খায়। সিধুর ব্যাপারেও তার ব্যত্যয় হোল না। ওদিকে ভেতরের ঘরে মা সিধুর আলাপ ইত্যাদি শুনে খুসী হয়ে অবন্তীকে বললেন—সিধু তো বেশ সেয়ানা!

—বলেছিলাম তো! —হাসলো অবন্তী।

মা কি বুঝলেন কে জানে, বললেন—সবটা সামলাতে পারবি?

—হ্যাঁ! দরকার হয় ওকেই বিয়ে করে ফেলবো! —বলে অবন্তী মৃদু হাসলো আবার।

জানা ঘর বর মা আর অধিক কিছু বললেন না। এরকম একটা পরিণতি হলে অবন্তী সম্বন্ধে সব ভাবনাই ঘুচে যায়! তিনি বিশ্বেশ্বরের চরণে তারই প্রার্থনা করতে লাগলেন। আজ আর তাঁর আরত্রিক দেখতে যাওয়া হল না।

জামাই-আদরের কোন ত্রুটিই এঁরা হোতে দিলেন না! পরিপাটি করে সিধুকে খাইয়ে একটি সুন্দর সুসজ্জিত ঘরে সুকোমল শয্যায় তাকে শুতে নিয়ে যাওয়া হোল। এইবার অবন্তী আসবে, তারই ইঙ্গিত করে গেল একজন তরুণী—শ্লীল এবং অশ্লীল ভাষায়। সিধুর মস্তিষ্ক-কোটরে এতক্ষণে যেন একটা জ্বালা অনুভূত হচ্ছে। একা অসহায় সিধু—এখুনি অবন্তী আসবে এবং······সিধুর আনন্দটা এক অব্যক্ত অননুভূত ক্রন্দনের বেগে স্পন্দিত হয়ে উঠছে যেন। আত্মপ্রসাদটা আত্মবঞ্চনার তীক্ষ্ণ শলাকায় বিদ্ধ হচ্ছে যেন; যেন এই সুবিভীষণ প্রতারণা দ্বারা সিধু

নিজকে, নিজের বংশধারাকে, কর্ণবিজয়ের স্নেহকে এবং মাতৃভূমির মুক্তি-সাধনাকে প্রতারিত করছে—যেন তার শালগ্রাম শিলারূপী শ্রীভগবানকেও······

সিধু পকেটে হাত দিতে গেল অভ্যাস বসে ;—নাই ! শালগ্রাম শিলা আজকাল থাকে পেতলের সিংহাসনে। দু'টাকা দিয়ে দিনকয়েক হল ঐ সিংহাসনটি সে কিনেছিল ; আজ তিনি সিধুর পকেটে নাই ! থাকলে হয়তো সিধুকে রক্ষা করতেন। কিন্তু সিধুকে ভাববার অবসর না দিয়েই অবন্তী এসে দাঁড়ালো বধূবেশে। বধূ—ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা তরুণী বধূ, বল্লরীর মত নতনয়না, আবার বিজয়িনীর মত বঙ্কিম-গ্রীবা—সিধু বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল মুহূর্ত্তকয়েক ! অবন্তী ! কী আশ্চর্য্য রূপসী অবন্তী !

নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তে এনে কথা বলবার মত অবস্থা করতে সিধুর কয়েক মুহূর্ত্তই কাটলো। ইতিমধ্যে অবন্তী বেশ স্বচ্ছন্দে বসেছে তার পর্য্যঙ্কে—পার্শ্বে—একান্ত সান্নিধ্যে। বিবাহিতা বধুর অধিকার যেন বহুকাল থেকেই লাভ করে এসেছে সে সিধুর কাছে। সিধু নিজকে সম্বৃত করে সরে বসলো একটু ; তারপর অতি নিম্নকণ্ঠে শুধুলো,

—এসব কি ব্যাপার অবন্তী ? সত্যি কি তুমি এই ঘরে থাকবে আজ ?

—হ্যাঁ ! মা'র কাছে কি তুমি সব শোন নি সিধুদা ?

—না—উনি বলবার সময় পেলেন না ; তোমরা এসে পড়লে তখনই। আমি এখনো কিছু বুঝতে পারছি না। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বোধ হয়······

—হ্যাঁ, বড্ড বিপদে পড়েছিলাম !—নির্ল্লজ্জা অবন্তীর মুখখানাও নামলো একটুখানি। লজ্জার এতবড় ধাক্কা কাটিয়ে কথা বলা যে-কোনো মেয়ের পক্ষেই লজ্জাকর, কিন্তু অবন্তী কইল,—গুণ্ডারা জোর করে আমায়

ধরে নিয়ে গিয়েছিল, প্রায় দু'মাস আটকে রেখেছিল, তারপর এই অবস্থা। এখন তুমি দয়া না করলে আমার কোন উপায় নাই সিধুদা……।

অবন্তীর কণ্ঠস্বরে কারুণ্য যেন ঝরে পড়ছে—ক্রন্দন যেন মূর্ত্তি ধরছে। কিন্তু সিধু! নির্ব্বোধ সে নয়; এই ব্যাপারে কতখানি দায়ীত্ব তার ঘাড়ে চাপান হচ্ছে, সেটা বুঝতে ওর কিছুমাত্র দেরী হোল না। ওর সমস্ত শরীরের রক্ত একবার উষ্ণ হয়ে উঠলো, তারপরই জমাট বেঁধে গেল। কঠোর পাষাণে পরিণত হয়ে গেল সিধু।

—সিধুদা!

সিধু নির্ব্বাক! অবন্তীর আহ্বান তার কাণে পৌঁছাল না।

ওয়াল-ক্লকটার টিক্‌টিক্ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই; প্রায় পনর-কুড়ি মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেল, সিধু নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ! অবন্তীর যেন কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো এতক্ষণে। সিধুদা কি তাহলে রাজি হবে না তার বরের অভিনয় করতে? কেন? সে তো সেই অবন্তী, একদিন যাকে নিয়ে সিধু দিল্লী-আগ্রায় পালিয়ে যেতে চেয়েছিল; যে অবন্তীর চোখের দিকে চেয়ে সিধু মরতেও প্রস্তুত ছিল—এ অবন্তী কি আজ সেই অবন্তী নয়?

না—কথাটা বুকের জমাট নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল অবন্তীর বুক থেকে। না—এ অবন্তী সে দিনের সেই অনাঘ্রাতা, অপাপবিদ্ধা অবন্তী নয়—সেই অনূঢ়া পল্লীকন্যা নয়—কৌমার্য্য-মণ্ডিতা শক্তি-স্বরূপিনী ষোড়ষী মূর্ত্তি নয়; সে আজ পথচারিণী বারবধূর ক্লেদাক্ত পথের অভিযাত্রিনী! স্ব-সন্তানের মাতৃত্বকেও স্বীকার করে নেবার যোগ্যতা তার নেই আজ! নিজের দিকেও তাকাতে যেন ভয় করতে লাগল অবন্তীর,—রূঢ় আলোটা কেউ নিবিয়ে দিতে পারলে বড়ো উপকার হয় ওর—কিন্তু ঘরে প্রস্তরবৎ উপবিষ্ট সিধু ছাড়া আর কেউ নেই।

সিধু—অন্তরের গভীরতম স্তরে যেন ধ্যানমগ্ন সিধু। যে প্রচণ্ড প্রলোভন ওর সম্মুখে, তাকে অস্বীকার করবার শক্তি ওর সজ্ঞান, সচেতন মনে নেই, কিন্তু ওর চির-জাগ্রত চিৎ-চেতনায় জেগে রয়েছে যে সাধক-সিধুর আত্মিক-ঊর্দ্ধমুখিনতা,—প্রলয়-পথের পরিব্রাজকতা—রুদ্র-জীবনের মুক্তি-প্রবণতা—সেই লোকোত্তর সাধক-চেতনা কঠোর ভ্রূকুটির সম্মোহন মন্ত্রে ওকে স্তব্ধ করে রেখেছে। ওর শালগ্রাম-শিলা সঙ্গে নেই কিন্তু স্বয়ং শালগ্রাম যেন ওর সহায়—ওর অন্তর দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে আলোড়িত, কিন্তু ওর অন্তর্য্যামী স্থির, অবিচল! ওর মানসপদ্ম মালিন্যমুক্তির আশায় গভীর পঙ্ক ভেদ করে সূর্য্যের সহস্র কিরণতলে দল মেলবে! আচ্ছন্নবৎ সিধু আধস্বরে উচ্চারণ করলো,—'নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর—'

—সিধুদা!—অবন্তী অত্যন্ত ভয়জড়িতকণ্ঠে ডাক দিল। সিধু চোখ মেলে দেওয়ালের টাঙানো বারানসীর বিশাল মন্দিরের ছবিটার পানে চেয়ে বললো আস্তে আস্তে—কণ্ঠে তার সীমাহীন ঔদার্য্য,

—তোমাদের বিপদ আমি বুঝেছি অবন্তী, কিন্তু আমি এখন প্রলয়-পথের যাত্রী। তোমাকে বৌ হিসাবে গ্রহণ করা এখন আমার আয়ত্তের বাইরে, সাধ্যের অতীত; তবু তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমার ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য, এই একরাত্রি আমি চুপ করেই রইলাম। রাত হয়েছে, তুমি শোও, আমি বারান্দায় পায়চারী করেই রাতটা কাটিয়ে দেব।

অবন্তী আশ্বস্ত হলো কিংবা আতঙ্কিত হলো, ঠিক বোঝা গেল না। সে বসেই রইল; সিধু উঠে যাচ্ছে, অকস্মাৎ অবন্তী চট্‌করে ওর হাত ধরে বললো,—বাইরে যেওনা সিধুদা, ওরা এখনো শোয় নি!…আর শোনো…

সিধু বসলো আবার; অবন্তীর পানে তাকালো তার কথা শোনবার জন্য!

—ছেলে বা মেয়ে যাহোক একটা তো হবে। ভাবনা তাঁকে নিয়েই। তোমার পিতৃপরিচয়ে সে যদি পরিচিত হোতে পারে, তাহ'লে সিধুদা

তাকে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার অধিকার তুমিই দিলে—এটুকু দয়া কি তুমি করবে না ?

অবন্তীর কণ্ঠস্বর কাঁদছে, যদিও চোখে তার ছলাকলাময়ী নারীর আতস-দীপ্তি—ঠোঁটে তার আবীর-পাণ্ডুর হাস্যলেখা। সিধু ওর কণ্ঠস্বরে ওর অন্তর যেন পড়তে পারছে! বললো—তোমার ভবিষ্যৎ কোথায় তোমাকে নিয়ে যাবে, সেটাই আমি ভেবে উঠতে পারছি না। আমি সকালে চলে যাব এবং আর হয়তো কখনো আসবো না। তারপর তুমি কি করবে অবন্তী ?

—কোথায় তুমি চলে যাবে সিধুদা ? কেন যাবে ?

—যাব মুক্তির পথে ;—মাতৃভূমির আহ্বান এসেছে ; আমি সৈনিক !

—বেশ তো, আমাকেও নিয়ে যাবে !

—তোমাকে ?—সিধু উঠে পায়চারী করতে লাগলো ঘরটায়। ভাবতে লাগলো, আজ কত আশা নিয়ে সে অবন্তীকে দেখতে এসেছিল। তাদের অভিযানের গভীর গোপন কথার আভাস দিয়ে অবন্তীকে সে জানাতো, অবন্তীই তার এই নবজীবনের জন্মদাত্রী—প্রেরণাময়ী—প্রত্যক্ষ দেবী স্বরূপিনী।

কিন্তু এ অবন্তী সে অবন্তী নয়—সে সত্য ওকে দেখামাত্রই অন্তরে জেগে ওঠে। এ অবন্তী বিলাসিনী শুধু নয়, বারবিলাসিনীর কদর্য্যতায় আপ্লুতা, আকণ্ঠ নিমজ্জিতা ব্যভিচারিণী। ওর মুখের মিথ্যায় ও পৃথিবীর যে কোনো ব্যক্তিকে প্রতারিত করতে পারে, সিধুকে পারবে না—কারণ সিধু জানে গুণ্ডা দ্বারা অপহৃতা লাঞ্ছিতা নারীর স্বরূপ কি—তার সত্যানুভূতি কোথায়, তার সঞ্জীবনশক্তি কতখানি। তথাপি ওর মুখের কথাটা সত্য বলে ধরে নিলেও ওর চলনে-বলনে-আচরণে যে পর্ব্বতপ্রমাণ অসামঞ্জস্য—ওর সকুণ্ঠ প্রকাশ এবং আকুণ্ঠ ব্যবহারের স্বীকৃতির মধ্যে যে কদর্য্য ব্যবধান, তাকে অস্বীকার করবার উপায় নাই। বললো,

—তুমি কোথা যাবে? আমাদের চলার পথ রুদ্রদেবতার মন্দিরের পথ। মরণ সে সেথা সারাক্ষণ ওঁৎপেতে থাকে—ফাঁসির মঞ্চে আর ফুলমালঞ্চে কোনো তফাৎ সে পথে নেই, মৃত্যুর পথে অমৃত যাত্রা!…

সিধু আস্তে হেঁটে বারান্দায় দাঁড়ালো এসে। বিস্তীর্ণ নগরী নিদ্রাকাতর দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে। মহাকাল যেন ত্রিশূলহাতে নেশায় ঝিমোচ্ছেন। সিধু বললো—'নমো পিনাক হস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ—'

অবন্তী খাটের উপর আড় হয়ে শুয়ে—কে জানে, ঘুমিয়েছে কি না। সিধু অপলক দৃষ্টি মেলে ওর পানে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। অবন্তীর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে অবন্তীর অপরাধ কোথায়? প্রাকৃতিক নিয়মেই সে জননীত্বে উন্নীত হয়েছে; তার সমাজ, তার স্বজন তাকে রক্ষা করতে পারে নি—এরপর সেই কাপুরুষ স্বজন এবং কাপুরুষতম সমাজ তাকে ত্যাগ করে ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াবে; সাহঙ্কারে ঘোষণা করবে,—'তাদের ধর্ম্মে পতিতা নারীর ঠাঁই নেই।' কিন্তু এই সব লাঞ্ছিতা অপমানিতা নারী কি সত্যই পতিতা? সত্যই অস্পৃশ্যা? না—সিধুর অন্তরদেবতা বজ্রের স্বরে বললো—না। সিধু পা-টিপে ঘরে ঢুকে অবন্তীকে স্পর্শ করলো,—ঘুমুচ্ছে অবন্তী, ঘুমিয়ে গেছে। এত শীগ্রি ঘুমুতে পারলো এমন একটা বিপর্য্যয়কর জীবনের আবেষ্টনের মধ্যেও! সিধুর আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে। কিন্তু না ঘুমিয়েই-বা অবন্তী করবে কি? কথা যা-যতটুকু হবার, হয়ে গেছে, এবার তো তার ঘুমোবারই কথা। শুতে পেলে সিধুও হয়তো এতক্ষণ ঘুমিয়ে যেত। কিন্তু এমন নিশ্চিন্তে অবন্তী ঘুমিয়ে গেল? রাত মাত্র সাড়ে বারোটা—দেওয়াল ঘড়িটায় দেখলো সিধু।

ওদের ঘুম পায়—এই সব সন্তান-সম্ভবা মেয়েদের। সব দুশ্চিন্তাকে অতিক্রম করেও ওরা ঘুমুতে পারে। সিধু জানে সে-তত্ত্ব। কিন্তু অবন্তী ঘুমুচ্ছে যেন জীবনের এই প্রথম আনন্দের ঘুম। ওর মুখের কোনো রেখায় চিন্তার এতটুকু মালিন্য নেই—দীপ্ত আলোকে সিধু দেখছে

লাগলো, শান্ত সুখ-সুপ্ত অবন্তীর সুন্দর মুখ হাসির দীপ্তিতে ঝলমল করছে। ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে ওকে। অন্তরের প্রলোভন দুর্ব্বার হয়ে উঠলো সিধুর—বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে তার চিন্তাধারা। নিজকে সবলে সংযত করে সে আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—'অহঙ্কারীকে ক্ষমা করো প্রভু!' বিজিত-ইন্দ্রিয় বিশ্বামিত্রও যে প্রলোভন এড়াতে পারেন নি—সিধু আজ সেই ভয়ঙ্করী মহামায়ার কূট- ক্র বন্দী! নিজকে এতখানি অসহায় সিধুর আর কখনো মনে হয়নি। সিধু ত্বরিত পদে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো, আধো অন্ধকারে, অস্পষ্ট ছায়ালোকে। আকাশের বুকে কাল পুরুষের উজ্জ্বল নয়ন-বহ্নি যেন ওর দিকে তাকিয়ে—, সপ্তর্ষিমণ্ডল জ্বলজ্বল করছে—দূরে ছায়াপথে অগণ্য নীহারিকার অভিযান কে জানে কোন্ মুক্তির অনন্ত সম্ভাবনার উদ্দেশে! ওরাও বন্দী! মুক্তি-পথের সংখ্যাহীন ঘূর্ণনে ওরা সীমাহীন আকাশে বন্দী—আর নিম্নে ঐ গর্ভ-গৃহে বন্দী মানবাত্মা মুক্তির পিপাসায় অধীর, আকুল। কে জানে ঐ মানব-ভ্রূণাঙ্কুরে কী অনন্ত শক্তির বীজ নিহিত আছে? কে বলতে পারে, ঐ বিশ্বামিত্রকন্যা শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্রের নামেই নব-ভারতের নবতম নাম হবে কি না? কে বলতে পারে, জীবনের রুদ্ররূপ ঐ শিশুকে অবলম্বন করেই প্রকটিত হবেন কি না?—সিধু আশ্বস্ত হচ্ছে, কিন্তু আরাম পাচ্ছে না। ওর চিরদিনের সংস্কার-প্রবণ সনাতন মন যেন ঘৃণায় মুখ ফেরাতে চায়, আবার বর্ত্তমানের কর্ণদার প্রভাবিত সংস্কারমুক্ত সাধক-মন কারুণ্যে কোমল হয়ে ওঠে, আশায় আশ্বাসিত হয়। রাত্রি গভীর হতে হতে প্রায় শেষ হয়ে গেল—ভোরের পাখীর কূজন জাগলো সুপ্তোত্থিতের শ্রবণে। অবন্তী নিঃশব্দে উঠে চলে গেল ঘরের বাইরে। ওর মা এসে ডাক দিল—হাত মুখ ধোও বাবা সিধু!

রাত্রি প্রভাতের আলোয় মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু সিধুর বন্ধন কঠোরতর হচ্ছে। সিধু তাকে অস্বীকার করবে, নিজকে কঠিন করে বললো—

—আমি এখুনি চলে যাব কাকিমা !

কিন্তু চলে তাকে যেতে দেওয়া হবে না অত শীঘ্রি ! মা বললেন, —তা কি হয় বাবা ! যখন অতটা করলে তখন শেষ রক্ষে কর !

নিরুপায় সিধু উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল। কিন্তু এল তরুণীর দল—হাসি-গান-গল্পে সিধুকে অস্থির করে তুললো তারা।

সিধুর অন্তরাত্মা তারস্বরে চীৎকার করছে—মুক্তি দাও, প্রভু মুক্তি দাও !

কিন্তু মুক্তি গাছের ফল নয়—পুকুরের জল নয়, আকাশের আলো নয়। কবি বলেছেন—

'মুক্তি মুক্তি কর্‌িস রে ভাই, মুক্তি কোথায় মিলে ?
চরকা ঘোরে তো ঘোরে নাকো টাকু রশি যদি হয় ঢিলে !'

সামান্য রশির ঢিলেমীতেই টাকু ঘুরবে না—মুক্তির সূতা তৈরী এমনি কঠিন কাজ। তথাপি ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার মাঝখানে শ্রীভগবানের চক্রচিহ্নবৎ চরকা-চিহ্ন অঙ্কিত করে চলেছে মুক্তিপথযাত্রীদল—সেই দুঃসহ অভিযানপথে—রশি তাদের যেন ঢিলে না হয়—টাকু যেন ঘোরে—মুক্তিযজ্ঞের সূত্র যেন প্রস্তুত হয়। কিন্তু কৈ ? দীর্ঘকাল ধরে সূত্রযজ্ঞ তো চলছে, এখনো তো যজ্ঞসূত্র ধারণ সম্ভব হোল না—এখনো তো ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্যে জীবনরুদ্র ধৃত হলেন না—এখনো তো সত্যের শূল ঝলক দিয়ে উঠলো না ঈশানমূর্ত্তির বিষাণযন্ত্রের রণদামামায় !

অপর্ণার ঘরের দেওয়ালে কাগজে আঁকা একটা ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা, মাঝে চরকাচিহ্ন ; কেরোসীনের আলোকশিখা বাতাসে দুলছে, সেই আলোতে পতাকাটিও এক একবার জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠছে, আবার

ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে। অত বড় একটা কাগজ পেয়ে অপর্ণা হয়তো ওটা কোন কাজে লাগাবার জন্য কুড়িয়ে এনেছে। আলোক শুধুলো,

—ওটা কোথেকে আনলে—ঐ পতাকাটা ?

—কিশোর টাঙিয়ে রেখে গেছে দাদাবাবু! বললো,—'ইস্ ঝাণ্ডা বরাবর উঁচা রাখ্‌খো !'

হাসলো অপর্ণা কথাটা বলতে বলতে। কিন্তু আলোক হাসলো না। হাসির কথা এটা নয়; ঐ ঝাণ্ডা উচ্চশির করে রাখাই সাধনা আজ ভারতবাসীর এবং সেই সাধনাতেই তাদের সিদ্ধিলাভ করতে হবে—করতেই হবে সিদ্ধিলাভ। মুক্তির সেই পরম দিনে জীবনের রুদ্র জাগবেন হয়তো নওল কিশোরের মধ্যেই—তাই নওল কিশোর আজ এই সর্ব্বনিম্ন স্তরের জীবন-সাধনার প্রধান পাণ্ডা;—তার ঝাণ্ডা উচ্চশির থাক !

আলোক নমস্কার করলো জাতীয় পতাকাকে; অপর্ণা ওর নমস্কার করা দেখে প্রশ্ন করলো—ওটি কি জিনিস দাদাবাবু? ঠাকুর !

—হ্যাঁ, আমাদের জন্মভূমির জাগ্রত মূর্ত্তি। ওর থেকে বড়ো ঠাকুর আজ আর আমাদের নেই !

কিন্তু আলোক নিজেই বুঝলো, অপর্ণা তার কথা বুঝতে পারছে না। অপর্ণা বলল,—ঠন্‌ঠনের কালীমার কাছে পরশুদিন বসেছিলাম। একজন একটি আধুলি দিল, আর একটি মেয়ে কোলের ছেলের কাঁথাটা দিয়ে গেল। আজ একজনের কাছে এই হরলিক্‌স্ পেলাম। মা-কালীর ওখানে বসলে আমি বেশী পয়সা পাই দাদাবাবু !

হায়রে অভাব-রাক্ষসী ! কোথায় জাতীয় জীবন, আর কোথায় বা জাতীয় পতাকা ! সব বিজাতীয় হয়ে গেছে এদের জীবনে। জীবনের সাধনায় এরা শিবও নয়, শবও নয়, এরা শ্মশানচারী প্রেত। আলোক নিঃশব্দে বসে ভাবছে, অপর্ণা এর মধ্যে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে উঠে গেল

বাইরে। চা আর চিড়ে কিনে আনলো। আলোকের কাছে এসে অতি কুণ্ঠার সঙ্গে বলল—দুটিখানি দেব দাদাবাবু!

—দাও!—খিদের কথাটা ভুলেই গিয়েছিল আলোক। ওর মনের আলোকরশ্মি ইতস্ততঃ ঘুরছে আজ সারাদিন, খিদের কথা মনে করবার সময় পায় নি। তা ছাড়া কাল সে ভালই খেয়েছিল। অপর্ণার দেওয়া চা আর চিড়ে খেতে খেতে আলোক দেখতে পেল, অপর্ণা কাঠকুচি এনে রেখেছে একটা ছেঁড়া বস্তায়, তাই কিছু বের করে বাইরে এক যায়গায় দুখানা ইট দিয়ে তৈরী উনুনটা জ্বালালো। একটা মাটীর হাঁড়ি চড়িয়ে দিল উনুনে। এদিকে বৃষ্টি নেমেছে।

—দুটি ভাত রঁাধবো দাদাবাবু; খেয়ে যাবে? অপর্ণার কণ্ঠস্বরে জননীর স্নেহ এবং ভগিনীর প্রীতি যেন উৎসারিত হচ্ছে। ঝুমনীর খাবারে ভাগ বসিয়ে আলোকের লজ্জাশীলতাও নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে। ওর সে সময় মনে হোল না যে সে ভাগ বসাচ্ছে এক ভিখারিণীর খাদ্যে!

—হ্যাঁ, বেশ তো, রঁাধো!—বলেই কিন্তু তার মনে পড়লো, জীবন-সাধনার কোন্ স্তরে সে এসে দাঁড়িয়েছে—কোন্ কদর্য্যতম স্তরে! কিন্তু না, কদর্য্য কেন? ভিক্ষালব্ধ অন্ন পবিত্র অন্ন এবং অন্ন দান করবে মাতারূপিণী অপর্ণা, অন্নপূর্ণা। অপর্ণার হাতের খাদ্য তার অন্তরকে পবিত্র করবে, শক্তিমান করবে।

অপর্ণা রান্না করতে গেল ডিবেটা নিয়ে। আলোক আধো-অন্ধকারে বসে ভাবতে লাগলো—'তোমাকে একদিন ঘৃণা করেছিলাম; জীবনের সাধনা কতখানি কঠোর, তখন জানতাম না। আজ দেখছি তুমি সত্যি অপর্ণা, নিজকে রিক্ত করে পর্ণমাত্র আহার্য্যে তুমি তপস্যা কর।'

আলোকের শীতবোধটা এতক্ষণ চাপা ছিল নানা চিন্তায়। অপর্ণা তার রান্নাশালা থেকেই বললো—আমার শাড়ীটা হয়ত শুকিয়েছে দাদাবাবু, ঐটা পরে তোমার ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলতো।

আলোক প্রত্যুত্তরে কোন কথা না বলে অপর্ণার শাড়ীখানা দুভাঁজ করে লুঙ্গির মত পরে ফেললো। কাপড়-জামাগুলো একধারে গুটিয়ে রেখে দিয়ে চুপটি করে বসলো দেওয়াল ঠেস দিয়ে। বিড়ি সে খায় না—খেলে ভাল হোত; সময় কাটাবার একটা ভাল উপায় বিড়ি। অপর্ণার ঘরে যদি থাকে এক-আধটা বিড়ি তো আলোক আজ টানবে। কিন্তু অপর্ণা রান্না করছে। তাকে ডাকতে আর ইচ্ছা হোল না আলোকের।

অপর্ণাকে আলোক ডাকলে না, কিন্তু একটা চিন্তা তার অনুভূতিতে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। কত সহজে, কত অনায়াসে এই সামান্য কয়দিনেই আলোক এই সুদুঃসহ জীবন-সাধনায় অভ্যস্থ হয়ে উঠলো! নিজের ছেঁড়া-ময়লা কাপড়ের তো কথাই নাই, অপর্ণার পরিধেয় শাড়ী পরে স্বচ্ছন্দে বসে থাকতেও তার আর বাধছে না। অপর্ণার রান্না করা ভাত সে অমৃতবৎ গ্রহণ করতে পারবে, অপর্ণার উচ্ছিষ্ট বিড়ি পেলে সে এখন হয় তো টানতে পারে! জীবন-ধারণের সুকঠোর সাধনায় মানুষে কেমন করে জান্তব জীবনের সর্ব্বসহিষ্ণুতায় অভ্যস্থ হয়ে যায়, আলোক সেই কথাটাই অনুভব করছিল।—কিন্তু ডাষ্টবীনের উচ্ছিষ্ট! না—অতটা এখনো আলোক উঠতে পারে নি তার সাধনার পথে। ওটা নিশ্চয় খুব উচ্চতর অবস্থা এই সাধনার। ও অবস্থা লাভ হতে আলোকের দেরী হবে। হোক—আলোক দেখবে, এই জীবন কেমন করে কোথায় তাকে নিয়ে যায়। মানব জীবনের কোন্ মহিমময় স্তর সেটা। ভাগ্যবলে সুযোগ-সুবিধা বেশ জুটে গেছে আলোকের। এই অপর্ণা, নওলকিশোর, রাধিয়া, রামধনিয়া আজ তার পরমাত্মীয়—গামছাবাঁধা বইগুলো মাথায় দিয়ে আলোক ভাবতে লাগল।

ভাবছিল কি ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঠিক নাই, অপর্ণার ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখলো, তার ছেঁড়া কাপড়-গেঞ্জী-পাঞ্জাবীতে সাবান ঘষে অপর্ণা ভিজতে দিয়েছে। ওকে উঠতে দেখে বললো,—ভোরবেলা কেচে

দিবো দাদাবাবু! বড্ড ন্নুংড়া হইছে কাপড় চোপড়। বিহানেই শুকিয়ে যাবেক। উঠো, খাও!

মমতাময়ী নারী!—মাতা-কন্যা-বধূ! নিতান্ত নিঃসম্পর্কীয়া হয়েও আজ আলোকের জীবন আলো করে দিল স্নেহ দিয়ে—সহানুভূতি দিয়ে। পুরুষ এদের জন্যই নিজের পৌরুষশক্তিকে জাগ্রত রাখে, মৃত্যুকে পরাজিত করে, জীবনকে বিজয়ী করে তোলে সংসারের কুরুক্ষেত্রে; এরাই মানুষের জীবনরথে পাঞ্চজন্য বাজিয়ে বলে—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ!' এরাই ঘোষণা করে, 'মামেকং শরণং ব্রজ!'

উঠে পড়লো আলোক। অপর্ণা তার ফুটো টিনে জল এনে ঘরের একটু যায়গা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিল। তারপর ভাত দিল একটি শালপাতার ঠোঙা খুলে—পরিপাটি করে সাজিয়ে ভাত, বেগুনপোড়া, আলুসেদ্ধ আর আচার! কোত্থেকে এসব যোগাড় করলো অপর্ণা, তা সেই জানে, কিন্তু আলোক খেতে বসে তৃপ্তিতে ভরে উঠলো। তার মা'র হাতের খাবারের কথা মনে পড়তে লাগলো ওর বারম্বার। এই অপর্ণাকে সে অতি কুৎসিত কথা বলে গিয়েছিল সেদিন। অনুশোচনা বাড়তে লাগলো আলোকের কিন্তু অপর্ণা বসে বসে ওকে খাওয়ালো—ঠিক তপস্বিনী অপর্ণার মতই ওর মুখকান্তি রুক্ষ সুষমার রশ্মি বিকীর্ণ করছে! কালো চোখে ওর বিশ্বমাতার স্নেহালোক। ছেলেটা কেঁদে ওঠায় অপর্ণা ত্বরিতে গিয়ে কোলে নিল, পিট চাপড়ে বলতে লাগলো—ঘুমা, ঘুমা, 'খোকা ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো……'মাতৃত্বের সুমহান ব্যঞ্জনা ওর সারা অবয়বে! কী আশ্চর্য্য নারীর এই মাতৃমূর্ত্তি!—কিন্তু আলোকের আরো আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে,—কোনো নারী আপন সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করতে চায়, আর কেউবা পথে কুড়িয়ে-পাওয়া সন্তানকে সযত্নে লালন করে—ঐ শিশুটির জীবনেতিহাসেই তার শিলালিপি ক্ষোদিত।

আহার শেষ করে আলোক হাত ধুলো ; বৃষ্টি তখনো বিরাম পায়নি, রাস্তায় জল জমে উঠেছে হাঁটু অবধি ! আলোক কি করে যাবে এবং কোথায় যাবে, ভাবছে ; অপর্ণা বললো,—এতো জল ঝড়ে যাবে কি করে দাদাবাবু ! তোমার কাপড় জামাও কাচা হয় নাই।

—হ্যাঁ—থেকেই যাই আর কিছুক্ষণ !—বলে আলোক নিশ্চিন্তে, যেন একান্ত আপনার জনের আশ্রয়েই শুয়ে পড়লো সেই ছোট্ট ঘরের একপাশে মেঝের উপরই। অপর্ণা খোকার পরিষ্কার তোয়ালেটা ওর গায়ে ঢাকা দিয়ে দিল !

একঘুমেই রাত্রি শেষ হয়ে গেছে ; সূর্য্যোদয় হয়েছে। আলোক উঠেই দেখলো, বৃষ্টি থেমেছে ; অপর্ণা তার জামাকাপড়গুলো কেচে শুকুতে দিচ্ছে বাইরের দেওয়ালে। ওকে উঠতে দেখে বললো—ঐ দিকপানে কল আছে দাদাবাবু, হাতমুখ ধুয়ে এসো।

প্রাতঃকৃত্য শেষ করে এসে আলোক দেখলো—অপর্ণা চা কিনে এনেছে, তার সঙ্গে মুড়ি। ওকে খেতে দিয়ে বলল—খোকার একটি নাম রেখে দাও তো দাদাবাবু !

—নাম ! ওর নাম থাক জীবন-রুদ্র !—আলোকের মুখ থেকে অকস্মাৎ কথাটা বেরিয়ে গেল !

—জীবন ! বেশ নাম। আমি 'জীবন' বলে ডাকবো।

—হ্যাঁ—আমি 'রুদ্র' বলে ডাকবো।

আলোক চা-মুড়ি শেষ করে বাইরে বেরিয়ে আসছে, অপর্ণা হেসে বললো—এখন বেরিও না দাদাবাবু, তুমি আমার শাড়ী পরে আছ।

আলোক লজ্জিত হয়ে বসে পড়লো আবার। একটা হকার কাগজ বিক্রী করতে করতে যাচ্ছে, অপর্ণা কাপড়ের খুঁট থেকে দু' আনি বের করে বলল—দাও একখানা ভাল কগজ !—কাগজ নিয়ে দিল আলোকের

হাতে। বলল,—যারা ভিটে ছেড়ে চলে গেছে, তাদের কোন খবর আছে কিনা দেখতো দাদাবাবু!

আলোক নিঃশব্দে ওর মুখ পানে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ!

কিন্তু খবরের কাগজ-ওয়ালাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ! সমষ্টিগত-ভাবে কিঞ্চিৎ খবর দেবার ওঁরা চেষ্টা করেন, ব্যষ্টিগতভাবে এই বিরাট দেশের খবরাখবর দেওয়া প্রায় অসম্ভব, এবং সম্ভাবনার চেষ্টাও সঙ্কুচিত। আলোক অপর্ণার মুখপানে চেয়ে ভাবছে, কী আকুল আগ্রহ ঐ নারীর চোখে-মুখে! আপন আত্মজনের জন্য প্রাণ ওর কতখানি ব্যাকুল! কিন্তু যে দুর্ভাগারা গৃহ ছেড়ে চলে গেছে, তাদের উদ্দেশ পাওয়া যে আজ অসম্ভব, এ তত্ত্ব ওর বিরহী মন বুঝতে চায় না।

আলোক খবরের কাগজখানা পড়তে লাগলো। বড় বড় হরফে উড়োজাহাজের উচ্চ রাজনৈতিক সংবাদ—মাঝারি হরফে মন্তব্যের সঙ্গে মানসিকতা মিশিয়ে এক ভাবগ্রাহী উচ্ছ্বাস, আর সাধারণ হরফে অসাধারণ সব কথার স্ফুলিঙ্গ! খুব ছোট অক্ষরেও সংবাদ যথেষ্টই আছে। কিন্তু সেগুলো শুধু সংবাদ এবং সেই গুলোই আলোকের কাছে অধিক মূল্যবান বোধ হোল। কিন্তু অপর্ণাকে সান্ত্বনা দেবার মত কোনো সংবাদই সে খুঁজে পেল না।

নিরাশ হয়ে অপর্ণা উঠে চলে গেল—খোকাকে কোলে নিয়েই বেরিয়ে গেল। আলোক প্রায় দীর্ঘ একমাস যাবৎ সংবাদপত্র পড়তে পায় নি, আজ সে দুচোখ ডুবিয়ে সমস্ত কাগজখানা পড়তে লাগলো। তন্ময় হয়ে পড়ছে; বাইরে ভূমিকম্প হলেও সে টের পাবে না—সবটা শেষ করে এবার বিজ্ঞাপন পড়ছে। একটা বিজ্ঞাপনে ওর নজর আটকে গেলো।

'কর্ম্মী চাই :—বিশ্বেশ্বরী নিকেতনের জন্য প্রচারকার্য্যে অভিজ্ঞ সুশিক্ষিত এবং ত্যাগব্রতধারী কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা কর্ম্মী আবশ্যক।

আহার, বাসস্থান এবং যৎকিঞ্চিৎ হাতখরচ দেওয়া হইবে। সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করুন '

অনেকগুলো বিজ্ঞাপন পড়ার মধ্যে এটাও পড়লো আলোক। কিসের জন্য এই নিকেতন, কি কাজ ওখানে হয়, কোনো কথাই লেখা নেই, তবে 'সুশিক্ষিত এবং ত্যাগী' কথা দুটোতে জানা যাচ্ছে, কাজটা ভাল কাজ! আলোক একবার যাবে নাকি ওখানে! সত্যি ভাল কাজ হলে কাজে লেগে যেতে পারে। এমন করে অপর্ণা বা ঝুমনীর খাদ্যে ভাগ বসিয়ে তার তো চালানো উচিত নয়।

বাইরে ভয়ঙ্কর গোলমাল শোনা যাচ্ছে। কতক্ষণ থেকে গোলমাল হচ্ছে কে জানে। বেলাই বা কতটা হয়েছে, আলোক টের পাচ্ছে না। অপর্ণা এখনো ফিরলো না, তার ঘরখানি শূন্য ফেলে রেখে আলোক তো চলে যেতে পারে না; বিজ্ঞাপনটা পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়ে আলোক বসে বসে ভাবতে লাগলো, ঐ সাবানে-কাচা পরিষ্কার জামাকাপড় পরে সে আজই যাবে বিশ্বেশ্বরী নিকেতনে।

গোলমালটা অত্যন্ত নিকটে; যেন সহরের বিশাল জনসমুদ্র অকস্মাৎ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে অগ্ন্যুৎপাতে;—আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত আসছে। কী এ? এত চীৎকার, আর্তনাদ, উচ্চ ধ্বনি একসঙ্গে, এ কিসের প্রকাশ-পরিণাম! প্রলয় নাকি? উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলো অপর্ণা; মুখে তার ফেনা ঝরছে যেন, মাতালের মত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো খোকাকে কোলে নিয়ে—; একেবারে কোণার দিকে বসলো গিয়ে!

—কি হয়েছে—অপর্ণা?

—চুপ্!……অপর্ণার আওয়াজ এবং ইঙ্গিত একসঙ্গে! নিদারুণ দুশ্চিন্তায় আলোক অস্থির হয়ে উঠলো, কিন্তু অপর্ণা ক্রমাগত নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ থাকতে বলছে। ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, বাইরের গোলমালটা যেন দূরে সরে যাচ্ছে; অপর্ণা এতক্ষণে খোকাকে

কোল থেকে নামিয়ে শোয়ালো ;—আলোকের কাছে সরে এসে বললো, —দাঙ্গা লেগেছে, দাদাবাবু, যুদ্ধু করছে! আর হয়তো বাঁচলাম না দাদাবাবু!

—যুদ্ধু! আলোক অবাক হয়ে চাইল ওর মুখপানে! যুদ্ধ কার সঙ্গে কে করবে! এদেশে যুদ্ধ করবার মত শত্রু কোথায়! ইংরাজ এদেশের সম্রাট, আর এদেশে বাস করে যারা তারা তো সকলেই শাসিত এবং শোষিত! ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করবার মত শক্তি বা সাহস কোনোটাই তাদের নেই, তবে যুদ্ধ কে কার সঙ্গে করছে! অপর্ণা নিশ্চয় ভুল শুনেছে। আলোক জিজ্ঞাসা করলো—কার সঙ্গে কে যুদ্ধ করছে?

—তা জানি না! দেখে এলাম হরদম চেঁচামেচি চলছে। আর কে যে কোন্ দিকে ছুটে পালাচ্ছে দাদাবাবু, উঃ উঃ!

আলোক কিছুই বুঝতে পারলো না। বাইরে গিয়ে দেখে আসবার কথা বলতেই অপর্ণা ওর কাপড় ধরে বললো—না দাদা, আমার মরতে ভয় নাই। কিন্তু তোমাকে ওখানে যেতে দেব না। তুমি খোকাকে দেখো, আমি যেয়ে খবর নিয়ে আসি!

অপর্ণা বেরিয়ে গেল খোকাকে রেখে। খোকা ঘুমুচ্ছে। আলোক ডাকলো—রুদ্র! আর কত ঘুমুবে! জাগো! জীবনের জয়গানে মাতিয়ে তোল তোমার মাতৃভূমির আকাশ-বাতাস। ক্রন্দনে মন্থিত হচ্ছে জনসমুদ্র, এবার হে নীলকণ্ঠ, এই মহাবিষ পান করে মিলনের অমৃত বণ্টন করে দাও! মানুষ অমর হোক!

ছেলেটা সত্যি জেগে উঠলো, কেঁদে উঠলো! নিরুপায় আলোক তাকে কোলে তুলে চুপ করাবার চেষ্টা করছে। হয়তো খিদেতে কাঁদছে ও। হরলিকস্এর বোতল থেকে গুঁড়ো বের করে আলোক নিজের বুড়ো আঙুলে লাগিয়ে ওকে চোষাতে লাগল। বিলাতী খাদ্যের

বিজাতীয়তায় ওর জীবনপদ্ম অপবিত্র হবে না—ও রুদ্র, ও শ্মশানচারী শব-সাধক, ওর কিছুতেই অপবিত্রতা নেই। ও চিরশুদ্ধ অগ্নি; ও জাতবেদস্; কিন্তু গোলমালটা আবার আসছে, এবার অত্যন্ত নিকটে। আলোকের ভয় করতে লাগলো। কোথায় অপর্ণা? বেলা দুটো-তিনটের কম নয়। অপর্ণা কি ঐ হাঙ্গামার মধ্যে পড়লো গিয়ে?

না—অপর্ণা ফিরে এলো, কিন্তু বিশেষ কোনো খবর আনতে পারলো না। বললো,—রাস্তায় কোনো মানুষ চলছে না দাদাবাবু। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে; আর লাঠি-ছুরি-বর্শা হাতে দলে দলে সব গুণ্ডারা যাকে সামনে পাচ্ছে তাড়া করছে! আমি প্রায় কুড়ি-পঁচিশজনকে পালাতে দেখলাম!

—পুলিশ নেই?—আলোক শুধুলো!

—কৈ? দেখলাম না তো!—এখানে থাকা আর উচিৎ নয় দাদাবাবু!

—কোথায় যাবে? যাবার জায়গা তো নেই আমাদের!

সত্যি কথা! অপর্ণা বললো,—তুমি সকালে চলে গেলেই ভাল করতে দাদাবাবু; আমার কাছে এসে তোমার হয়ত বা প্রাণটা যায়। আমার যা হয় হবে।

—আমারও তাই হবে। অত ভাবছো কেন?—আলোক সান্ত্বনা দিল অপর্ণাকে!

কিন্তু চতুর্দ্দিক থেকে বিকট গর্জ্জনধ্বনি, তার সঙ্গে করুণ আর্ত্তধ্বনি আসতে লাগলো ওদের কানে। জনমানবশূন্য রাজপথপানে চেয়ে আলোক দেখলো, জীবন যেন রণে ভঙ্গ দিয়ে পশ্চাৎপদ হয়েছে। মৃত্যু যেন প্রতি মুহূর্ত্তে এগিয়ে আসছে গ্রাস করতে মানুষকে! রুদ্রদেবতার একি নিষ্ঠুর খেলা! নিয়তির একি ক্রূরতম বিবর্ত্তন-যাত্রা!

সন্ধ্যা নেমে এলো, রাজপথে আলো কোথাও জ্বললো, কোথাও

জ্বললো না। রাত্রির গভীর অন্ধকারকে ঘনায়িত করে নামলো শ্রাবণের বাদল-ধারা—দুর্য্যোগের তিমির রাত্রি বিদীর্ণ করে জ্বলে উঠতে লাগলো বজ্রালোক ; ভীত শশক-শিশুর মত শুয়ে রয়েছে অপর্ণার কোলে বালক রুদ্র !

আলো জ্বলে নি অপর্ণার কুটিরে আজ, কিন্তু ক্ষুধা-রাক্ষসী দন্তবিকাশ করছে ওদের উদরে। খাদ্য সেই—শুধু খাদকের দল ঘুরছে হিংস্র হায়েনার মত। একি বিপ্লব ! একি বিপর্য্যয় মানুষের শান্ত সমাহিত গৃহজীবনে ! কিসের জন্য এই বিড়ম্বনা ? কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির এই আত্মঘাতী নীতি ?—কে এই বিদ্বেষ-বহ্নির প্ররোচক এবং কে প্রতিগ্রাহক ? আলোক স্তব্ধ বিস্ময়ে ভেবে চলেছে, অপর্ণা নিঃশব্দে বসে আছে খোকাকে কোলে নিয়ে। মাঝে মাঝে বিকট আওয়াজ ওদের বিভীষিকা দেখাচ্ছে যেন, আবার ধীরে ধীরে রাত্রির স্তব্ধতা জাগিয়ে তুলছে ওদের প্রাণে জীবনের আশালোক !

রাত শেষ হোল, কিন্তু বিপর্য্যয় শেষ হোল না। অপর্ণা বহু চেষ্টা করেও একখানা খবরের কাগজ আজ সংগ্রহ করতে পারলো না আলোকের জন্য ! সমস্ত দিন ঘরে বন্দী ওরা—খাদ্য যৎসামান্য যা-কিছু ছিল অপর্ণার, শেষ হয়ে গেছে গতরাত্রেই। আজ দিন ভোর উপবাস চলছে। আলোক মরিয়া হয়ে বেরুতে গেল, অপর্ণা পায়ে ধরে বলল,

—না—দাদাবাবু, না ! রাস্তার অবস্থা দেখে ভিরমী লেগে যাবে তোমার—রক্ষে করো, যেও না।

আবার রাত্রি এল ! বর্ষার বর্ষণ এবং শরতের সৌন্দর্য্য নিয়েই এল রাত্রি—নিবিড় তিমির ভেদ করে আকাশে ফুটে উঠলো তারার ফুল, কালপুরুষ তার ধনুকে তীর যোজনা করছেন······

—তীব্র, তীক্ষ্ণ ভেরীরব, হুইসিল, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধ্বনি ! হুঙ্কারধ্বনি !

মানুষ যখন বীভৎস বিপ্লবে মত্ত হয়ে অমানুষ হয়ে যায়, তখনো তার সৌন্দর্য্যজ্ঞান অটুট থাকে! বিপর্য্যয়কেও বরণ করতে সে জয়ধ্বনি করে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেও সে মঙ্গলধ্বনি করে! আশ্চর্য্য! আলোক শুনতে লাগলো—ধ্বনিটা উত্তরপ্রান্ত থেকে দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত বয়ে বয়ে গেল ছাতে ছাতে, বিশাল একটি তরঙ্গবৎ! মৃত্যুর জন্য মানুষের এই প্রস্তুতির মধ্যেও ললিতকলার আশ্চর্য্য বিকাশ! জীবন এইখানেই জয়ী—এখানেই সে মৃত্যুকে পরাভূত করেছে আপন অন্তরের সুষমা দিয়ে। এখানেই সে অমর!

এই অমরত্ব তার পরাজয়ের গ্লানিকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে যুগ-যুগান্তর ইতিহাসের অভিশপ্ত দিনগুলিকে সে অভিনন্দিত করতে পারে তার বীরত্ব-শৌর্য্যের স্মৃতি সুষমা দিয়ে।

আবার উঠলো উদাত্ত ধ্বনি! হিল্লোলিত মহাসমুদ্র যেন তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে আলোড়িত হয়ে অমৃতমন্থন করছে; যেন ভূমিকম্পের ভয়াবহ বীভৎসতার মধ্যে এই মহা-ধ্বনির আশ্বাসবাণী—; প্রাসাদশীর্ষ থেকে সে ধ্বনি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে বয়ে যাচ্ছে সহরের কণ্ঠ থেকে উপকণ্ঠে, অন্ধকার পৃথিবী থেকে আকাশের জ্যোতির্ম্ময় বিস্তারে! চীৎকার, হোলাহল, মরণান্ত আর্ত্তনাদ সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে শৌর্য্যসম্পদে গরীমাময় মানুষের জয়ধ্বনির এই আশ্চর্য্য মত্ত-সৌন্দর্য্য সত্যিই ভীষণ-মনোভিরাম! মানুষ এই অপূর্ব্ব মাদকতাতেই মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলে অকুণ্ঠিত পদে, অবিচল হৃদয়ে—অনাস্বাদিত অমৃতাশায়।

আবার কোলাহল; চীৎকার, গর্জ্জন, হুঙ্কার! ক্রম্—ক্রম্—ক্রম্! মারণাস্ত্রের গগনভেদী মরণোল্লাস! উঃ! কি এ? মানুষের ইতিহাসকে

কি আজ আগুনের অক্ষরে লিখছে বিধাতা, কিম্বা রুদ্র তাঁর জটাজাল মেলে অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করেছেন—কিম্বা……না, আলোক ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। এবার যেন খুব কাছে, মরণ যেন মুখোমুখী হয়ে উঠলো! অদ্ভুত! অপর্ণা কোণে বসে কাঁপছিল এতক্ষণ ঠক্ ঠক্ করে। অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললো—একে বাঁচাতে হবে দাদা, যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে। মরতে আমার এতোটুকু দুঃখু নেই, কিন্তু তোমাদের আমি বাঁচাবোই। তুমি একে ধরো—আমি দেখি বাইরে গিয়ে।

বিদ্যুৎবেগে ছেলেটাকে আলোকের কোলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল অপর্ণা। অসমসাহসিকা ওর শক্তিমূর্ত্তি আলোক দেখতে পেল না অন্ধকারে, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর শুনলো,

—দাদা, ভয় নাই!

যেন ভৈরবীর অভয়বাণী! আলোক আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করছে; গোলমালটা ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে লাগলো—যেন বিশাল একটা মৃত্যু-তরঙ্গ কূলের উপরকার কয়েকটা জীবকে কৃপা করে রেখে দিয়ে গেল। আবার আসবে, যে-কোন মুহূর্ত্তে আসতে পারে। অপর্ণা ফিরে এলো। ছেলেটা দারুণ কাঁদছে কয়েক মিনিট ধরে। ওর খিদের কথা কারো মনে ছিল না এদের। অপর্ণারই মনে পড়লো প্রথম—ইস্! সেই বেলা দুটোতে খেয়েছে!

ঘরের মধ্যেই কাঠকুচি দিয়ে আগুন জ্বালালো অপর্ণা। জল গরম করলো। হরলিক্স যতটা আছে সবটা দিয়ে তৈরী করলো খাবার—তার প্রায় অর্দ্ধেক একটা ফুটো টিনে আলোককে এগিয়ে দিয়ে বাকিটুকু ছেলেকে খাওয়াতে বসল। আলোক সবিস্ময়ে শুধুলো—সকালে কি দেবে ওকে? তুমিই বা এখন খাবে কি?

—সকালে যদি ও বাঁচে তো খাবারও জুটবে। আমার এক-আধ

রাত না খেলে কিছু হয় না দাদা, তুমি খাও! লক্ষ্মীটি, আমায় দিও না; খাও, আমার মাথার দিব্যি, খাও!

মাতৃজাতির মহিমময় প্রকাশ! আলোক নিঃশব্দে টিনটা তুলে নিল। লজ্জায় ওর মরে যাবার কথা, কিন্তু মরণের কথা ও এখন চিন্তা করছে না; জীবনের রুদ্র সাধনায় ও এতো সহজে ব্যর্থ হবে না—ওকে সিদ্ধিলাভ করতে হবে। আলোক দুধটুকু আস্তে খেতে লাগলো। অপর্ণা ছেলেটাকে অনেকখানি দুধ খাইয়েও শেষ করতে পারলো না—অবশিষ্টটুকু নিজে পান করলো। এর মধ্যে বাইরের গণ্ডগোল কয়েকবার বেড়েছে, আবার কমেছে, ওরা খোঁজ রাখে নি। ধীরে ধীরে যেন এই বীভৎস পরিস্থিতিতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে আসছে। সত্যি, অতখানি আতঙ্কের মধ্যেও আলোক ঘুমিয়ে গেল! একেই বলে জীবন-রুদ্র! প্রেতায়িত শ্মশানেও তিনি শব—নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, সমাধিস্থ! জীবন এবং মৃত্যু তাঁর দুই চক্ষে নিদ্রিত আর জাগ্রত থাকে কিন্তু তাঁর তৃতীয় নয়ন—সে নয়ন জীবন-মৃত্যু অতিক্রমকারী অবিনশ্বর জীবনায়ন, ধ্বংসেই যাঁর সৃষ্টিশক্তির বীর্য্য-সঞ্চার, প্রলয়েই যাঁর পালনের মহতী ঔদার্য্য!

উষার আবির্ভাব অনন্ত আশ্বাস জাগিয়ে তুললো সহরবাসীর বুকে। আজ নিশ্চয় শান্ত মানুষের সহজ জীবন আবার ফিরে আসবে; কিন্তু কোথায়? আতঙ্ক আর আর্ত্ততা যেন গ্রাস করেছে সারা সহরটাকে! সারাদিন উপবাসী আছে আলোক এবং অপর্ণা, কিন্তু অপর্ণা আশ্চর্য্য মাতা! ছেলেটাকে সে উপোস থাকতে দেয়নি। দোকানপাট সমস্ত বন্ধ, রাস্তায় মানুষ কদাচিৎ দেখা যাচ্ছে, সেই শ্মশানপুরীতেও অপর্ণা বেরিয়ে কোত্থেকে এক ভাঁড় দুধ সংগ্রহ করে এনেছে। আলোক জিজ্ঞাসা করলো—কোথায় পেলে?

—পেলাম। ওপাশে গোয়ালারা থাকে; বেশি দিতে পারলো না, এইটুকু দিল।

গরম করে তাই বার দু'তিন খাওয়ানো হয়েছে ছেলেটাকে, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে আলোকের উদরে ক্ষুধাদেবী প্রচণ্ড হয়ে উঠলেন। অস্থির হয়ে সে অপর্ণাকে বললো,

—আমাকে যেতে দাও অপর্ণা! এমন করে সকলের না খেয়ে মরে লাভ কি?

—গেলেই তুমি খেতে পাবে না দাদাবাবু! খাবার কোথাও পাওয়া যাবে না; আমি সব দেখে এলাম।

আলোক তথাপি বেরিয়ে কিছুটা দূরে গেল। জনমানব শূন্য প্রেত-পুরীর মত দেখাচ্ছে সমস্ত রাস্তাটা! ভয়ভয় করতে লাগলো আলোকের। সে ফিরে এল আবার অপর্ণার আশ্রয়ে। রাত্রি গভীর হয়ে চলেছে; চীৎকার, কোলাহল এবং বন্দুকের আওয়াজ বারম্বার শ্রবণযন্ত্রকে পীড়িত করে তুলছে! মানুষ যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে এই তিনটা দিন ধরে। তবুও মানুষ অমর; মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে অবিশ্রাম চলেছে তার সংগ্রাম—আপনাকে উচ্ছিন্ন করে দিতে কিছুতেই সে চায় না—যেমন করে হোক, ভ্রূণবীজকে সে রেখে যাবে মৃত্যুচিতার ভস্মস্তূপেও! অপর্ণার কেউ নয় ঐ ছেলেটা, তথাপি অপর্ণা তাকে বাঁচাবে—ঐ ভ্রূণাঙ্কুরকে রেখে যাবে বিশাল মহীরুহে পরিণত হবার জন্য। ওর মা ওকে মৃত ভেবে ফেলে দিয়ে গেছে, কিন্তু অপর্ণা ওকে মরতে দেবে না—অপর্ণা ওকে অমর করে যাবে আপন মৃত্যু দিয়ে।

সত্যি মৃত্যু এসে দাঁড়ালো অন্ধকার ঘরটার দরজায়। প্রকাণ্ড যষ্টি তার হাতে—!

—কে? প্রশ্নটা আলোকের গলার স্বরে ফুটলো না, আটকে রইলো বুকের ধ্বক্‌ধ্বক্ আওয়াজের মধ্যে! টর্চ্চের তীব্র ফোকাস করে আগন্তুক দেখলো ওদের; আলোক ওর উদ্যত যষ্টি মাথায় নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে চোখ বুজেছে, কিন্তু যষ্টি পড়লো না—সশ্রদ্ধ অভিবাদন এলো কাণে,

—বাবুজি! আপ্ হিঁয়া হ্যায়! জয় ভগবান! হামি আপকে লিয়ে কেৎনা ঘুরলাম—জয় ভগবান! আপনে বেঁচে আছেন বাবুজি, বহুৎ বহুৎ খুস্ হইলাম! আউর অপর্না দিদি—তুমিভি তো ভালই আছ! কুছ ডর নেহি; আব্ গোলমাল থাম্ যাবে—কুছ ডর নেহি।

কিশোর! ঐ অদ্ভুত পথচারী বালক এই নিদারুণ বিপদ মাথায় নিয়ে আলোকের খোঁজ করেছে, অপর্ণাকে দেখতে এসেছে! আর আলোক? অপর্ণার আঁচল ধরে বসে কোটরাশ্রয় করে আছে আজ তিন দিন। ধিক্! আলোক লজ্জাতে অধোবদন হয়ে গেল; কিন্তু কিশোর ওসব লক্ষ্য করলো না, বললো—খানাপিনার বড়ি কষ্ট হইয়াছে বাবুজি? ক্যা করেগা! আভি তো কুছ মিলানে সেকেগা নেহি! উ লেড়কা ক্যা খায়া?

—দিনে দুবার দুধ খাইয়েছি কিশোর। খিদেতে ও হয়তো মরে যাবে।—অপর্ণা বললো।

—আহা! নেহি দিদি! হামি দেখ্ছে।

পর মুহূর্তেই ঘরে অন্ধকার করে কিশোর বেরিয়ে গেল। কোথায় গেল কে জানে! শ্মশানচারী শিব ও; ও কোনোদিন শবরূপ ধারণ করে না। ও সদা জাগ্রত, অতন্দ্র, অনলস, অভয়মন্ত্রের উদ্গাতা! কিন্তু আলোকের মন ওর স্তুতিগান করতে গিয়ে নিজের উপর অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠলো! নিজকে ও যেন ক্ষমা করতে পারছে না। ওর কাপুরুষতা ওকে শুধু লজ্জিত নয়, আত্মগ্লানিতে অবসন্ন করে তুলছে। আধঘণ্টা কেটে গেল ওর মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে! কিশোর ফিরে এলো—পাতার ঠোঙ্গায় ভর্তি খিচুড়ী, মাটির গেলাসে এক গ্লাস দুধ। আলোক শুধুলো,

—এই ডামাডোলের বাজারে এ সব কোথায় পেলে কিশোর?

—আশ্রয় কেন্দর্ খুলিয়াছে বাবুজি। চলেন ত আপনাদের ওখানে লিয়ে যাব!

মানুষ বাঁচবার সাধনায় মেতেছে। বাঁচতে হবে, তাই একতা চাই, আশ্রয়-স্থল চাই—খাদ্য পানীয় চাই। চাই সঙ্ঘবদ্ধতা, সমাজচৈতন্য, ধর্ম্ম-সমন্বয়! কিন্তু কে করবে? করবে—এই আহবের আহুতিতে ভস্ম হয়ে যাবে কদর্য্য-কালিমার আবর্জ্জনাস্তুপ, শুধু থাকবে হিরণ্যগর্ভ মানুষ, মানবিক চৈতন্য, মানবীয় জীবন-বেদ!

দুধটা গরম, অপর্ণা তৎক্ষণাৎ ছেলেকে খাওয়াতে বসে গেল। ক্ষুধার জ্বালায় ছেলেটা ঘুমুতে পারছিল না—এতক্ষণে চুপ করে ঘুমুতে লাগলো। কিন্তু আলোকের কিছু খেতে রুচি হচ্ছে না। নিজেকে ওর অতখানি হীন এবং নীচ আর কোনোদিন হতে হয় নি, এমন কি ঝুমনীর খাদ্যে ভাগ বসিয়েও না, রুদ্রের হরলিক্‌স খেয়েও না; ডাষ্টবীনের খাদ্য-খুঁটে-খাওয়া নওলকিশোর ওর কাছে আজ শুধু দেবতা নয়—অভয়দাতা অমৃতময় মহারুদ্র, বিষপানকারী নীলকণ্ঠ!

কিন্তু অপর্ণা এগিয়ে এসে খাদ্য পরিবেশন করলো আলোককে। কিশোর বললো—হামি এক দফে বহুবাজার যাচ্ছে! হুঁয়া একঠো মাইজী আছেন, দেখে আসি।

—রাস্তায় বড় বিপদ কিশোর। কি করে যাবে?

—কুছ্‌ পরোয়া নেই বাবুজি! হামি উসব থোড়াই কেয়ার করে!

কিশোর চলে গেল, যাবার সময় আর একবার আশ্বাস দিয়ে গেল, সকালেই সে এসে তাদের আশ্রয়-শিবিরে নিয়ে যাবে। অপর্ণা ছেলে কোলে নিয়ে ঘুমিয়ে গেল, কিন্তু আলোকের মস্তিষ্কে অনন্ত চিন্তা—আত্ম-তিরস্কার—আত্মগ্লানি। দীর্ঘ—দীর্ঘ রাত্রি সে বসে রইল নীরবে—শুনতে লাগলো, মৃত্যুর তাণ্ডবের মধ্যে জীবনের বিজয়াভিযান-সঙ্গীত!

বিপর্য্যয়ের মধ্যে বিশ্বযন্ত্রের যন্ত্রী যেন নবতম সঙ্গীত-সাধনায় নিরত হয়েছেন ; নব সৃষ্টির প্রেরণা মানুষকে নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত করছে—নূতন মন্ত্রে জাগ্রত করছে।

এই বিপ্লবময় অগ্নিদাহে উৎপলার কর্ম্মপদ্ধতি নিঃশেষে ভস্মসাৎ হয়ে যেত, কিন্তু তার সব-কিছু রক্ষা করে দিলেন সেই বন্ধু ভদ্রলোক। কে জানে, কোন্ কৌশলে তিনি উৎপলার বিশ্বেশ্বরী-নিকেতনের দরজায় পাহারা বসিয়ে, উৎপলার আশ্রম-বাসিনীদের জন্য খাদ্য পানীয় প্রেরণ করে এমন ভাবে সুরক্ষিত রাখলেন যে ঐ মহা তাণ্ডবের মধ্যেও উৎপলার নিকেতন অক্ষত হয়ে অধিষ্ঠিত রইল। উৎপলা এর জন্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু সে-ভদ্রলোক আজ পক্ষকাল উৎপলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি! কে জানে, কেমন আছেন তিনি! তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক উৎপলার মনে অন্য একটা চিন্তার উদয় হোল।

এই বিপর্য্যয়কর পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসছে—সহজ জীবন ফিরে আসছে আবার সহরের প্রাণ-কেন্দ্রে। এই ক'দিনে যা-কিছু হয়ে গেল, যেন স্বপ্ন, যেন অতীত ইতিহাসের বিভীষিকাময় স্বপ্ন একটা। কিন্তু এবার মানুষের সহজ-সমাজে উৎপলার এই নিকেতনের স্থান হবে কোথায়? এ নিকেতন এখনো যথেষ্ট প্রচার-গৌরব লাভ করেনি, এখনো দেশের নেতৃস্থানীয় কেউ একে অভিষিক্ত করেন নি আশীর্ব্বাদে। এ নিকেতন এখনো উৎপলার একার শক্তি ও সাহসের উপর ভর করে রয়েছে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। দেশের মানুষের সস্নেহ সমর্থন এবং সাহায্য না পেলে এরকম কাজ চলতে পারে না। উৎপলা প্রচুর শিক্ষা লাভ করেছে, এই সব কাজ করার কালো দিক এবং আলোর দিক সে জানে। ঐ বন্ধুলোকটি এলে সে পরামর্শ করতে পারতো এ বিষয়ে।

কয়েকদিন টেলিফোন করে উৎপলা ব্যর্থ হয়েছে, আজ আবার ফোন করলো! তার ভাগ্য ভাল, ভদ্রলোক বললেন যে তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই

আসছেন। সানন্দে উৎপলা প্রসাধনে নিরতা হোল। তার শরীর এর মধ্যে যথেষ্ট সেরে উঠেছে এবং চোখে-মুখেও সজীবতা ফুটে উঠেছে। আশ্চর্য্য এই যে, এতখানি বিপর্য্যয়ের মধ্যে উৎপলার মনে বিশেষ কোনো আঁচড় লাগেনি ; এর কারণ, সে সব সময় মরবার জন্য প্রস্তুত ছিল। মরণ ওকে গ্রহণ করে নি, তাই জীবন ওকে নবজীবন দান করে গেল। উৎপলা আরো সুন্দর। হয়ে উঠেছে সহরের বাইরের এই নিকেতনের স্বাস্থ্যকর হাওয়ায়।

ঠিক তিন কোয়ার্টার পরেই এলেন ভদ্রলোক। উৎপলা অভিবাদন জানিয়ে শুধুলো—সকলেই বেশ ভাল আছেন আপনারা ?

—হ্যাঁ, তোমাদের সব কুশল তো ?

—হ্যাঁ ! বলে উৎপলা তাঁর সঙ্গে নানা পরামর্শ করতে লাগলো। সব কথাই এই বিশ্বেশ্বরী নিকেতনকে কেন্দ্র করে এবং এর স্থায়ীত্বের ব্যবস্থার জন্যই—কিন্তু ভদ্রলোক একদৃষ্টিতে উৎপলার মুখের পানে চেয়ে আছেন। উৎপলা এঁকে চেনে, কোন্ মতলবে ইনি কি ভাবে তাকান, তার কিছু পরিচয় উৎপলার বিদিত। তাই ওঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিতটা ধরতে সময় লাগলো না ; মুখ নামিয়ে উৎপলা ভাবলো—প্রসাধনের পারিপাট্যে সে নিজকে বিড়ম্বিত করেছে, নাকি তার স্বভাব-সৌন্দর্য্যেই এই লোকটিকে আকর্ষণ করছে !—যাই হোক্ উৎপলার চিন্তিত হবার কোনো কারণই নেই, তবু উৎপলা কেমন সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো।

ঠিক সেই সময়ে এলো একটি যুবক, বাইরে থেকেই বিনম্রভাবে বললো,—আসতে পারি কি ?

—আসুন ! উৎপলা যেন বেঁচে গেল তার দুশ্চিন্তা থেকে। ভদ্রলোক কিন্তু বিরক্ত হলেন এমন অতর্কিতে একজন অপরিচিত ব্যক্তির প্রবেশে। আপনার মনে বললেন,

—ভাল একটা বেয়ারা রাখা দরকার। এমন অকস্মাৎ কেউ যাতে না আসতে পারে।

—হ্যাঁ, কিন্তু চাকর-দারয়ান-বেয়ারা পাওয়া আজকাল বড্ড কঠিন। বলে উৎপলা আগন্তুককে বললো—কি চান আপনি ?

পুরানো খবরের কাগজটার ভাঁজ খুলে আলোক পেনশিল-মার্কা যায়গাটা দেখিয়ে বললো—এই বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি। কাজ কি খালি আছে এখনো ?

—হ্যাঁ, আছে! বসুন! আমরা দশ পনর জন লোক চাই! এই গোলমালের জন্য বড় কেউ আসছেন না। আপনি কি ও কাজ নিতে রাজি আছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! কিন্তু আমি খুব ত্যাগী মানুষ নই; আহার, বাসস্থান ছাড়াও আমার আরো কিছু দরকার। দেখুন না, এই জামাকাপড়—, কোনোরকমে সাবান ঘষে এসেছি।

উৎপলা ওর পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল। সুন্দর সুগঠিত দেহে ওর অখাদ্যের অপুষ্টি, কিন্তু চোখে অপরিসীম উজ্জ্বলতা! ও যে অভিজাত বংশজাত, তা মুহূর্ত্তে বোঝা যায়—বললো,

—আমাদের ফাণ্ড খুব বেশি নয়, আপনাকে মাসিক পঁচিশ টাকার বেশি হাত-খরচ দিতে পারব না।

—বেশ, ওতেই হবে। এখন বলুন, কি এখানকার কাজ ? আমায় কি করতে হবে ?

উৎপলা ধীরে ধীরে বললো তার কাজের উদ্দেশ্য, তার কর্ম্মপন্থা, তার বাধাবিঘ্নের আশঙ্কা এবং অর্থ-সংগ্রহের উপায়। আলোক নীরবে শুনে গেল।

—তুমি লেখাপড়া কতদূর শিখেছ ?—বন্ধু ভদ্রলোক এতক্ষণ পরে শুধুলেন চুরুট টানতে টানতে।

—এম্-এ পাশ করেছিলাম। তারপর গবেষণা করবার

—থাক—থাক! ওর বেশি বিত্তের আমাদের দরকার নেই—উৎপলা হেসেই বললো।

—কাগজে-পত্রে এই কাজের কথা প্রচার করতে হবে, বক্তৃতাও দিতে হবে মাঝে মাঝে—পারবে তো?

ভদ্রলোক পুনরায় প্রশ্ন করলেন আলোককে। আলোক সবিনয়ে জানালো,

—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমার অভ্যাস আছে।

অতঃপর সব ঠিক হয়ে গেল; এমন কি, আলোক ঐ বাড়ীর নীচের তলার কোন্ ঘরটায় থাকবে, সে-ব্যবস্থা পর্য্যন্ত। সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নাই। সহরে সান্ধ্য-আইন থাকার জন্য ভদ্রলোককে উঠতে হবে, তিনি উৎপলাকে বললেন,

—তুমি কি বাড়ী যাবে না কি? যাও তো আমার গাড়ীতেই চলো, নামিয়ে দিয়ে যাব!

—হ্যাঁ, যাব—বলে উৎপলা আলোককে শুধুলো—আপনি কি আজ থেকেই থাকবেন এখানে?

—আজ্ঞে না। আমি যেখানে থাকি সেখানে একবার যেতে হবে। কাল আমি আসবো!

—তাহলে আসুন, আমাদের গাড়ীতেই চলুন—বলে আমন্ত্রণ করলো ওকে উৎপলা। আত্মরক্ষার এই সহজ উপায়টা সে অবলম্বন করতে বাধ্য হোল আজ। বন্ধুটির সঙ্গে একা-গাড়ীতে সে এই সন্ধ্যার অন্ধকারে যেতে চায় না। আলোক যেন বুঝলো তার অন্তর—শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে উঠলো মন তার এই নারীর প্রতি; কিন্তু বন্ধুটি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁর মুখখানা বিরক্তিতে কালো হয়ে উঠলো,—আলোক লক্ষ্য করে বললো—থাক, আমি হেঁটেই চলে যেতে পারবো। রাস্তার বিপদাপদকে আমার খুব ভয় নেই।

—কিন্তু আমার ভয় আছে। আপনি আজ থেকে আমার সহকর্মী; আপনার জীবন আমার কাছে এবং আশ্রমের কাছে মূল্যবান।—আসুন! —বলে উৎপলা স্বহস্তে গাড়ীর দরজা খুলে দিল আলোকের জন্য। নিরুপায় আলোক উঠে বসলো পিছনের সীটে—আর সামনের আসনে চালক বন্ধু এবং তাঁর পাশে উৎপলা!—গাড়ী চলছে!

সন্ধ্যার আলোছায়ামাখা শান্ত পথ—সুন্দর; কিন্তু নির্জ্জনতায় যেন মৃত-শক্তির কঙ্কালের মত করুণ! আলোক দেখছে আর ভাবছে। চাকরীটা নিল সে—না নিলেও খুব ক্ষতি হোত না; ঝুমনীর খাদ্য, অপর্ণার ভিক্ষা আর আশ্রয়কেন্দ্রের আতিথ্য যোগাড় করে সে এই কয়দিন মন্দ কাটায় নি। কিন্তু তার ঘৃণা জন্মে গেছে নিজের পৌরুষ শক্তির উপর। সে বুঝেছে, সে রুদ্র-জীবনের সাধক নয়। সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের সহজ জীবনের সাধনা করবে। এই পক্ষকালের ভয়কম্পমান ভীষণ জীবন ওকে কুকুরের থেকেও ঘৃণিত জীবের পর্য্যায়ে নামিয়েছে—অপর্ণার আশ্রয় যেন পক্ষপুট দিয়ে লালন করছে ওকে! সেই অপর্ণা অত্যন্ত অসুস্থ। জ্বরের ঘোরে ক্রমাগত ভুল বকছে আজ তিনদিন যাবৎ। তার ছেলে আজ সমস্ত দিন অনাহারে আছে—আলোক এক ফোঁটা দুধের যোগাড় করতে পারে নি; তাই ঐ বিজ্ঞাপন সে আবার বার করেছিল বইএর পুঁটলীটা থেকে। কিন্তু চাকরী হলেও পয়সা তো সে এখনি পাবে না! অপর্ণাকে ওষুদ দেবার এবং রুদ্রকে খাদ্য দেবার ব্যবস্থা কি হবে!

—আমায় দু-একটা টাকা আপনি আগাম দিতে পারেন?—আলোক বলে ফেললো। দুজনেই ওরা তাকালো পিছন ফিরে! আলোক আবার বললো—বাড়ীতে অসুখ, ছেলের দুধ চাই!

—আপনার ছেলে?—উৎপলা প্রশ্ন করলো!

—না—আমার বোনের। বোনেরও খুব অসুখ, হয়তো বাঁচবে না! উৎপলা ব্যাগ খুলে পাঁচ টাকার একখানা নোট দিল আলোকের

হাতে! কৃতজ্ঞ আলোক মাথা নামিয়ে ধন্যবাদ দিল ওকে। এই নারীর মহিমান্বিত মুখে মাতৃত্বের অলৌকিক জ্যোতি মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল—আলোক দেখলো, এই প্রসাধনপুষ্টা বিলাসবতীর মধ্যেও সেই বিশ্বজননীর আবির্ভাব!—কিন্তু গাড়ী এসে দাঁড়ালো প্রকাণ্ড বাড়ীটার কাছে। আলোকের পরিচিত বাড়ী। উৎপলা নেমে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। আলোকও নামলো—কিন্তু কে এই নারী? কে এ? এই কি সেই দুর্যোগরাত্রির নায়িকা?

অনাহারে আর অখাদ্যে-কুখাদ্যে এই অসুখটা বাধালো অপর্ণা। আশ্রয়-কেন্দ্র ওকে আশ্রয় দিয়েছিল দিন সাতেক, কিন্তু তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং সাহায্যও আশানুরূপ এলো না সবক্ষেত্রে। কাজেই সক্ষমদের সরিয়ে দিতে হোল। অপর্ণা এবং আলোক পড়লো এই দলে। কয়েক দিনের অবিশ্রাম বিশ্রামলাভ এবং অবিরাম দুর্গত মানুষের মিছিল দেখতে দেখতে আলোকের চিন্তাশীল মন জ্বরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তাই শেষটায় সে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল প্রায়; অকর্ম্মণ্য দেহমন যেন শামুকের মত গুটিয়ে গিয়েছিল ওর। কিন্তু অপর্ণা বরাবর ছিল সতেজ, সক্ষম! আশ্রয়-কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসেও সে দু-তিন দিন ভালই কাটালো—কিন্তু নিদারুণ খাদ্যাভাব ওদের জীবনকে পঙ্কিল করে তুললো; কদর্য্য করে দিল অনাহার এবং অভাবের তাড়নায়।

সেই রুক্ষ মলিন বেশ নিয়ে ওরা সহরের জনতার মধ্যে না গিয়ে ভালই করেছে। ওরা এসে আশ্রয় নিল সহরের বাইরে গঙ্গার ধারের বিরলবসতি একটা বড় গুদামঘরের ছাঁচকোলে। হাত দুই চওড়া এবং পঞ্চাশ-ষাট্ হাত লম্বা এই ছাঁচাটায় আরো দু' তিনটি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে—কেউ

কাউকে চেনে না ; চিনবার চেষ্টাও নেই কারো। আপন দুঃখের সাগরেই ওরা নিমগ্ন! অবসর ওদের সব সময়ই, কিন্তু সব সময়ই আহার্য্য-চেষ্টা অন্তরে জাগে। অপরের সঙ্গে আলাপ বা সুখ-দুঃখের অংশ ভাগ করে নিতে ওরা একান্ত বিমুখ।

অপর্ণা এবং আলোক এইখানে এসেছে আজ পাঁচদিন। প্রথম দুদিন অপর্ণা যা-কিছু খাবার কুড়িয়ে পেয়েছিল, তার সবই দিয়েছিল আলোককে, নিজে সে কি খেয়েছিল, সেই জানে ; হয়তো উপোস দিয়েছিল! তৃতীয় দিন গঙ্গার কাদাজল মিশিয়ে খেয়েছিল কতকগুলো পোকা-খাওয়া ছোলা —তারপরই এই অসুখ!

কাছের একজন দয়াবান মাড়োয়ারী সকালে এক ভাঁড় দুধ দিতেন অপর্ণাকে ; গত কালও সে দুধ এনেছিল, আজ আর উঠতে পারে নি। ছেলেটা উপবাসী রয়েছে! আলোক জানে না, সেই মাড়োয়ারীর বাড়ীটা কোথায়—এই কদিন একেবারে শ্মশানের শিব হয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু আজ মধ্যাহ্নে অপর্ণার অবস্থা আর রুদ্র-বালকের বিকট চীৎকার ওর শিবত্ব ভঙ্গ করলো—ওকে বুঝিয়ে দিল—ও শিব নয়, মানুষ।

নোটখানা হাতে নিয়ে আলোক তাড়াতাড়ি ফিরতে লাগলো। আর দেরী হলে যাওয়া হয়ে উঠবে না! বাজার খোলা নেই, কিছু খাদ্যের জন্ত এদিক-ওদিক ঘুরে একটা খাবারের দোকানও পেল সে। এক ভাঁড় দুধ আর কিছু খাবার কিনলো। এসে দেখে, অপর্ণা শান্ত হয়ে শুয়ে আছে ;—মরে গেছে নাকি? আলোক সভয়ে এসে হাত দিল ওর কপালে। না—অপর্ণা চোখ মেলে চাইল। জীবন যাদের রুদ্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে, তাদের মৃত্যু কি এত সহজে হয়! আলোক বলল,—ছেলেটা? রুদ্র কৈ?

অপর্ণা হাসলো ক্ষীণ-উজ্জ্বল হাসি ; বললো,—ওপাশের একটা মেয়ের

ছেলে মারা গেছে; তারই মাইদুধ খাচ্ছে সে! তুমি এসব কোত্থেকে আনলে দাদাবাবু?

—পেলাম এক যায়গায়—বলে আলোক বসিয়ে দিল অপর্ণাকে। ভাঁড় থেকে জল ঢেলে দিল ওর হাতে। মুখ-হাত ধুয়ে অপর্ণা যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য গ্রহণ করবে—ছেলেটা কোলে ফিরে এলো এক তরুণী। বলল,

—এই যে, তোমার বাবু এসে পড়েছেন। দুধ পেলে বাবু! পেলে তো দাও, খাইয়ে দিই। ছেলেটা খিদেতে মরে গেল যে! আমার মাইদুধ আর নেই; শুকিয়ে গেছে অনেক দিন।

অপর্ণাই বললো—দুধ রয়েছে, এই যে, দাও তো ভাই একটু খাইয়ে! মেয়েটি দুধ খাওয়াতে বসলো রুদ্রকে। সারাদিন না খেয়ে ছেলেটা নেতিয়ে পড়েছে। ওর কাঁদবার শক্তিও নেই আর। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে শুধু। কয়েক ঢোক দুধ খেয়ে তবে ও কেঁদে উঠলো। ওর জীবন যেন এতক্ষণে জাগ্রত হচ্ছে। কিন্তু সেই তরুণী মেয়েটা পাতার খাবারগুলোর পানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। আলোক বুঝতে পারলো, বললো,—নাও! তুমি নাও কিছু এর থেকে!

ছেলেকে অপর্ণার কোলে দিয়ে সে খাবার নিল অঞ্জলি পেতে; তারপর উঠে গেল ওদিকে। ওখানে তার বুড়ি মা ধুঁকছে আর স্বামীটা বলছে কর্কশ কণ্ঠে—কি আনলি, দে; আমাকে আগে দে—দে বলছি!

—থাম্ না মুখপোড়া! তোর জন্যেই আনলাম!—মেয়েটি মুখ-ঝাম্টা দিল।

ওর থেকে ভাল সম্বোধন এবং ভাল ব্যবহার ওদের কাছে আশা করাই অন্যায়। জীবনের এই শব-সাধন ক্ষেত্রে ওরা কি 'প্রিয়তম' বলে সম্বোধন করবে, নাকি ওমর খৈয়াম আউড়ে বলবে—'খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে'......! আলোক নিঃশব্দে শুনলো ওদের আলাপ। কিন্তু ওর ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। এই কদর্য্য নিরন্নতা আর কুৎসিত

পশু-মানবত্ব সে যেন আর সহ্য করতে পারছে না। ওর অন্তরটা দীর্ণ হয়ে হাহাকার করছে। বলছে,—হে দেবতা, মানুষের গৌরবটুকু তুমি রক্ষা করো—মানুষকে অমানুষ হতে দিও না—দানব করে তুলো না!

ওর চিন্তার মধ্যেই রুগ্না অপর্ণা খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেললো,—শোয়ালো তাকে। তার পর ঐ দুর্ব্বল শরীরেই দাঁড়িয়ে বললো—খাবার তো অনেক রয়েছে দাদা—তুমি কিছু খাও!

—হাঁ, খাই! আলোক অতি সামান্য একটু মুখে দিয়ে জল খেল অনেকটা। পিপাসাই ওর বেশি হয়েছিল। নিজকে খাদ্য দান করতে আজ যেন ওর প্রবৃত্তি হচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে, মানুষের জীবন শুধু অখাদ্যের আর অতি খাদ্যের দুটি স্তর ছাড়া আর কিছু নয়। অতিখাদকের দল অখাদ্যের আবর্জ্জনা ছড়িয়ে দিয়ে যায় পথের জঞ্জালে, অখাদকের দল তাই কুড়িয়ে খায়, খেয়ে বাঁচে। জীবনের এই দ্বিতীয় স্তর খুবই বড় স্তর; কিন্তু অতিখাদকের রক্তলোলুপ মাটিতে এই স্তর রক্তহীন পাণ্ডুর হয়েই বেঁচে থাকে। এদের জীবনের আর কিছু শ্রেয় নেই, আর কিছু প্রেয় নেই, আর কোন সাধনা নেই, শুধু বেঁচে থাকা, শুধু টিকে থাকা! কিন্তু কেন? কেন জীবন এমন করে নিজকে টিকিয়ে রাখতে চায়? কী মহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তার বেঁচে থাকার সাধনা! জীবন যদি আজ এই মুহূর্ত্তেই নিঃশেষ হয়ে যায় তো কার কি এসে যাবে! একটা এটোম্ বোম্ বা একটা অপ্রাকৃত শক্তি যে-কোন মুহূর্ত্তে জীবনকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে—মুছে ফেলতে পারে পৃথিবী থেকে, সে-সব জেনেও জীবন বাঁচবার সাধনা করে—মানব-জীবন থেকে দানব-জীবনে নেমে যায়, পশু-জীবনকে বরণ করে, তবু জীবনকে ছাড়ে না। আশ্চর্য্য!

জীবনের উপর মমত্ববোধটা যেন সম্পূর্ণরূপেই লোপ পেয়ে গেল আলোকের। জলটা খেয়ে ও শুলো, ক্লান্তিতে সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে আসছে। অপর্ণা বাকি খাবারগুলো পাঁচটা সমান ভাগে ভাগ করে ঐ

ছাঁচকোলের বাকি পাঁচজন মেয়েপুরুষকে দিল গিয়ে। ওরা এই অদ্ভুত সময়েও আশীর্ব্বাণী বর্ষণ করলো—রাণী হও মা, স্বামীপুত্তুর নিয়ে রাজরাণী হয়ে বেঁচে থাক।

বেঁচে থাকারই আশীর্ব্বাদ, কিন্তু তার সঙ্গে অতি-খাদ্যের ইঙ্গিতটুকুও আছে। অখাদ্যে বেঁচে থাকা কেউ চায় না; তবু অখাদ্যেই বেশী লোককে বেঁচে থাকতে হয়। আলোক চোখ বুজেই ভাবতে ভাবতে হয় তো ঘুমিয়ে পড়লো; উঠে দেখলো, সকাল।

চাকরীতে যেতে হবে তাকে; অপর্ণাকেও ওইখানে নিয়ে গিয়ে রাখলে কেমন হয়—অন্ততঃ ছেলেটাকে অনায়াসে রাখা যেতে পারে—ভাবতে ভাবতে আলোক মুখ হাত ধুলো; দোকান থেকে চা কিনে এনে অপর্ণাকে দিল, নিজেও খেল। ছেলেটার দুধ আজ অপর্ণা আনবে সেই মাড়োয়াড়ী ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে। সে বেরুচ্ছে, আলোক ছেলেটার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দেখতে লাগলো; অপর্ণা শুধুলো—কি দেখছো দাদাবাবু?

—না, কিছু না। আমার আসতে যদি দেরী হয় তো ভেবো না। এই টাকাটা রাখ!

একটা টাকা অপর্ণার হাতে দিয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল। ভাবতে লাগলো, এই টাকা কাল সে যার কাছ থেকে এনেছে—কে জানে, ঐ ছেলেটার জননী সেই কি না? আলোক ঐ ছেলেটার সারা অঙ্গে তাই অনুসন্ধান করছিল এতক্ষণ। কিন্তু হাসি পেল ওর; ছেলেটা জীবন-কণা, জীবন্ত মানব শিশু! যেই তার জননী হোক, সে নিজের জীবনে এখন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ তার জননীর সন্ধান করা মূর্খতা ছাড়া কি আর!

কিন্তু কিশোরের সন্ধান একবার করতে হবে, নইলে আলোকের মনুষ্যত্ব বলে গৌরব করবার আর কিছু থাকবে না। ঝুমনী, কেমন আছে,

দেখতে হবে। আর চক্কোর্ত্তিদা—কে জানে, তিনি জীবিত আছেন কি না!

নূতন চাকরী, দেরী হয়ে যাবার ভয়ে আলোক কিন্তু কোথাও যেতে পারলো না ; সটান চলে এলো বিশ্বেশ্বরী নিকেতনে। উৎপলা তখনো আসে নি। আলোক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো বাড়ী, বাগান আর বাড়ীর তিনটি মাত্র অধিবাসীকে। একটি শিশু, তার মা, একজন ধাত্রী এই বাড়ীর বাসিন্দা। ধাত্রীমেয়েটির আপনার সজ্জারচনায় রত ছিলেন ; শিশুটির মা আলোককে দেখে জিজ্ঞাসা করলো,

—সহর বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে ? আপনি বাসে এলেন তো ?

—সহর ঠাণ্ডা হয়েছে। আমি হেঁটেই এলাম।

—আমাদের বাড়ীতে আমার ছোটভাইটির খবর পাইনি ; মা কেমন আছেন যদি একটু খবর এনে দেন !

—ঠিকানা দিন, খবর এনে দেব ! আলোক বললো এবং ঠিকানাও লিখে নিল। বাড়ীটা চক্রবর্ত্তীদার বাসার কাছেই। উৎপলা এসে পড়লো। আলোককে দেখে বলল,

—এসেছেন ? বেশ বেশ ! আপনার বোন কেমন আছেন ?

—কিছুটা ভাল।—বলে আলোক ওর সঙ্গে অফিসঘরে এল। এসেই বললো—আমাকে যদি রাত্রে এখানে থাকতে হয়, তাহলে আমার বোনকেও এখানে থাকতে দিতে হবে।

উৎপলা দু'মিনিট চুপ করে থেকে বললো,

—তাঁকে আনবেন, আমি দেখবো, কোনো কাজে লাগাতে পারি কি না।

অতঃপর ওঁদের কাজের কথা হতে লাগলো।

মুক্তি চাইলেই মুক্তি পাওয়া যায় না! কলকাতা থেকে কাশী, শুধু বেড়াতে আসা নয়, শ্বশুরবাড়ী আসা, সহধর্ম্মিণীকে দেখতে আসা,—সিধুর জরুরী কাজের সমস্ত ওজর তরুণীর দল হেসেই উড়িয়ে দিল। পরপর দুই রাত্রি তাকে বাস করতেই হোল ওখানে। দ্বিতীয় রাত্রিতে সিধু যথারীতি শয়নকক্ষে গেল গভীর রাত্রে। ইচ্ছা করেই সে রাতের কিছুটা কাটিয়ে দেবার জন্য বাইরের ঘরে এত বেশী দেরী করলো যে অন্য মেয়েরা বলতে বাধ্য হোল—এবার শুতে যাও ভাই! অবন্তী বসে আছে সেই সন্ধ্যে থেকে।

সিধু এসে দেখলো, অবন্তী বসে নেই, শুয়েই আছে কিন্তু ঘুমায় নি—জেগে রয়েছে। সিধুকে দেখে উঠে বসলো। ওর সুসজ্জিত তনিমার পানে চেয়ে দেখতে সিধুর লজ্জা বোধ হচ্ছে। ঐ নারী নিজকে সম্পূর্ণরূপে দান করবার জন্যই এসেছে আজ এ ঘরে—ও দান গ্রহণ করলে সে আপত্তি তো করবেই না—বরং অনুগৃহীত বোধ করবে। কিন্তু সিধু আজ সে সিধু নেই, সে অবস্থাও নেই ওই নারীর।

—আমি সারা দিন একটা কথা তোমায় বলবার জন্য বসে আছি সিধুদা!

—বলো—সিধু টেবিলের একখানা বই নাড়াচাড়া করতে করতে বললো,—বলো, কি কথা!

—বসো এইখানে--বলে অবন্তী উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে এলো। তারপর সিধুর হাত ধরে খাটে বসিয়ে এমন এক আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে তাকালো সিধুর পানে, যে-দৃষ্টি সিধু আর কোনো মেয়ের চোখে কখনো দেখেনি। যে-দৃষ্টিতে উর্ব্বশী আবেদন জানিয়েছিল অর্জ্জুনের কাছে,—এ হয়তো নারীর সেই চিরন্তনী দৃষ্টি!

—আমার কথা রাখবে তো সিধুদা?—তুমি রাখবে, আমার বিশ্বাস আছে!

অবন্তী ঘনিয়ে এলো সিধুর অঙ্গপানে! ওর দেহসৌগন্ধ সিধুকে কিন্তু সঙ্কুচিত করে তুলছে; তথাপি সিধু স্থির হয়ে বসেই বললো—কথাটা বলো তোমার।

—আমার অবস্থা তো দেখছো—অবন্তী ক্ষীণ-মধুর হাসলো—কিন্তু সিধুদা, এর জন্য আমি তো কিছুমাত্র দায়ী নই। বাবা বিশ্বেশ্বর জানেন, আমার কোনো অপরাধ নেই।

অবন্তী থামলো; সিধু চুপ করেই শুনে যাচ্ছে। অবন্তী আবার আরম্ভ করলো,

—আমাকে তুমি ভালবাসো, সেই জোরেই বলতে সাহস করছি! আমার যে-টুকু-যা হয়েছে, তাকে ক্ষমা-ঘেন্না করে যদি তুমি আমায় বৌ-হিসেবে গ্রহণ করো, তাহলে……তাহলে তোমাকে নিয়ে আমি এই কাশীতেই থেকে যাই। বাবা কিছু টাকা আর একখানা বাড়ী এখানে কিনে দেবেন আমাদের! তুমি রাজি হও সিধুদা, আমাকে তুমি বাঁচাও!

ওর কণ্ঠস্বরের করুণ আবেদন সিধুকে হয়তো বিচলিত করতে পারতো, কিন্তু ওর অঙ্গ-স্পর্শের অ-সৌজন্য,—ওর আশ্রয় লাভের উৎকণ্ঠাকে ছাপিয়ে উদ্দামতায় অভিব্যক্ত হচ্ছে। ওর সেই আবেদন অভিসার কুণ্ঠিতা কুলবধূর নয়,—নির্লজ্জা নটিনীর।—সিধু শালগ্রাম-শিলার জন্য পকেটে হাত দিল—নেই। কিন্তু সিধুর মনের আসনে তিনি রয়েছেন। আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় হয়ে উঠলো সিধু। সাধকের সুগম্ভীর কণ্ঠে বললো—আমি আজ মৃত্যু-পথের যাত্রী, অবন্তী! এই যাত্রাপথের মহামন্ত্র একদিন তুমিই আমায় দান করেছিলে—সেই মহেন্দ্রক্ষণটুকু স্মরণ করে তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি! কিন্তু তোমাকে পত্নীত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে আমি মুক্তির পথে চলতে পারবো না। আর যতটুকু দেখছি,—তোমার জীবনে তার প্রয়োজনও নেই। এক বৎসরের মধ্যে যদি তুমি বিবাহিত বধূ জীবনে না যেতে পার, তাহলে আমি এসে তোমার খবর নেব, তোমাকে আমার

পথে যাবার কথা বলবো ; সে পথ কঠিন, কঠোর মৃত্যুর পথ। যদি যেতে চাও, নিয়ে যাব তোমায়। বিবাহিত জীবনের গণ্ডীবদ্ধ পথ আমার নয়। আমি রুদ্রের সাধনারত সন্ন্যাসী।

সিধু থামলো। ওর কণ্ঠের কোমল স্বরও যেন আতঙ্কিত করে তুলছে অবন্তীকে। তথাপি অবন্তী আব্দার করার মত বললো—ওপথ ছেড়ে দাও সিধুদা, ও বড় ভয়ঙ্কর পথ! দাদা গেছে ; আলোকদা গেছে—ওপথ থেকে কেউ ফেরে না!

—সৈনিক ফিরে আসবার আকাঙ্খা নিয়ে যুদ্ধে যায় না অবন্তী। সে না ফিরবার জন্যই যায়। না-ফেরাতেই তার সার্থকতা। মৃত্যুতেই তার ব্রত উদ্‌যাপন!

অবন্তী চুপ করে রইল ; বেশ বোঝা যাচ্ছে, সে অত্যন্ত নিরাশ হয়েছে সিধুর কথায়। ওর নারীত্বের সমস্ত মোহপাশ এই অতি অশিক্ষিত চরিত্রহীন সিদ্ধেশ্বরের কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল, এ বেদনা তার পক্ষে কম নয়, কিন্তু তার চেয়েও বড় ব্যথা বাজছে ওর বুকে!

ওরই কণ্ঠের মন্ত্র নিয়ে সিধু আজ মৃত্যুপথযাত্রী, আর সে নিজে কোথায়, কোন্ অতল অন্ধকার গহ্বরে নির্মজ্জিত!—কয়েক মিনিট নীরবে ভাবলো অবন্তী, তারপর বললো,

—আমিও একদিন ঐ মন্ত্রের উপাসনা করতাম সিধুদা,—আজ জীবনের দুর্ভাগ্য আমায় বন্দী করেছে, বিড়ম্বিত করেছে ; তুমি আমাকে এই বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচাতে পারতে ; আমার জীবন আবার সমাজের বুকে ঠাঁই পেতে পারতো। তা না হোক, আমি সকল সময় কামনা করবো, তোমার পথ জ্যোতির্ম্ময় হোক, তোমার সাধনা সিদ্ধি লাভ করুক।

অবন্তী থামলো ; ওর চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু নাকি? সিদ্ধেশ্বর অপলকে চেয়ে রইল ওর মুখপানে! এ কি সেই অবন্তী? সেই জংশন

ষ্টেশনের বজ্রগর্ভা অবন্তী! নারীর এই খড়্গাহস্তা-বরদাত্রী মূর্ত্তি সিধুর বড় ভালো লাগে! কালিকার কল্যাণী মূর্ত্তি এ,—আদ্যাশক্তির অভয়া মূর্ত্তি! সিধু আস্তে আস্তে বললো,

—তোমার জীবনের গ্লানি আমি গ্রহণ করলাম দেবি, সমাজের বিষ আমি পান করলাম—আগামী কাল তুমি প্রচার করে দিও, তোমার স্বামী মুক্তির পথে মহাযাত্রা করেছে; আর সেই যাত্রায় তুমিই সগর্ব্বে তাকে সাজিয়ে দিয়েছ!

গম্‌গম্ করছে ঘরখানা; রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে' যেন কার গভীর আহ্বান বাজছে বুকের রক্তের তালে তালে। অবন্তী চেয়েই রইল সিধুর মুখপানে। ও যেন ভুলে গেছে ওর বর্ত্তমান, ওর অনতিদূরস্থ ভবিষ্যৎ, ওর সমাজ, ওর সংসার, ওর আভিজাত্য! পূজারিণীর স্তবগানের মত বললো—তোমায় সাজিয়ে দেবার গৌরব আমায় দিলে সিধুদা—তোমার পত্নীত্বের সৌভাগ্যও দিলে আমায়—আশীর্ব্বাদ করো, তোমার যাত্রাপথেও যেন আমি অংশ পাই—অবন্তী পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো সিধুকে।

—শোও এবার, রাত হয়েছে—বলে সিধু বারান্দায় চলে গেল। অবন্তী শুলো না, বসে আছে। ঘুম যেন ওর চোখ থেকে কেড়ে নিয়েছে কে! কে যেন জ্বালিয়ে দিয়েছে ওর মনের সঞ্চিত সমস্ত আবর্জ্জনা, তারই আগুনে ওর অন্তরের সোনাটুকু ঝক্‌মক্ করে উঠছে বারম্বার। কিন্তু এই আবর্জ্জনা কি অল্প? সারা পৃথিবীর যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়েও একে দু'দশদিনে ভস্ম করা সম্ভব হবে না;—অবন্তীর মনে পড়তে লাগলো, তিলে তিলে নয়, মুঠো মুঠো করে সে এই আবর্জ্জনা কুড়িয়েছে; সারা অঙ্গে মেখেছে, অন্তরে সঞ্চিত করেছে। তার সাক্ষ্য রয়েছে তার সারা দেহে-মনে! কিন্তু ঐ যে বিষপায়ী নীলকণ্ঠ,—অকুণ্ঠস্বরে অবন্তীকে পত্নীত্বের গৌরব দিয়ে তার সামাজিক জীবনের সমস্ত হলাহল নিঃশেষে পান করে গেল, ওর আরাধনা করবার মত কোন্ তপস্যা অবন্তীর আছে? ঐ

রুদ্রদেবতার শান্ত-শিব-মূর্ত্তির চরণতলে অবন্তী আজ নিজকে বিচূর্ণিত করে কৃতার্থ হতে পারলো না—তার ফণি-ফণা-সঙ্কুল পদচিহ্ন ধরে অনুগামিনী হতে পারলো না—তার বৈরাগ্যের ভস্ম অঙ্গে মেখে তার বিজন-কেতন ধরতে পারলো না—অবন্তী আজ সে-গৌরব পেয়েও পেল না। অবন্তী মাতৃত্বে বন্দী!

এই বন্ধনকে অস্বীকার করবার উপায় নাই। নারী-জীবনের এই শ্রেষ্ঠ বন্ধন, এই সাধনার বন্ধন থেকে কোনো নারীই মুক্তি মাগে না—মাগা অস্বাভাবিক—নারীত্বের বিকৃতি। তবু যদি আজ এই মুহূর্ত্তে অবন্তী মুক্ত হতে পারতো তাহলে ওই রুদ্র-দেবতার পদচিহ্ন ধরে সেও যাত্রা করতো মহাযাত্রা-পথে, যে পথ মৃত্যু-আকীর্ণ মহাজীবনের পথ—যে পথ মরণবিজয়ী অমৃতের পথ।

অবন্তী নিশ্চুপে ভাবছে, আর সিধু অপলক চোখ চেয়ে আছে বাইরের অন্ধকার রাত্রির পানে। রাত্রি—প্রকৃতিমাতার শান্ত-শুদ্ধ রূপ—মৃন্ময়ী ধরিত্রীর চিন্ময়ী মূর্ত্তি। অনন্ত আকাশতলে ঘূর্ণায়মানা বন্দিনী জননী ধরিত্রী সংখ্যাহীন জীবনাঙ্কুর অঙ্কে নিয়ে অনন্তের পথে যাত্রা করেছেন—কিন্তু আজো তাঁর অঙ্কে সেই মহত্তোমহীয়ান জীবন-ভ্রূণের আবির্ভাব ঘটলো না, যে ভ্রূণ বন্ধনকে মুক্তির খড়্গো ছেদন করতে সক্ষম—যে ভ্রূণ মৃত্যুকে অমরত্ব দিতে সক্ষম!—হয়তো একদিন আবির্ভাব ঘটবে তাঁর,—ধরিত্রী জননী আজো তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। প্রস্তুত হচ্ছে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর—যার আগমনী গান করে কবি বলেছেন :—

'তারই লাগি কাণ পেতে আছি :
যে আছে মাটির কাছাকাছি॥'—হয়তো তিনি আজ মাটির কাছাকাছিই এসেছেন।

কখন ভোর হয়ে গেছে। সিধু সম্বিত পেয়ে দেখলো, অবন্তী নেমে গেছে নীচে। সেও নীচে এলো। হাতমুখ ধুয়ে জলযোগ সেরে

বিদায়-দেখা করতে গেল অবন্তীর সঙ্গে। অবন্তী নীরবে প্রণাম করলো ওকে; সিধু ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করলো,—বীর-প্রসবিনী হও, তুমি মা হও সেই পুত্রের, যে পুত্র মৃত্যুকে পরাহত করবে!

বাইরের তরুণীদল শুনলো ওর আশীর্ব্বাদ। যেন অতীত যুগের সেই জ্বলন্ত বাণীর জাগৃতি!

সিধু পথে নামলো।. জানালাপথে অবন্তীর চোখ দুটি শুক তারার মত জ্বলছে—অবিকম্পিত—অপরিম্লান!

বুঝিবা অরুণোদয়ের ইঙ্গিত।

সর্ব্বোচ্চ স্তর প্রেম – চির জানা, চির অজানা, যাহাকে সম্পূর্ণভাবে জানিবার সাধনাই সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। সাহিত্য মানব জীবনকে শুচি, শুভ্র ও সুন্দর করিবে, তাহাকে তাহার আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবে—জানাইয়া দিবে, সে মানুষ,—সে অন্য জীব হইতে স্বতন্ত্র—এইখানেই তাহার সতর্কতা। 'চিতা-বহ্নিমান' পাঠককে সেই সর্ব্বোচ্চ অনুভূতিই দান করিবে।

শক্তিমান দরদী কথাশিল্পী

রুবেন রায়ের

মুখর মুকুর—৪৲

মনের মুকুরে প্রতিফলিত ছবি হইয়া উঠিয়াছে মুখর অথচ মনোরম! শক্তিমান লেখকের সার্থক লেখনী স্বচ্ছ স্রোতের ন্যায় বিচিত্র ভঙ্গিমায় বহিয়া চলিয়াছে হৃদয় দ্বন্দ্বের অনবদ্য রস-রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া।

আরক্তিম—৪৲

ধরণীর কোণে কোণে রক্তরাগের খেলা! রক্তপাগল খেয়ালীর দল ছুটিয়াছে সেই রক্তিম হোলি উৎসবে মত্ত হইয়া! রাজধানীর রাজপথ রক্তপ্লাবিত! রক্তটিকা-লাঞ্ছিত ললাটে দেখা যায় জ্যোতির্ম্ময়ের উদার অভ্যুদয়! অমৃত-গরল মন্থিত হৃদয়ও অনুরাগে রক্তিম। দিগন্তবিসারী আরক্তিম আকাশে আর দীপ্তশ্রীমণ্ডিতা তরুণীর আরক্তিম গণ্ডে অনুরাগ-রঞ্জিত রঙের বিচিত্র প্রকাশ!

স্পন্দন—৩৲

বহু সংঘাতকে অতিক্রম করিয়া দুইটি তরুণ তরুণী মিলিত হইল আদর্শের আকর্ষণে। বহু ঝড় ঝঞ্ঝা, আলো, অন্ধকার, আশা নিরাশার মধ্য দিয়া অবশেষে উভয়ের স্পন্দিত-হৃদয় অভিনন্দন জানাইল পরস্পরকে। কাব্যের মত সরস উপন্যাস খানি পাঠক চিত্তকে রসাপ্লুত করিয়া তুলিবে।

রুবেন রায়ের

জাগ্রত-জীবন—২৲

অতিমানবের লোকে বসিয়া সাধারণ জীবনে প্রেমের রসাস্বাদন সম্ভব কি? এই অতি প্রয়োজনীয় সমস্যা অবলম্বন করিয়া লেখক পাঠক সমাজকে ভাবাইয়াছেন। স্বচ্ছ সুন্দর ভাষায় মধুর উপন্যাস।

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্তের

বন্ধনহীন-গ্রন্থি—৩৲

জীবনের জটিল গ্রন্থি কেমন করিয়া কোথায় মানুষকে লইয়া যায়—মানব-মনের অনন্ত বিস্তারে কে কোথায় কি ভাবে তলইয়া যায়, কেহ বা জ্যোতির্ম্ময় তারকার মত ভাস্বর হইয়া উঠে—তাহারই সকরুণ এবং সহজ মধুর আলেখ্য।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের

রাত্রির যাত্রী—৩৷৹

বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক চেতনার পটভূমিকায় লিখিত গঠনমূলক এই উপন্যাসখানি শক্তিশালী লেখকের লেখনী-প্রসূত। 'রাত্রীর-যাত্রী' নির্য্যাতন নিপীড়নকে তুচ্ছ করিবার, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিবার ইতিহাস। বিশাল ভারতবর্ষের পটভূমিকায় ছোট্ট শিবানী গ্রামের কাহিনী শুধু উপন্যাসই নয়, একখানি মূল্যবান দলিল।

শ্রীআনন্দের

সবুজ বনে দুরন্ত ঝড় (কিশোর উপন্যাস) ১৷৹

এক অপরাধপ্রবণ দুরন্ত প্রাণবন্ত কিশোর ভাগ্য-বিড়ম্বনায় শৈশবকাল হইতেই অবাঞ্ছিত পরিবেশের মধ্যে পালিত ও বর্দ্ধিত! নূতন পরিবেশে সেই কিশোরের মানসিক পরিবর্ত্তন, মনুষ্যত্বের আহ্বানে তাহার হৃদয়-দেবতার জাগরণ ও বিকাশ, ভাষার ব্যঞ্জনায় অপূর্ব্ব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের

চিতা-বহ্নিমান	৪৲	জীবন-রুদ্র	৩॥০
জ্যোতির্গময়	৪৲	কালরুদ্র	৪৲
নীলালক্তক	২॥০	মহারুদ্র	৪৲

হে মোর দুর্ভাগা দেশ (১ম) ৩॥০

হে মোর দুর্ভাগা দেশ (২য়) ৪৲

হে মোর দুর্ভাগা দেশ (৩য়) ৪৲

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের

রাত্রির যাত্রা ৩॥০

শান্তিকুমার দাশগুপ্তের

বন্ধনহীন গ্রন্থি ৩৲

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

বিশ্বের বিচিত্র পত্রাবলী ২॥০

শ্রীশৈলেশ বিশীর

বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন-প্রশ্ন ২৲

রুবেন রায়ের

আরক্তিম	৪৲	জাগ্রত জীবন	২৲
স্পন্দন	৩৲	মুখর মুকুর	৪৲

শ্রীআনন্দের

সবুজ বনে দুরন্ত ঝড় (কিশোর উপন্যাস) ১।০

দেবশ্রী সাহিত্য-সমিধ

৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা—৬